তাস্হীলুল কুদূরী

শরহে

আল্ মুখতাসারুল কুদূরী





আল্ আকসা লাইব্রেরী

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

তাফহীমুল কুদূরী

শরহে

আল্ মুখতাসারুল কুদূরী

মূল

আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল কুদূরী (রঃ)

অনুবাদ ও সংযোজনায়

মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

আল্ আকসা লাইব্রেরী

৫০ বাংলাবাজার ঢাকা - ১১০০

তাফ্হীমুল কুদূরী শরহে মুখতাসারুল কুদূরী

মূল ঃ আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল কুদূরী (রঃ)

প্রকাশক

মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী

আল-আকসা লাইব্রেরী

প্রকাশকাল ঃ

প্রথম মুদ্রণ ঃ ২০০৩

নতুন সংস্করণ ঃ ২০০৪

মূল্য ঃ

সাদা ঃ ২২০ টাকা মাত্র।

নিউজ ঃ ১৮০ টাকা মাত্র

বর্ণ বিন্যাস ঃ

সংরক্ষণ কম্পিউটার্স

৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুদ্রণ ঃ

আল-মদিনা প্রিন্টিং প্রেস

ঢাকা।

অবতরণিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও শাশ্বত জীবন বিধান। মানব জীবনের সূচনালগ্ন হতে সমাহিত হওয়া পর্যন্ত যত সমস্যাবলী আছে ইসলাম দিয়েছে তার সুন্দর-সুষ্ঠু সমাধান। সাধারণ হতে সাধারণ এবং জটিল হতে জটিলতর সার্বিক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে শরীআতে। যার নযীর বিশ্বের অন্য কোন ধর্মে অনুপস্থিত। ইসলামের বহুধা শাস্ত্রাবলীর মধ্যে ফিকহ শাস্ত্রটিই বিশেষতঃ ইসলামী জীবনধারার রীতিনীতি নিয়েই সঙ্কলিত। এটাকে কুরআন-সুন্নাহর সার-নির্যাস বললেও অত্যুক্তি হবে না তা কোনরূপে। আর এ কারণেই ইলমে ফিক্হকে কেন্দ্র করে বহু গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে যুগে যুগে। সে সবের কোনটি মূল গ্রন্থ, কোনটি শরাহ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এসবের মধ্যে প্রায় এগারশত বৎসর পূর্বে সংকলিত আল্লামা আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে আবু বকর আল-কুদূরী আল-বাগদাদী (র:) -এর মুখতাসারুল কুদূরী গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটিতে সংক্ষেপ ত্বাহারাত হতে মাওয়ারিস (তথা পবিত্রতা হতে মীরাস) পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অধিকাংশ বিষয়, ইমামগণের মতান্তরসহ উল্লেখিত হয়েছে। গ্রন্থটি স্বকীয় বৈশিষ্টের দরুন হানফী মাযহাব অবলম্বি উলামায়ে কেরামের নিকট সমাদৃত হয়ে আসছে সহস্রাধিক বৎসর যাবত। সরকারী বেসরকারি বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য তালিকায় স্থান পেয়ে আসছে বহু কাল ধরে। ফিকহ শাস্ত্রের বিখ্যাতগ্রন্থ হেদায়া রচিত হয়েছে কুদূরীর মতনকে কেন্দ্র করে। তাছাড়া আরো অনেক টীকা ও শরাহ গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে এর। যা গ্রন্থটির ব্যাপক কবুলিয়াতের প্রমাণ বহন করে।

অনেক পূর্ব হতেই এর সহজ সরল ভাষায় অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করে প্রকাশের নিমিত্তে অনুরোধ জানিয়েছে অনেকে কয়েক বৎসর পূর্ব হতে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার ও বিভিন্ন ব্যস্ততার দরুন তা যথা সময়ে সম্পন্ন করতে পারিনি। আলহামদুলিল্লাহ অনেক বিলম্বে হলেও তা বিভিন্ন চড়াই উৎরায়ের ধাপ পেরিয়ে এবার প্রকাশের মুখ দেখছে।

কিতাবটিতে মূল গ্রন্থের সহজ সরল অনুবাদ, শব্দার্থ, জটিল মাসায়েলের দৃষ্টান্ত পেশ ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং পাঠ শেষে অনুশীলনী ও সংযোজিত হয়েছে। এক কথায় সর্বাঙ্গিন সুন্দর করতে কসুর করা হয়নি কোন ক্ষেত্রে। আশা রাখি ছাত্র/ছাত্রীসহ পাঠদানকারী শিক্ষকবৃন্দের জন্যে এটা বেশ উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

মানুষ যেহেতু ভুলের উর্ধ্বে নয় বরং ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই কিতাবটির কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে অবহিত করার অনুরোধ রইল পাঠক-পাঠিকা সমাজের নিকট। ইনশাআল্লাহ তার যথার্থ মূল্যায়ন করা হবে পরবর্তী সংস্করণে।

আল্লাহ তাআলা এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করতঃ এ অধমকেও পাঠক-পাঠিকা সকলকে উপকৃত করুন এবং অত্র কাজে সহায়তাদানকারী সকলকে জাযায়ে খায়ের প্রদান করুন।

এ কামনায়-

হাফিজুর রহমান যশোরী

২৫/১২/০২ইং

সূচিপত্র

مُبَسْمِلا مُحَمْدِلاً مُصَلِّيًا وَّ مُسَلِّمًا

فقه শাস্ত্রীয় জরুরি জ্ঞাতব্য

فقه এর শাব্দিক অর্থ ঃ اَلْفِقْهُ حَقِيقَةُ الشَّقُّ وَالْفَتْحُ وَالْفَقِيهُ الْعَالِمُ الَّذِىْ يَشُقُّ الْاَحْكَامَ وَ يُفَتِّشُ عَنْ حَقَائِقِهَا وَيَفْتَحُ مَااسْتَغْلَقَ مِنْهَا ـ

অর্থাৎ فقه এর শাব্দিক অর্থ হলো, উম্মোচন করা, স্পষ্ট করা, খোলা। একারণেই যে শরয়ী বিধানকে স্পষ্ট করে, তার তত্ত্ব রহস্যকে উদঘাটন করে এবং জটিল মাসায়েলের সুষ্ঠু সমাধান করে তাকে ফকীহ্ বলে (আল-ফায়েক যমখশরী রচিত)

اَلْفِقْهُ لُغَةً اَلْعِلْمُ بِالشَّيْئِ ثُمَّ خُصَّ بِالْعِلْمِ الشَّرِيْعَةِ - فقه এর আভিধানিক অর্থ হলো যে কোন বস্তু বা বিষয় জানা, অবগত হওয়া পরবর্তীতে এটা ইলমে শরীআ'তের সাথে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। (দুর্রে মুখতার) فَقِهَ الشَّيْئَ فَقْهًا বাবে سَمِعَ হতে বুঝা, অবগত হওয়া। فَقُهَ فَقَاهَةً বাবে كَرُمَ হতে জানা, ফকীহ হওয়া (আকরাবুল মাওয়ারিদ)

عِلْم فِقْه-এর পারিভাষিক অর্থ বা সংজ্ঞা ঃ শরয়ী পরিভাষায় এর সংজ্ঞায়নে সামান্য মতপার্থক্য দেখা যায়। যথা (ক)

اَلْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفُرْعِيَّةِ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

অর্থাৎ যে শাস্ত্রের মাধ্যমে আদিল্লায়ে মুফাস্‌সালা (তথা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস) হতে শাখাগত শরয়ী' বিধান সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায় তাকে ইলমে ফিক্‌হ বলে।

অপর কথায় (খ)

هُوَ عِلْمٌ بَاحِثٌ عَنِ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اِسْتِنْبَاطِهَا مِنَ الْاَدِلَّةِ التَّفْصِيْلِيَّةِ

(গ) কারো কারো মতে- اَلْفِقْهُ مَجْمُوْعَةُ الْاَحْكَامِ الْمَشْرُوْعَةُ فِى الْاِسْلَامِ অর্থাৎ ইসলামে বিধিবদ্ধ বিধান সমষ্টির নাম ইলমে ফিক্‌হ।

(ঘ) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) বলেন الفقه معقول من منقول অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহ হতে বিবেক-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে ইলমে ফিক্‌হ বলে।

সারকথা এই যে, ইলমে ফিক্‌হ হলো মানব জাতির বিধিবদ্ধ জীবন-যাপন পদ্ধতি, রীতি-নীতি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাবলীর সমষ্টির নাম। ইসলাম যে, মহৎ জীবনধারার ঐশী রীতি-নীতি নিয়ে এসেছে তথা সামগ্রিক জীবনের মহা উৎকর্ষতার সিলেবাস প্রাপ্ত হয়েছে তারই নাম ইলমে ফিক্‌হ।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সংজ্ঞা চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম সংজ্ঞাটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। অত্র সংজ্ঞাটি দু'টি অংশে সন্নিবেশিত। (ক) اَلْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ এ অংশের দ্বারা ইলমে ই'তিকাদী তথা আকীদাগত বিষয়াবলী বের হয়ে গেছে। যথা- আল্লাহর একত্ববাদ, রিসালাত ও পারলৌকিক বিষয়াদি ইত্যাদি। (খ) আর দ্বিতীয় অংশ اَلْعِلْمُ بِالْاَدِلَّةِ التَّفْصِيْلِيَّةِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমলী তথা বাস্তব জীবনের শাখাগত সকল মাসায়েলের ইলম মৌলিক দলীল চতুষ্টয়ের মাধ্যমে অবগত হওয়া। উদাহরণ স্বরূপ- বায়ঈ' সলমের ক্ষেত্রে যখন বলা হবে যে, চুক্তিকালে মূল্য হস্তগত হওয়া শর্ত, তখন সাথে সাথে এ বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ বা সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়ার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হতে হবে।

জ্ঞাতব্যঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওপর যে দ্বীন অবতীর্ণ হয়েছে তাকে শরীআত বলে, এ শরীআ'তের বিধানকে আহকামে শরইয়্যাহ বলে। এটা আবার দু'প্রকার (ক) আহকামে উসূলিয়্যাহ একে আকায়েদ বলে। (খ) আহকামে শরই'য়্যাহ বা ফিক্হ। এটা মূলতঃ প্রথম প্রকার ইল্মের ওপর মওকূফ এবং প্রথম প্রকারের ইল্মের এটা শাখা-প্রশাখা। এ কারণে একে আহকামে ফরই'য়্যা বলে। আর এ আহকামের ওপর বান্দাসমূহের আমল সংশ্লিষ্ট হওয়ায় একে আহকামে আমালিয়্যাহ ও অভিহিত করা হয়, ইলমে ফিক্হকে ইলমুল আহকাম, ইলমুল ফরা', ইলমূল ফতোওয়া, ও ইলমুল আখেরাত নামে ও অভিহিত করা হয়।

(খ) ইল্মে ফিক্হ-এর আলোচ্য বিষয় (موضوع) ঃ মুকাল্লাফ (তথা শরয়ী বিধান বর্তিত) ব্যক্তির কার্যকলাপ। অর্থাৎ মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু বরং সমাহিত হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি সার্বিক কর্মকাণ্ড নিয়ে এতে আলোচনা করা হয়। সুতরাং মানুষের কর্ম-কাণ্ডই এর আলোচ্য বিষয়। (নাবালেগের নামায-রোযা ইত্যাদির নির্দেশ মূলতঃ তাকে অভ্যাস্ত বানানোর লক্ষে; আবশ্যিক হিসেবে নয়। তদরূপ তাদের নামায-রোযা সহীহ হওয়ার বিধান, সওয়াব প্রাপ্ত হওয়া এগুলো মূলতঃ رَبْطُ الْاَحْكَام بِالاسباب এর অন্তর্গত আকলী বিষয় মাত্র। অতএব মুকাল্লাফ ব্যক্তি বলার দ্বারা কোন জটিলতা নেই।)

(খ) ইলমে ফিক্হ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (غرض وايت) ঃ سَعَادَةُ الدَّارَيْنِ তথা ঈলমে ফিক্হ অধ্যয়নের লক্ষ্য হলো নিজে তদানুযায়ী আমল করা, আল্লাহর বান্দাদিগকে অজ্ঞতার আঁধার থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে আনয়ন করা এবং আমলের ওপর উঠিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও ইহ-পারলৌকিক সফলতা লাভ করা।

(ঙ) ইল্মে ফিক্হ এর উৎস হলো চারটি বস্তু (১) কিতাবুল্লাহ (২) সুন্নতে রাসূল (৩) ইজমা ও (৪) কিয়াস। কিতাবুল্লাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– ঐশী বাণী বা কুরআন মজীদ, সুন্নতে রাসূল দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উক্তি, কর্মনীতি ও অনুমোদন (তাকরীর) আর সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ও সুন্নতের তাবে' (বা অনুগামী) ইজমা দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের কোন বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ। মানুষের প্রচলিত আমল ও ইজমার তাবে'।

ইলমে ফিক্হর হুকুম বা বিধান ঃ ইলমে ফিক্হ শিক্ষা করা ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া উভয়ই। যতটুকু জ্ঞান লাভের দ্বারা ব্যক্তিগত জীবনে জরুরি বিষয়াদির অবগতি লাভ করা যায় অতটুকু পরিমাণ জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্যে ফরযে আইন। আর এর অতিরিক্ত অন্যের উপকার সাধন কল্পে জরুরী জ্ঞান লাভ করা ফরযে কেফায়া। বাকি ইলমে ফিকহের সার্বিক বিষয়াদি নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব, বিবাহ, তালাক, মীরাছ প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যার্জন সুন্নত বা মুস্তাহাব। অবশ্য ধনীদের জন্যে যাকাত ও হজ্বের মাসায়েল, বিবাহ ইচ্ছুকদের জন্য বিবাহের মাসায়েল, তালাক দাতার জন্যে তালাকের মাসায়েল, ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যবসার মাসায়েল ইত্যাদি যে যে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে চায় তার জন্যে উক্ত বিষয়ক জরুরি মাসায়েল অবগত হওয়া ওয়াজিব।

কুরআন মজীদ ও সুন্নাহর আলোকে ইলমে ফিক্হ ঃ

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا ـ

অর্থাৎ তাদের মধ্যকার প্রতি দল-গোষ্ঠি হতে কেন একটি জামাত দ্বীনি জ্ঞান লাভের জন্যে বের হয়না যাতে তারা ফিরে আসলে তাদিগকে সতর্ক করতে পারে? অপর এক আয়াতে এরশাদ করেন–

وَ مَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا

যাকে হিকমত (প্রজ্ঞা) দান করা হয়েছে বস্তুতঃ তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে। (সূরা তাওবা–২৬৯)

এবং فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ

যদি তোমরা না জান তবে আহলে যিকির (অভিজ্ঞ ব্যক্তি বর্গ) কে জিজ্ঞেস করো (নূরা নাহল–৪৩)

এ সকল আয়াতে ক্রমানুসারে تَفَقُّه فِى الدِّيْن (দ্বীনি জ্ঞান) حِكْمَة (প্রজ্ঞা) দ্বারা ফিকহ শাস্ত্র ও اَهْلِ ذِكْر দ্বারা ফেকহ শাস্ত্রবিদ বুঝান হয়েছে।

সুন্নাহ ও ইলমে ফিক্‌হ ঃ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

(١) لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَ عِمَادُ هٰذَا الدِّيْنِ الْفِقْهُ ـ

(ক) অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর খুঁটি আছে, এ দ্বীনের খুঁটি হলো ফিক্‌হ।

(٢) فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ ـ

(খ) একজন ফকীহ শয়তানের নিকট সহস্র মূর্খ আবেদের তুলনায় অধিক কঠিন।

(٣) مَجْلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً ـ

(গ) ফিকহের মজলিস ষাট বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেয়।

(٤) مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ ـ

(ঘ) আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।

উপরোক্ত আয়াত সমূহে এবং হাদীসের দৃষ্টিতে ইল্‌মে ফিকহের অসাধারণ গুরুত্ব ও ফযীলত সহজে অনুমেয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন–

اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ اَلْفِقْهُ لِلْاَدْيَانِ وَ عِلْمُ الطِّبِّ لِلْاَبْدَانِ وَمَا وَرَاءَ ذَالِكَ بُلْغَةُ مَجْلِسٍ

অর্থাৎ ইল্‌ম তো মাত্র দু ধরনেরই (ক) ইলমে ফিকহ যা ছাড়া ধর্মীয় বিষয়ে অন্ধ থাকতে হয়। (খ) ইলমে তিব্ব-চিকিৎসা শাস্ত্র, যা দ্বারা স্বাস্থ্যের সুস্থতা লাভ হয়। এ দুটি ছাড়া বাকী সব বিদ্যা রিপু তাড়িত বৈ নয়।

জনৈক কবি বেশ চমৎকর উক্তি করেছেন–

تَفَقَّهْ فَاِنَّ الْفِقْهَ اَفْضَلُ قَائِدٍ + اِلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى وَاَعْدَلُ قَاصِدٍ ـ

هُوَ الْعِلْمُ الْهَادِىْ اِلَى سُنَنِ الْهُدٰى + هُوَ الْحِصْنُ يُنْجِىْ مِنْ جَمِيْعِ الشَّدَائِدِ ـ

فَاِنَّ فَقِيْهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا + اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ ـ

যুগে যুগে ইলমের ফিক্‌হ

স্বর্ণ যুগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে দু'ধরনের সাহাবী ছিলেন। একঃ যারা হাদীস হিফ্‌য ও সংরক্ষণ ও বর্ণনার কাজে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকতেন। যেমন– হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ), আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) প্রমুখ। দুইঃ যারা কুরআন, সুন্নাহ গবেষণা করে শাখাগত মাসায়েলের সুষ্ঠু সমাধান বের করার কাজে বেশী মনোযোগী থাকতেন। যেমন হযরত আলী (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ। এ সকল মনীষী হাদীসে নববীকে পূর্ণ তাহকীক ও গবেষণার মাধ্যমে শরীআত স্বীকৃত নীতিমালা অনুযায়ী যাঁচাই করে তার পর তাকে আমলের জন্যে বাছাই করতেন। এদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাবেয়ীনের যুগে মদীনা তায়্যেবা ছিল দারুল হিজরত ও নবুওয়্যাতের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। এ কারণে উলূমে নববীয়ার মূলকেন্দ্র ও মারকায হওয়ার গর্ব এ মোবারক নগরীর ভাগ্যে জুটেছিল। সুতরাং নববী যুগ হতে শুরু করে হযরত আলী (রাঃ) এর খেলাফত আমল পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম বিশ্বের এটাই কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সাহাবায়ে কেরামের যুগে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইল্‌ম চর্চায় অত্র নগরি সদা মুখরিত থাকত। তাবেয়ীনের যুগে "ফুকাহায়ে সাবআ" (প্রসিদ্ধ সাতজন ফকীহ) এখানেই ছিলেন। ইমাম ইবনে মোবারক বর্ণনা করেন– যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা পেশ আসত এ সাত জন উক্ত ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করতেন। তার সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কাযী সে বিষয়ে কোন ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত দিতেন না।

ফুকাহায়ে সাবআ- মদীনার সপ্ত ফকীহ বলতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্য। যথা- ১। সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (রাঃ) (মৃত্যু ৯৪ হিঃ) ২। উরওয়া ইবনে যুবায়র ইবনে আওয়াম (রাঃ) (মৃত্যু ৯৪ হিঃ) ৩। কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রাঃ) (মৃত্যু ১০৮ হিঃ) ৪। খারেজা ইবনে যায়দ ইবনে সাবেত (রাঃ) (মৃত্যু ৯৯ হিঃ) ৫। উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উৎবা ইবনে মাসউদ (রাঃ) (মৃত্যু ৯৮ হিঃ) ৬। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (রাঃ) (মৃত্যু ১০৯ হিঃ) ও ৭। আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) অথবা সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ হলবী (রঃ) (মৃত্যু ৬১৪ হিঃ) অত্র সাতজনকে এভাবে ছন্দবদ্ধ করেছেন

اَلا اِنَّ مَن لَّايَقْتَدِىُ بِائِمَّةٍ + فَقِسمَتُهُ ضِيأى مِنَ الْحَقِّ خَارِجَة

فَخُذْهُمْ عُبَيْدُ اللهِ ، عُرْوَةُ ، قَاسِمٌ + سَعِيْدٌ ، اَبُوْ بَكْرٍ، سُلَيْمَانُ ، خَارِجَةُ

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দির তৃতীয় দশক হতে ইলমে ফিকহ সম্পাদনার কাজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে সূচিত হয়, সে সময় হতে বর্তমান পর্যন্ত ইলমে ফিকহের ক্রমবিকাশমান ধারাকে মোটামুটি তিন স্তরে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম স্তর ঃ গবেষণা ও সংকলনের যুগ- এ যুগে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফিক্‌হ শাস্ত্র সম্পাদনার কাজ শুরু করেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় এ কাজ সম্পন্ন করে যান। একারণে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) কে ইলমে ফিকহর প্রথম সংকলক বা স্থপতি বলা হয়। এ কাজের জন্যে তিনি এক হাজার শিষ্যের মধ্যে বিশিষ্ট চল্লিশজন বাছাই করে ফিকহ বোর্ড বা মসলিসে শূরা গঠন করেন। মাসআলার সমাধানের নীতি নির্ধারণ কল্পে উসূলে ফিক্‌হ নামক অপর একটি শাস্ত্র ও এ সময় সম্পাদিত হয়। অতএব ফিকহ ও উসূলে ফিক্‌হ উভয় শাস্ত্রই এ যুগে সূচিত হয়। দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতে তৃতীয় শতাব্দির শেষ পর্যন্ত সময়কে ফিকহ সংকলনের প্রথম স্তর গণ্য করা হয়।

দ্বিতীয় স্তরঃ পূর্ণতা ও তাকালীদের যুগ- এ যুগটি চতুর্থ শতাব্দির শুরু হতে সপ্তম শতাব্দিতে আব্বাসীয় খেলাফতের পতন পর্যন্ত শেষ হয়। এ যুগেই সাধারণতঃ তাকলীদ বা মাযহাব অবলম্বনের প্রচলন হয়। সাধারণ মানুষ এবং আলেমগণ ও কোন না কোন মাযহাবের অনুসরণ করেন। ইজতিহাদের ধারা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। মাসআলা ইস্তিম্বাত বা বের করা পর্যন্ত ইজতিহাদের সীমা নির্ধারিত হয়। আলেমগণের মধ্যে যিনি যে মাযহাবের অনুসারী হন তিনি উক্ত মাযহাব ও উসূলের ভিত্তিতে ফিক্‌হ গ্রন্থ রচনা করেন। সাধারণ শ্রেণীর ইমাম ও মুজতাহিদগণের মাযহাব সুবিন্যস্ত ও সন্নিবেশিত না থাকার কারণে কালের পরিক্রমায় তাঁদের অনুসারী লোপ পেতে থাকে। পরিশেষে মাযহাব চতুষ্টয়ের ওপর হক মাযহাব সীমিত হয়ে যায়, এবং এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় স্তর ঃ তাকলীদের যুগ- হিজরী সপ্তম শতাব্দির মধ্য ভাগ তথা আব্বাসীয় শাসনের অবসানের পর হতে এ যুগ সূচিত হয়। এ যুগে ইজতিহাদের ধারা ও প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের ইমাম-মুজতাহিদ ও তাঁদের অনুসারী বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম এমনভাবে মাসায়েল সংকলন ও সন্নিবেশিত করেন যে, এখন আর ইজতিহাদের প্রয়োজন পড়ে না। অবশ্য যদি এমন কোন নিত্য-নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয় যার স্পষ্ট সমাধান পাওয়া যায় না সে বিষয়ে মৌলিক নীতিমালা তথা উসূলে ফিকহের আলোকে বিচক্ষণ আলিমগণের জন্যে ইজতিহাদের পথ কিয়ামত অবধি উন্মুক্ত থাকবে। উল্লেখ্য যে, এ স্তরে ও বহু ফেকহী গ্রন্থ রচিত হয়। তবে সেগুলো প্রথম ও দ্বিতীয় যুগে রচিত গ্রন্থের টীকা, ব্যাখ্যা বা সংক্ষিপ্ত রূপ মাত্র। এক একটি বিষয়ে তিন দিন পর্যন্ত আলোচনা-পর্যালোচনা চলতো। অতঃপর স্থিরকৃত মতটি লিপিবদ্ধ করা হতো। আল্লামা সীমরী (রঃ) লিখেন- ইমাম সাহেব (রঃ) এর শিষ্যদের মধ্যে যতক্ষণ আফিয়া ইবনে ইয়াজিদ (রঃ) উপস্থিত না হতেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মুলতবী রাখতেন। তিনি উপস্থিত হয়ে কোন এক মতের সাথে একমত পোষণ করলে তখন তা চূড়ান্ত রূপে লিপিবদ্ধ করতে বলতেন। অন্যথায় সে বিষয়ে আরো গবেষণার নির্দেশ দিতেন। সর্বশেষ মতের সাথে একমত পোষণ না করতে পারলে তিনি স্বমতের পক্ষে দলীল-প্রমাণ পেশ করতেন। সকলে তাতে একমত হলে তা مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ সর্বৈক্য মত রূপে নইলে مُخْتَلَفٌ فِيْهِ রূপে তাদের নামসহ তাদের মত লিপিবদ্ধ করা হতো।

বস্তুতঃ ইমাম সাহেব (রঃ) যেভাবে ফিকহ্ শাস্ত্র সংকলনের কাজ আঞ্জাম দেন তা এমনই এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব যার দৃষ্টান্ত অনৈসলামিক ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এ পদ্ধতিতে তিনি ইমাম মালেক (রঃ) এর বর্ণনা মতে ষাট হাজার এবং আবু বকর ইবনে আতীক (রঃ) এর ভাষ্যমতে পাঁচ লক্ষ মাসায়েলের সুষ্ঠু সমাধান প্রদান করেন। খতীব খাওয়াযমীর বর্ণনা মতে, পাঁচ লক্ষ মাসায়েলের মধ্যে আটত্রিশ হাজার মাসায়েল ইবাদত সংক্রান্ত, আর অবশিষ্ট মাসায়েল মোয়ামালাত বিষয়ক।

طَبَقَاتُ الْفُقَهَاءِ (ফকীহগণের স্তরসমূহ) ঃ ফিকহ শাস্ত্রবিদ গণ সাত স্তরে বিন্যাস্ত। যথা–

১. প্রথম স্তর اَلْفَقِيْهُ الْمُجْتَهِدُ فِى الدِّيْنِ ঃ ইজতিহাদের পূর্ণাঙ্গ শর্তাবলীর অধিকারী ফকীহগণ। যথা ১। *ইমাম আযম আবু হানীফা (রঃ) ২। ইমা শাফেয়ী (রঃ) ৩। ইমাম মালেক (রঃ) ৪। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল* (রঃ) ৫। ইমাম আওযায়ী (রঃ) ৬। ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রঃ) ৭। ইমাম দাউদ যাহেরী (রঃ) ৮। ইমাম তাবারী (রঃ) প্রমুখ।

২. দ্বিতীয় স্তর اَلْفَقِيْهُ الْمُجْتَهِدُ فِى الْمَذْهَبِ ঃ মাযহাবের স্বীকৃত উসূলের ভিত্তিতে ইজতিহাদকারী ফকীহগণ। যথা–ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ২। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) ৩। ইমাম যুফর (রঃ) ৪। ইমাম ইব্রাহীম নাখয়ী (রঃ) প্রমুখ। এ সকল মনীষী হানাফী উসূলের ভিত্তিতে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস হতে মাসআলার সমাধান বের করতেন।

৩. তৃতীয় স্তর– اَلْفَقِيْهُ الْمُجْتَهِدُ فِى الْمَسَائِلِ ঃ প্রথম স্তরের ইমামগণ কর্তৃক ইস্তিম্বাতকৃত মাসায়েলে তাঁদের গৃহীত নীতিমালার ওপর গবেষণাকারী ফকীহগণ। যে সকল বিষয়ে ইমামদের থেকে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই সে বিষয়ে তারা ইজতিহাদ করতেন। মূলতঃ মাযহাব প্রবর্তক ইমামের মতের সাথে ভিন্ন মত প্রকাশের অধিকারী নন। যথা–১। ইমাম আবু বকর খস্সাফ (রঃ) ২। ইমাম তহাবী (রঃ) ৩। ইমাম কারখী (রঃ) ৪। শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী (রঃ) ৫। শামসুল আইম্মা সরখসী (রঃ) ৬। ফখরুল ইসলাম বযদবী (রঃ) ৭। কাযী খাঁন (রঃ) প্রমুখ।

৪. চতুর্থ স্তর اَصْحَابُ التَّخْرِيْجِ ঃ পূর্ববর্তী ইমামগণের ফতোয়ার দলীল প্রমাণ বের করার কাজে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা ইজতিহাদের ক্ষমতা সম্পন্ন নন। তবে ইজতিহাদের সকল উসূল তাদের আয়ত্বে। এ কারণে কোন মুজতাহিদের অনুসরণে দ্বিমুখী অস্পষ্ট উক্তির ব্যাখ্যা ও একটিকে প্রাধান্য দিতে সক্ষম। যথা–১। ইমাম আবু বকর জাস্সাস রাযী (রঃ) প্রমুখ।

৫. পঞ্চম স্তর– اَصْحَابُ التَّرْجِيْحِ ঃ দলীল প্রমাণ ও যুক্তির আলোকে একই প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামতের মধ্যে একটিকে প্রাধান্যদানের অধিকারী ফকীহগণ। যথা ১। হেদায়া প্রণেতা আল্লামা বুরহানউদ্দীন আল মুরগীনানী (রঃ) ২। আল্লামা আসবী জাবী (রঃ)। কারো কারো মতে আল্লামা কুদূরী (রঃ) এ স্তরের শামিল, কারো কারো মতে ৪র্থ স্তরে শামিল ছিলেন।

৬. ষষ্ঠ স্তর– اَصْحَابُ التَّمْيِيْزِ ঃ সবল-দুর্বল ইত্যাদি মতামতের মধ্যে পার্থক্যকারী ফকীহবৃন্দ। যথা–১। শামসুল আইম্মা কুদূরী (রঃ) ২। জামালুদ্দীন হাসীরি (রঃ) ও মুখতার, বেকায়া, মাজমা' ইত্যাদি গ্রন্থকারগণ।

৭. সপ্তম স্তর– مُتَّبِعِيْنَ الْمَذْهَبِ فَقَطْ ঃ মাযহাবের ফতোয়া অবগত উলামায়ে কেরাম, যারা উপরোক্ত কোন প্রকার দক্ষতার অধিকারীনন। এ স্তরটি মূলত তবকাতে ফুকাহার অন্তর্ভূক্ত নয়।

ফিক্হে হানফীর মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে মনীষীবর্গের মন্তব্য ঃ

(ক) য়াহ্য়া ইবনে সাঈদ কাত্তান (রঃ) বলেন- আমি আল্লাহ তাআলার সমীপে মিথ্যা বলতে পারব না, বাস্তব কথা এইযে, আবু হানীফা (রঃ)-এর ফেকহ এর ন্যায় উত্তম ফেকহ আমি কারোরটি পায়নি। একারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি তার ফিকহ গ্রহণ করেছি।

(খ) ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন- ফিকহ শাস্ত্রে সকল মানুষ ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর মুখাপেক্ষী। তিনি আরো বলেন- ফিকহ শাস্ত্রে যে ব্যক্তি পান্ডিত্য লাভ করতে চায় তার জন্যে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও তাঁর শিষ্যগণের শরণাপন্ন হওয়া অপরিহার্য। কারণ (কুরআন-সুন্নাহর) অর্থ ও তত্ত্ব তাঁর নখদর্পণে ছিল, আল্লাহর শপথ। আমি ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর কিতাবের মাধ্যমেই ফিকাহশাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেছি।

(গ) নযর ইবনে শুমায়ল (রঃ) বলেন - ফিকহ সম্পর্কে মানুষ অনবহিত ছিল, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ই মানুষকে এ ব্যাপারে সজাগ করেছেন।

(ঘ) ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর শিষ্য মাআ'ন (রঃ) লিখেন-

اَبُو حَنِيفَةَ اَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ هٰذَا الْفِقْهَ وَاَفْرَدَهُ بِالتَّالِيفِ مِنْ بَيْنِ الْاَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ فَبَدَأَ بِالطَّهَارَةِ ثُمَّ بِالصَّلٰوةِ ثُمَّ سَائِرَ الْعِبَادَاتِ ثُمَّ الْمُعَامَلَاتِ اِلٰى اَنْ خَتَمَ بِالْمَوَارِيثِ

(ঙ) য়াইয়া ইবনে মুঈন (রঃ) বলেন- ফিকহ তো কেবল ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর ফিক্হই।

(চ) শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) ফুয়ুযুল হরামায়নে লিখেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন- "হানাফী মাযহাব একটি উত্তম তরীকা, ঐ সুন্নাহর সাথে অতিশয় অনুকূলে যা ইমাম বুখারী ও সম সাময়িক মুহাদ্দিসগণ সংকলন ও সম্প্রসারণ করেছেন।

ফিকহে হানাফীর বিস্তৃতি ঃ

ফিকহে হানাফী যেহেতু একজনের সংকলিত নয়, বরং শীর্ষস্থানীয় ফুকাহায়ে কেরামের সমন্বয় গঠিত বোর্ডের সুচিন্তিত গবেষণার ফল। এ কারণে মানব জীবনে ঘটমান ও ঘটতব্য সমস্যাবলীর সঠিক সমাধান অতি সুস্পষ্টরূপে প্রদান করা হয়েছে এতে। যে কারণে মুসলিম বিশ্বের বেশীরভাগ মানুষ এটাকে আমলের জন্যে গ্রহণ করেছে। সূফী-সাধকগণের অধিকাংশই এ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন- যেমন- হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহম, শাকীক বলখী, মা'রূফ কারখী, আবু ইয়াযীদ বুস্তামী, ফুযায়ল ইবনে আয়ায, দাউদ তায়ী, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, আবু বকর অর‍্যাক. আব্দুল কাদের জীলানী, মঈনুদ্দীন চিশতী প্রমূখ রহেমাহুমুল্লাহ বাগদাদ , মিশর, রোম, বলখ. বুখারা, সমরকন্দ. ইসপাহান, আজার বাইজান, ফরগান. যনজান, তূস, বুস্তাম, উস্তারাবাদ. মুরগীনান, গজনা, কেরমান, পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, বাংলাদেশ, মালোয়েশিয়া, আফ্রিকা, দাকান, ইয়ামেন প্রভৃতি নগর ও দেশের অধিকাংশই এ মাযহাবের অনুসারী।

طَبَقَاتُ الْمَسَائِلِ وَطَبَقَاتُ الْكِتَابِ (ফিকহী মাসায়েলও গ্রন্থের স্তরসমূহ) ঃ হানফী ফিকহের মাসায়েলের তিনটি স্তর–

(ক) যাহিরুর রিওয়ায়ার মাসায়েল। একে মাসায়েলে উসূল ও বলা হয়। এ গুলো হলো ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) সংকলিত দু'টি গ্রন্থের মাসায়েল। এগুলোতে তিনি ইমাম আবু হানীফা (রঃ), আবু ইউসুফ (রঃ) ও নিজস্ব ঐক্যমত ভিত্তিক ও মত বিরোধীয় সকল মাসায়েল লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্ত উসূলী বা বুনিয়াদী কিতাব ছ'টি হলো- ১। মাবসূত (এর অপর নাম- আসল) ২। যিয়াদাত, ৩। জামে' সগীর ৪। জামে' কবীর, ৫। সিয়ারে সগীর ও ৬। সিয়ারে কবীর।

(খ) নাওয়াদিরুর রিওয়ায়াহ, এগুলো বলতে ঐ সকল মাসআলা বুঝায় যা আয়েম্মায়ে ছালাছা কর্তৃক বর্ণিত। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর সংকলিত উক্ত ছ'কিতাব বর্হিভূত।

(গ) নাওয়াযিল ও ওয়াকিআ'ত। এ দ্বারা ঐ সকল মাসায়েল বুঝায় যা পরবর্তী উলামায়ে কেরাম প্রয়োজন সাপেক্ষে এস্তেম্বাত করেছেন। পূর্বের কিতাবাদিতে যে সম্পর্কে ইমামগণের থেকে কোন বর্ণনা ছিল না। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম ইমাম ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (রঃ) "কিতাবুন্নাওয়াযিল রচনা করেন। পরবর্তীতে সংকলিত মাজমূউন্নাওয়াযিল ওয়াল ওয়াকিআত ও কাযীখান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ফিকহে হানফীর সংকলন রচনা ইত্যাদি বিষয়ে নিম্নোক্ত ছন্দ দুটি স্মর্তব্য-

اَلْفِقْهُ زَرْعُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَ عَلْقَمَةُ + حَصَّادُهُ ثُمَّ اِبْرَاهِيْمُ دَوَّاسُ ـ

نُعْمَانُ طَاحِنُهُ يَعْقُوْبُ عَاجِنُهُ + مُحَمَّدٌ خَابِزٌ وَالْاٰكِلُ النَّاسُ ـ

অর্থাৎ ফিক্‌হে হানফীর বীজ বপনকারী হলেন আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) হযরত আলকমা (রঃ) হলেন উহার ফসল কর্তনকারী, ইব্‌রাহীম নাখয়ী' (রঃ) উহা পরিষ্কারকারী। আবু হানীফা নো'মান (রঃ) উহা দ্বারা আটা পেষণকারী, আর আবু ইউসুফ ইয়াকূব (রঃ) হলেন খামীরা তৈরীকারী, ইমাম মুহাম্মদ (রাঃ) হলেন- রুটি প্রস্তুতকারী, আর সকল মানুষ উহা ভক্ষণকারী।

ফিকহী বিধান ও তার প্রকারভেদ ঃ

শরয়ী'বিধান মূলতঃ দু'প্রকার। অর্জনীয় ও বর্জনীয়। প্রথম প্রকার আবার দু'ভাগে বিভক্ত- আযীমত, (আবশ্যিক) ও রুখসাত (শিথিলতা সম্পন্ন)। আযীমত বলতে এমন বিধান উদ্দেশ্য যা মৌলিকভাবে পালন কাম্য, সংশ্লিষ্টরূপে নয়। আর রূখসত বলতে ঐ সকল আমল উদ্দেশ্য যা ক্ষেত্র বিশেষ পালনের হুকুমে শীথিলতা সম্পন্ন। আযীমত আবার চার প্রকার- ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল।

অর্জনীয় আমর ও তার প্রকারভেদ ঃ

فرض ঃ ফরয শব্দটি আবশ্যক, ভাগ, সীমাবদ্ধ করণ, সাব্যস্ত করণ ইত্যাদি প্রায় ৩০ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরিভাষায় শরয়ী' অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত আবশ্যকীয় বিষয়কে ফরয বলে।

ফায়েদা ঃ শরয়ী' দলীল চার ভাগে বিভক্ত-

(১) قَطْعِيُّ الثُّبُوتِ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ- যা প্রমাণিত ও অর্থ স্পষ্ট হওয়ায় অকাট্য (সন্দেহের অবকাশ মুক্ত)। যেমন- কুরআন ও হাদীসে মুতাওয়াতির।

(২) قَطْعِيُّ الثُّبُوتِ ظَنِّيُّ الدَّلَالَةِ- প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে অকাট্য, অর্থ ও উদ্দ্যেশের ক্ষেত্র সন্দেহযুক্ত। যথা- ব্যাখ্যা সাপেক্ষ আয়াত ও হাদীস সমূহ।

(৩) ظَنِّيُّ الثُّبُوتِ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ- প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহযুক্ত, অর্থ ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে অকাট্য। যথা- خبر واحد বা এক সনদে বর্ণিত হাদীস যা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ নয়।

(৪) ظَنِّيُّ الثُّبُوتِ ظَنِّيُّ الدَّلَالَةِ- প্রমাণ ও অর্থ-উদ্দেশ্য উভয় ক্ষেত্রে সন্দেহযুক্ত। যথা- এক সনদে বর্ণিত ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হাদীস।

প্রথম প্রকারের দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিষয় ফরয, দ্বিতীয় প্রকার দ্বারা ওয়াজিব তৃতীয় প্রকার দ্বারা সুন্নতে মুয়াক্কাদা এবং চতুর্থ প্রকার দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়।

(১) ফরযের প্রকারভেদ – ফরয দু'প্রকার

(ক) ফরযে আইন ঃ যা মুকাল্লাফ তথা শরীআ'তের বিধান বর্তিত সকল নর-নারীর জন্য পালন আবশ্যক।

(খ) ফরযে কিফায়া ঃ যা পালন সকলের ওপর অত্যাবশ্যক নয়। বরং ব্যক্তি বিশেষের পালনের দ্বারা সকলে দায়মুক্ত হয়ে যায়। উভয় ফরয অস্বীকারকারী কাফেরও ফাসেক বিবেচিত হয়।

২। **ওয়াজিব ঃ** যা প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য নয়, যেমন- বিতর নামায, সাদকায়ে ফিত্‌র প্রভৃতি। আমলের ক্ষেত্রে ফরয, বিশ্বাস বা এ'তেকাদের ক্ষেত্রে নফল, এর অস্বীকারকারী কাফের নয়।

৩। **সুন্নত ঃ** সুন্নতের শাব্দিক অর্থ তরীকা, রীতি-নীতি প্রথা পরিভাষায় - যে আমল করার দ্বারা সওয়াবের অধিকারী হয়, না করলে শাস্তিও ভৎসর্নাযোগ্য হয় না, তাকে সুন্নত বলে।

আল্লামা আয়নী (রঃ) সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত সংজ্ঞারূপে নিম্নের সংজ্ঞাটি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যা (পালন অত্যাবশ্যকীয় না হওয়া সত্ত্বে) সর্বদা পালন করেছেন, তাকে সুন্নত বলে।

সুন্নতের প্রকারভেদঃ সুন্নত দু'প্রকার। যথা- **(১) সুন্নতে হুদা :** ইবাদত সংশ্লিষ্ট। এটি আবার দু'প্রকার-**(ক) সুন্নতে মুয়াক্কাদা ঃ** যা ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অবিরতভাবে পালন করেছেন।

(খ) সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যা অধিকাংশ সময় পালন করেছেন। কখনো বা পরিত্যাগ করেছেন। এর অপর নাম মুস্তাহাব ও মানদূব।

(২) সুন্নতে যায়িদা ঃ অভ্যাসগত বিষয় সংশ্লিষ্ট।

৪। নফল ঃ নফলের শাব্দিক অর্থ অতিরিক্ত। পরিভাষায় - ফরয ও ওয়াজিবের অতিরিক্ত বিষয়কে নফল বলে। এ হিসেবে এটা সুন্নতের উভয় প্রকারকে শামিল করে।

বর্জনীয় আমলের প্রকারভেদঃ বর্জনীয় বা নিষিদ্ধ বিষয় প্রথমতঃ দু'প্রকার।

১। হারাম ঃ যা অকাট্য ও স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যেমন মদ্যপান, সূদ প্রভৃতি।

২। মাকরূহ ঃ যা অকাট্য ও স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাকরূহ আবার দু'প্রকার।

১। মাকরূহে তাহরীমি ঃ যা সন্দেহযুক্ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যেমন– দাবা খেলা, কচ্ছপ খাওয়া প্রভৃতি। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) মাকরূহ তাহরীমিকে হারামের একটি প্রকার আখ্যা দিয়েছেন। শায়খাইন (রঃ) এর মতে এটা হারাম ও হালাল কোনটির অন্তর্ভূক্ত নয়। তবে হারামের নিকটবর্তী।

২। মাকরূহে তানযীহি ঃ যা গ্রহণ করা অপেক্ষা বর্জন শ্রেয়।

এক নজরে শরয়ী বিধানের প্রকারভেদঃ

শরয়ী বিধান

- আমর (পালনীয়)
  - আযীমত
    - ফরয
      - আইন
      - কেফায়া
    - ওয়াজিব
    - সুন্নত
      - সুন্নাত হুদা
        - মুয়াক্কাদা
        - গায়রে মুয়াক্কাদা (মুস্তাহাব, মানদূব)
      - যায়িদা
    - নফল
  - রুখসত
- নাহী (বর্জনীয়)
  - হারাম
  - মাকরূহ
    - তাহরীমী
    - তানযীহী

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ঃ নো'মান, পিতার নাম সাবিত, উপনাম- আবু হানীফা, তিনি ৮০ হিজরী সনে উমাইয়া শাসক খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসন আমলে পারস্যের কূফা নগরে জন্মগ্রহণ বরেন। তাঁর দাদা হযরত আলী (রাঃ) এর খেলাফত আমলে ইসলাম গ্রহণ করেন।

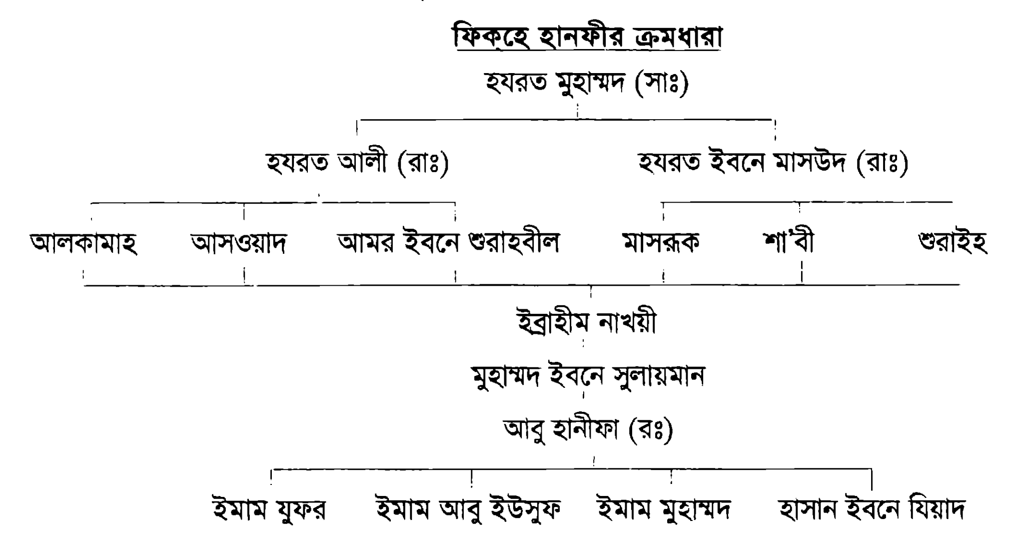
শৈশব হতেই তিনি অসাধারণ জ্ঞান ও মেধার অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন ব্যবসায়ী। সে মতে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি পৈত্রিক ব্যবসায় সহায়তা করেন। প্রায় ১৭ বৎসর বয়সে তিনি উচ্চ জ্ঞানার্জনে ব্রতী হন। প্রথম পর্যায়ে ইলমে কালাম তথা দর্শন শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেন। অতঃপর কুরআন সুন্নাহর অতল সাগরে ডুব দেন, এবং সম-সাময়িক উলামায়ে কেরামের মাঝে অনন্য বিজ্ঞরূপে সুখ্যাতি লাভ করেন। ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে তিনি মক্কা-মদীনাসহ বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। প্রায় চার সহস্র উস্তাদের নিকট হতে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিক্হর ইলম হাসিল করেন।

তিনি বেশ কতিপয় সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেন, তন্মধ্যে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আবী আওফা (রঃ), হযরত সাহল ইব্‌নে সা'দ সাঈদী (রঃ), হযরত আবু তুফাইল আমর ইব্‌নে ওয়াসেলা (রাঃ) এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইমামগণের মধ্যে একমাত্র তাঁরই তাবেয়ী' হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) সর্বপ্রথম ইল্‌মে ফিক্‌হকে সতন্ত্ররূপ দান করে বিশ্ব মুসলিমের জন্যে অনন্য উপহার স্বরূপ রেখে যান। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেন- اَلنَّاسُ فِى الْفِقْهِ عِيَالُ اَبِى حَنِيْفَةَ ফেকহ শাস্ত্রে মানুষ আবু হানীফা (রঃ) এর মুখাপেক্ষী।

ইমাম সাহেব (রঃ) এর অসাধারণ ইল্‌ম ও বিচক্ষণতা লক্ষ্য করে তদানিন্তন কালের খলীফা মানসূর তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করার জন্যে আবেদন করেন; কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করার ফলে খলীফার রোষানলে পতিত হন। এক পর্যায়ে তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হয়। অতঃপর কারাগারেই খাদ্যের সাথে গোপনে বিষ প্রয়োগের দরুন ১৫০ হিঃ সনে শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেন। ইরাকের কুফা নগরীতে তিনি সমাহিত হন।

ফিক্‌হে হানফীর ক্রমধারা



ফিক্‌হ শাস্ত্রের কতিপয় জরুরী পরিভাষা

★ مُتَقَدِّمِيْن (মুতাকাদ্দিমীন) ঃ ইমাম আবু হানীফা ও সাহিবাইন (রঃ) এর সম সাময়িক ফকীহগণ। কারো মতে ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) পর্যন্ত পূর্বের সকল ফুকাহায়ে কেরাম।

✪ مُتَاَخِّرِيْن (মুতাআখ্যিরীন) ঃ মুতাকাদ্দিমীনের পরবর্তী ফকীহগণ। কারো মতে মুহাম্মদ (রঃ)-এর পর হতে হাফেযুদ্দীন বুখারী (রঃ) পর্যন্ত ফকীহগণ।

আল্লামা যাহবী (রঃ) হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বের ফকীহগণকে মুতাকাদ্দিমীন ও পরবর্তীগণকে মুতাআখ্যিরীন আখ্যা দিয়েছেন।

✪ اَئِمَّةُ اَرْبَعَه (আইম্মায়ে আরবাআ) মাযহাব চতুষ্টয়ের প্রবর্তকগণ। অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম মালেক (রঃ) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ)।

✪ اَئِمَّةُ ثَلَاثَه (আইম্মায়ে ছালাছা) ঃ ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)।

✪ شَيْخَيْن (শায়খাইন) ঃ ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এ দুজন ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর উস্তাদ ছিলেন।

✪ صَاحِبَيْن (সাহিবাইন) ঃ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) উভয়ে আবু হানীফা (রঃ) এর শিষ্য। (৭ হিসেবে উভয়ে পরস্পর সাথী।)

✪ طَرَفَيْن (তরফাইন) ঃ ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) (উস্তাদ-শিষ্য হওয়ায় দুদিকের দু'জন হলেন।)

✪ سَلَف و خَلَف (সলফ ও খলফ) ইমাম আবু হানীফা (রঃ) হতে ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) পর্যন্ত ফকীহগণ সলফ ও তৎপরবর্তী হতে ইমাম শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী পর্যন্ত ফকীহগণ খলফ। (মাবাদিয়াতে ফিকহ)

- رِوَايَةُ الظَّاهِرِ (রিওয়াইয়াতুয্ যাহির) ঃ ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) সংকলিত ছ'টির কোন একটির বর্ণনা। গ্রন্থ ছ'টি হলো– জামে' সগীর, জামে' কবীর, সিয়ারে সগীর, সিয়ারে কবির, মাবসূত ও যিয়াদাত।
- كُتُبُ النَّوَادِرِ (কুতুবুন্নাওয়াদির) ঃ উপরোক্ত ছ'টি ছাড়া ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) সংকলিত অন্যান্য কিতাব।
- اَلصَّدْرُ الْاَوَّلُ (সদরুল আউয়্যাল) ঃ প্রথম তিন যুগ তথা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাবেয়ী'ন ও তাবঈ তাবেয়ী'নের যুগের ব্যক্তিবর্গ।

<u>চার মাযহাবের তাকলীদের কারণ</u>

হযরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) লিখেন– মাযহাব চতুষ্টয়ের কোন একটির অনুকরণের মধ্যে বহু কল্যাণ নিহীত রয়েছে। আর এ থেকে বিরত থাকার মধ্যে রয়েছে মারাত্মক ক্ষতির আশংকা। কেননা এ মাযহাবগুলো সলফ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত। এবং ঘটতব্য অধিকাংশ মাসায়েল এতে সন্নিবেশিত। এ চার মাযহাব ছাড়া অন্যান্য মাযহাব এতো সন্নিবেশিত নয়। এ কারণে বর্তমানে এচার মাযহাবের কোন একটির অনুসরণ আবশ্যক। উপরন্তু হাদীসে বড় জামাতের অনুসরণের কথা বলা হয়েছে, আর এ চারটিই বর্তমান বড় জামাত। নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুকরণ না করলে রিপুতাড়িত হয়ে কেবল সুবিধা মত রায়ের ওপর চলার প্রবণতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাই প্রকট যা ধ্বংস অনিবার্যকর হয়ে দেখা দেয়ার প্রবল সম্ভাবনা রাখে। অতএব চার মাযহাবের কোন একটির তাকলীদ জরুরী।

কুদূরী গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

- **নাম ও বংশ ঃ** নাম–আহমদ, উপনাম-কুনিয়াত আবুল হুসাইন। খ্যাতিনাম–কুদূরী, পিতার নাম মুহাম্মদ, বংশের ক্রমধারা এরূপ–আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে জাফর ইবনে হামদান আল বাগদাদী আল কুদুরী। গ্রন্থকার ৩৬২ হিঃ সনে ইরাকের বাগদাদ নগরে জন্মগ্রহণ করেন।
- **কুদূরী নামে খ্যাতির কারণ ঃ** প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে খালকান (রঃ) স্বীয় ইতিহাস অফায়াতুল আ'য়ান গ্রন্থে লিখেন قِدْرٌ - قُدُوْرِى (ডেগ) শব্দের বহুবচনের প্রতি সম্বন্ধিত। তবে এর কারণ আমি অবহিত নই। মদীনাতুল উলূম গ্রন্থকার লিখেন–এটা মূলতঃ قُدُوْر (ডেগ প্রস্তুত) শব্দের প্রতি সম্বন্ধিত। অথবা কুদূর নামক মহল্লার প্রতি সম্বন্ধিত।
- **জ্ঞানার্জন ঃ** নিজ মহল্লায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপনীর পর তিনি তৎকালীন খ্যাতিমান ফকীহ শায়খ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্য়া জুরজানী (রঃ) এর সাহচর্যে গমন করেন। তাঁর কাছে ইলমে তাফসীর, ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিক্হ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর আরো পাণ্ডিত্য লাভের লক্ষ্যে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিয খতীবে বাগদাদী (রঃ)-এর সান্নিধ্যে গমন করে হাদীস শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আবু বকর আহমদ ইবনে আলী খতীবে বাগদাদী (রঃ), কাযী মুফায্যল ইবনে মাসউদ তানূখী, কাযীউল কুযাত আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী (রঃ) প্রমুখ উল্লেখ যোগ্য।
- **কর্মজীবন ঃ** গ্রন্থকার শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর ইলমে দ্বীনের বিভিন্নমুখী খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। "মুখতাছারুল কুদূরী" গ্রন্থকারের অমরকীর্তি। মতবাদ নির্বিশেষে এ গ্রন্থটি সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছে। হেদায়া গ্রন্থকার তাঁর টীকা গ্রন্থে সর্বাধিক মুখতাসারুল কুদূরীর ভাষ্য গ্রহণ করে তার ব্যাখ্যা করেছেন।
- **গ্রন্থাকারের ফেক্হী মর্যাদা ঃ** আল্লামা ইবনে কামাল পাশা গ্রন্থকার ও হেদায়া প্রণেতাকে পঞ্চম স্তরের ফকীহ আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ উলামা তাঁকে তৃতীয় তবকার ফকীহ গণ্য করেছেন।
- **তিরোধান ঃ** ইমাম কুদূরী (রঃ) ৬৬ বৎসর বয়সে ৪২৮হিঃ সনের ৫ই রজব রবিবার দিনে বাগদাদ নগরে পরলোক গমন করেন। ঐ দিনেই 'দরবে আবী খলফ' কবরস্তানে সমাহিত হন। পরে তাঁর দেহকে 'শারে' মানসূরে স্থানান্তর করে আবু বকর খাওয়ারেযমী হানাফী (রঃ) এর পার্শ্বে সমাহিত করা হয়।
- **রচনাবলী ঃ** ১. মুখতাসারুল কুদূরী, ২. আত্তাজরীদ, এতে হানফী ও শাফেয়ী মাযহাবের মতবিরোধ পূর্ণ মাসায়েল সম্পর্কে বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে এবং যুক্তি প্রমাণের আলোকে হানফী মতবাদকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ৩. আত্তাকারীর, ৪. শরহে মুখতারুল কারখী, ৫. শরহে আদাবুল কাযী প্রভৃতি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ- قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ الْاَجَلُّ الزَّاهِدُ اَبُو الْحُسَيْنِ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرَ اَلْبَغْدَادِىُّ اَلْمَعْرُوْفُ بِالْقُدُوْرِىِّ

অনুবাদ ঃ পরম করুণাময় ও কৃপার আধার মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি। সমূদয় প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিমিত্তে। আর শুভ পরিণাম খোদা ভীরুদের জন্যে। পরিপূর্ণ রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর প্রতি। পরম শ্রদ্ধাভাজন, মহান জ্ঞান তাপস, সাধক, আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর বাগদাদী যিনি কুদূরী নামে সমধিক খ্যাত; বলেন–

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ উল্লেখের কারণ ঃ قَوْلُهُ بِسْمِ اللّٰهِ الخ গ্রন্থকার আল্লামা কুদূরী (র.) স্বীয় গ্রন্থকে নিম্নোল্লিখিত কোন কারণে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করেছেন। যথা–

১। কালামুল্লাহ শরীফের অনুকরণ। কেননা পবিত্র কুরআন বিসমিল্লাহ দ্বারাই সূচিত হয়েছে।

২। রাসূল (সা.) এর বানী كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَءْ بِاسْمِ اللّٰهِ فَهُوَا بَتَرٌ [গুরুত্বপূর্ণ যে কোন কাজ আল্লাহর নাম ছাড়া শুরু করলে তা বরকত শুণ্য হয়] এর উপর আমল তথা বরকত লাভের আশা পোষণকল্পে।

৩। অপরাপর সকল সালফে সালিহীন এর অনুকরণ কল্পে।

৪। অত্র পূণ্যময় কাজে শয়তানের প্রভাব হতে রক্ষা পাওয়া কল্পে। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন–

مَنْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَذُوْبُ الشَّيْطَانُ كَمَا يَذُوْبُ الرَّصَاصُ فِى النَّارِ-

(যে ব্যক্তি কোন কাজের শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ ..... পড়ে শয়তান এর দ্বারা বিগলিত হয়ে যায় যেমন আগুনে শিশা বিগলিত হয়।)

৫। অমুসলিম বিশেষতঃ প্রতিমা পূজারীদের বিরুদ্ধাচরণ কল্পে। কেননা তারা কাজের শুরুতে بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزّٰى (লাত ও উয্‌যার নামে) পড়ত।

৬। মহাবিচার দিবসে অধিক শাফায়াতকারী লাভের মানসে। কেননা আল্লাহ পাক বিস্‌মিল্লাহ পাঠকারীর জন্যে প্রতিটি হরফের বিনিময় একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেন। মহাপ্রলয় দিবস পর্যন্ত সে আল্লাহর গুণ-কীর্তন করতে থাকবে, এমনকি তার পরেও। এবং পাঠকের জন্যে দোয়ায়ে মাগফেরাত করতে থাকে।

৮। সর্বপ্রথম লিখিত বস্তুর অনুকরণ কল্পে। কেননা হাদীসে কুদসীতে আছে– আল্লাহপাক কলম সৃষ্টির পর সর্বপ্রথম তাকে লেখার আদেশ দিলে কলম বিস্‌মিল্লাহ দ্বারাই লেখা শুরু করে।

بِسْمِ اللّٰهِ الخ এর শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ بَا টি حَرْفِ جَارٌ - এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা– সাথে বা সহ, দ্বারা, হইতে, শপথ, সাহায্য, বরকত লাভ প্রভৃতি। এখানে প্রথমটি বা শেষোক্ত দুটির কোন একটি হতে পারে। اِسْمٌ শব্দটি এখানে নাম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ইহা سُمُوٌّ শব্দমূল হতে গঠিত, অর্থ উঁচু হওয়া, এর থেকেই سُمَاءٌ (অর্থ আকাশ) গঠিত হয়েছে।

اَللّٰهُ শব্দটি মূলত ঃ اَلْاِلٰهُ ছিল। اِلٰهٌ এর শাব্দিক অর্থ মাবূদ, উপাস্য। বাবে فَتَحَ হতে اَلَهَ يَأْلَهُ اِلٰهًا اُلُوْهِيَّةً এর অর্থ عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً-

اِلٰهٌ এর শুরুতে اَلِفْ وَلَامْ যোগ হওয়ায় اَلْاِلٰهُ হয়েছে। অতঃপর اِلٰهٌ এর হাম্‌যা বিলোপ করে ইদগাম করায় اَللّٰهُ হয়েছে। এটা বিশ্ব স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণ কর্তার নাম। যার অস্তিত্ব অবধারিত এবং সকল উত্তম গুণে পূর্ণাঙ্গ রূপে গুণান্বিত।

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ উভয়টি صِفَتِ مُشَبَّه এর ছীগা। رَحْمٌ শব্দমূল হতে উৎপত্তি। অতি দয়ালু। উভয়টির প্রায় একই অর্থ। তবে رَحِيْمٌ এর তুলনায় رَحْمٰنٌ এর মধ্যে একটি বর্ণ বেশী থাকায় এর মধ্যে মূল অর্থের অধিক্যতার গুণ বেশী। কেননা প্রসিদ্ধ আছে – كَثْرَةُ الْمَبَانِىْ تَدُلُّ عَلٰى كَثْرَةِ الْمَعَانِىْ (বর্ণের আধিক্যতা অর্থের আধিক্যতা বুঝায়) এ কারণে رَحْمٰنْ শব্দের দ্বারা উভয় জাগতিক করুণা ও رَحِيْم দ্বারা কেবল পারলৌকিক দয়া উদ্দেশ্য নেয়া হয়। অথবা رَحْمٰنْ ইহলৌকিক জগতে এবং رَحِيْم পরজগতে। কেননা। দুনিয়াতে মুসলিম অমুসলিম সকলের জন্যে তার দয়া বিদ্যমান। আর পরকালে কেবল মুসলিমদের জন্যে তার দয়া থাকবে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে رَحْمٰن শব্দটি رَحِيْم এর তুলনায় عَامْ বা ব্যাপকতা সম্পন্ন।

<u>তারকীব ঃ</u> ب -حَرْفِ جَار- اِسم শব্দটি مُضَاف ,اَللّٰه শব্দটি مَوْصُوف - اَلرَّحْمٰنُ প্রথম সিফত, اَلرَّحِيْم দ্বিতীয় সিফত, مَوْصُوف উভয় সিফত মিলে مُضَاف اِلَيه - অতঃপর مُضَاف ও مُضَاف اِلَيه মিলে مَجْرُوْر - جَار ও مَجْرُوْر মিলে সদা فِعْل বা شِبْهِ فِعْل এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়। উল্লেখ না থাকলে তা উহ্য মানতে হয়। এখানে جَارْ مَجْرُوْر কিসের সাথে مُتَعَلِّق হবে এ বিষয়ে মত বিরোধ রয়েছে। কারো মতে উহ্য শব্দটি فِعل কারো মতো شِبهِ فِعل-এর পর উহ্য শব্দটি শুরুতে না শেষে এ ব্যাপারেও মতবিরোধ, তবে সংখ্যা গরিষ্ঠের মতে শব্দটি شِبهِ فعل এবং তা শেষেই উহ্য।

اَلْحَمْدُ- ال টি اِسْتِغْرَاق (সামগ্রিকতা) বা جنس (জাতীয়তা) নির্দেশের। আর حَمْد অর্থ প্রশংসা, পরিভাষায় জবানের দ্বারা কারো অর্জিত গুণের কারণে প্রশংসা করা। পক্ষান্তরে مَدح ও شُكر অর্থ ও প্রশংসা, তবে مَدح অর্জিত গুণের কারণে হওয়া শর্ত নয়। বরং অর্জিত বা সৃষ্টি গত যে কোন কারণে হতে পারে। এজন্যে حَمِدتُ زَيدًا - مَدَحتُ زَيدًا এবং مَدَحتُ اللُّؤْلُؤَ ইত্যাদি বলা যায়। কিন্তু, حَمِدتُ اللُّؤْلُؤَ বলা যায়না। কেননা মুক্তার গুণ তার অর্জিত হতে পারেনা। সুতরাং উভয়টি প্রশংসা বোধক হলেও শব্দটি عَام বা ব্যাপকতা সম্পন্ন এবং حَمد শব্দটি خَاص বা সীমাবদ্ধ। অপরদিকে প্রশংসাবোধক আরেকটি শব্দ হল شُكر এটা করুণালাভের পর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক শব্দ। এটি حَمد ও مَدح উভয়টির তুলনায় একদিক দিয়ে খাছ (সীমিত)। কেননা حَمد ও مدح কৃতজ্ঞতা লাভের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু شكر কৃতজ্ঞতা লাভের সাথে খাস। তবে شُكر এর প্রকাশ যবানের সাথে খাছ নয়। বরং কোন অঙ্গের মাধ্যমে উপকার করার দ্বারাও শুকরিয়া প্রকাশ করা যায়। সুতরাং مَورِدْ তথা প্রকাশস্থলের দিক দিয়ে এটি আম (ব্যাপক)।

এ স্থলে حمد শব্দের পূর্বে উল্লিখিত الف لا টি اِستِغرَاقى হলে অর্থ হবে সমস্ত প্রশংসা, অর্থাৎ জগতে যত বস্তুর যত প্রশংসা হতে পারে তা সবই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহরই। কেননা তিনিই মূলত ঃ সব কিছুকে প্রশংসার উপযোগী করেছেন। সব কিছু তাঁরই অবদান। আর جنس উদ্দেশ্য নিলে অর্থ হবে– প্রশংসা বলতে যা বুঝে আসে তা আল্লাহরই জন্যে। অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে উভয়টি নিকটবর্তী।

رَبِّ ঃ رَبِّ শব্দটি কারো কারো মতে صِفَتِ مُشَبَّه এর ছীগা। কারো মতে اسم فاعل এর ছীগা, যা মূলতঃ رَابِبٌ ছিল। অধিকাংশের মতে মাসদার, اسم فاعل এর অর্থে। যেমন- زَيْدٌعَدْلٌ এর অর্থ زَيْدٌ عَادِلٌ -অর্থাৎ পালনকর্তা, বহুবচন أَرْبَابٌ -পরিভাষায় رَبِّ ঐ সত্বা কে বলে যিনি প্রতিটি বস্তুকে তার সামগ্রিক প্রয়োজনাদি পূর্ণরূপে পূর্ণাঙ্গতা বিধান করেন। এ অর্থে এটি আল্লাহ্ পাকের জন্যে খাছ। তবে মালিক অর্থে ও ব্যবহৃত হয় যথা - رَبُّ الْمَالِ (সম্পদের মালিক)।

اَلْعٰلَمِيْنَ ঃ عَالَمٌ শব্দের বহুবচন। অর্থ مَايُعْلَمُ بِهِ الصَّانِعُ (যার দ্বারা স্রষ্টা কে চেনা যায়) আর বিবেক ও চক্ষুস্মান ব্যক্তি মাত্রই সৃষ্টি জগতের সাধারণ হতে সাধারণ একটি বস্তুর মাঝে ও তার স্রষ্টা কে দেখতে পায়। যথা কবির ভাষায়- لِكُلِّ شَيْئٍ لَهُ شَاهِدٌ- تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ وَاحِدٌ

একারণে ব্যাপক অর্থে প্রতিটি সৃষ্টিই عَالَمٌ -পরিভাষায় এক একটি জগতকে عَالَمٌ বলে। এখানে সমগ্র জগত বুঝানের উদ্দেশ্যে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

قوله وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ঃ আল্লাহর প্রশংসা বন্দনার পর গ্রন্থকার সর্বাগ্রে মানুষকে চির সুখ শান্তি ও মহাসফলতা লাভে যাতে সবাই ধন্য হয়, রাহমানুর রাহীমের কল্পনাতীত নায নে'মত হতে বঞ্চিত হয়ে সীমাহীন আযাব ও গযবে নিপতিত না হয় বরং শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হওয়ার প্রয়াস পায় এ সবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কল্পে এ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন।

قوله اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ ঃ আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনার পর গ্রন্থকার নবীজী সা. তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপর দরুদ ও সালাম পাঠের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করেছেন। যা মানবিক বিচারে নিতান্ত জরুরী। কারণ যাদের মাধ্যমে স্রষ্টার পরিচয় মিলে, মাখলুক কে খালেকের সাথে মিলিয়ে দেওয়াই ছিল যাদের একমাত্র জীবন সাধনা তাঁদিগকে স্মরণ না করা অবশ্যই অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক।

قوله اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ঃ উভয়টি প্রায় সমার্থবোধক শব্দ। صَلٰوة সাধারণত রহমত ও কৃপা অর্থে এবং سلام শান্তি অর্থে ব্যবহৃত । رسول অর্থ مُرْسَلٌ (প্রেরিত)। পরিভাষায় যিনি আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে ঐশী গ্রন্থ ও নুতন শরীয়ত প্রাপ্ত তিনি হলেন রাসূল। আর নবী যিনি নুতন শরীয়ত প্রাপ্ত নয় বরং অন্য রাসূলের শরীয়তে অনুসারী হয়ে আল্লাহপাক কর্তৃক হেদায়েতের জন্য মনোনীত। অধিকাংশ আলিমদের মতে রাসূলের তুলনায় নবী ব্যাপকতা সম্পন্ন (আ'ম)। অর্থাৎ রাসূলের জন্যে নতূন শরীয়ত প্রাপ্ত হওয়া শর্ত, কিন্তু নবীর জন্যে এ শর্ত নয়। সুতরাং সকল রাসূল নবী; কিন্তু সকল নবী রাসূল নন।

قوله مُحَمَّدٌ ঃ محمد অর্থ প্রশংসিত, এ নামটি আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নাম। এর পূর্বে এ নামে অন্য কাউকে কখনো নাম রাখা হয়নি। বস্তুতঃ আমাদের নবীজী সা. দুনিয়ায় আগমনের পূর্বে তিনি ছিলেন احمد। (সর্বাধিক প্রশংসাকারী) আর দুনিয়াতে আবির্ভাবের পর তিনি হয়েছেন محمد (প্রশংসিত)।

قوله اَلشَّيْخُ الْاِمَامُ الخ - الشيخ শব্দটির মূল অর্থ বৃদ্ধ, প্রৌঢ়। পরিভাষায় শিক্ষক, গুরুজন, ধর্মীয় নেতা, শাস্ত্র বিশারদ ইত্যাদিকেও شَيْخ বলে-বহুবচনে شُيُوْخ । اَلْاِمَام নেতা, পণ্ডিত, দক্ষ শাস্ত্রিক, বহু বচনে -اَئِمَّةٌ اَلْاَجَلُّ মহান, সুউচ্চাসীন, পরম শ্রদ্ধেয় বহুঃ اَجِلَّاءُ- اَلزَّاهِدُ খোদাভীরু, সংযমী, পার্থিব চাকচিক্য বিরাগী।

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط فَفَرْضُ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْاَعْضَاءِ الثَّلٰثَةِ وَمَسْحُ الرَّأْسِ وَالْمِرْفَقَانِ وَالْكَعْبَانِ تَدْخُلَانِ فِىْ فَرْضِ الْغُسْلِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلٰثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ (رح) وَالْمَفْرُوْضُ فِىْ مَسْحِ الرَّأْسِ مِقْدَارُ النَّاصِيَةِ وَهُوَ رُبْعُ الرَّأْسِ لِمَا رَوٰى الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى النَّاصِيَةِ وَخُفَّيْهِ.

পবিত্রতা অধ্যায়

অনুবাদ ॥ উযূর ফরয সমূহ ঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন– "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের ইচ্ছে কর তখন স্বীয় মুখমন্ডল, কনুই পর্যন্ত হাত ও গিরা পর্যন্ত পা ধৌত কর। এবং তোমাদের মাথা মাস্হ কর।" সুতরাং (প্রমাণিত হল যে,) উযূর ফরয হল (চারটি) তিন অঙ্গ ধৌত করা, ও মাথা মাস্হ করা, আমাদের হানাফী তিন ইমাম (হযরত আবু হানীফা, আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ র.) এর মতে উভয় কনুই ও পায়ের গিরা ধৌত করা ফরয হওয়ার হুকুমে শামিল। ইমাম যুফর র. ভিন্নমত পোষণ করেন। মাথা মাস্হের ক্ষেত্রে ফরয হল– নাছিয়া পরিমাণ (মাথার অগ্রভাগ) অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ। কেননা হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম সা. কোন এক জনপদের আবর্জনা নিক্ষেপের স্থানে এসে পেশাব করলেন। অতঃপর উযূ করলেন ও মাথার অগ্র ভাগে ও উভয় মোজায় মাস্হ করলেন।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ পটভূমি ঃ ইসলামী জীবন ধারা মূলতঃ পাঁচ প্রকার বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যথা– ১. عَقَائِد (মৌলিক বিশ্বাস বা আকীদাগত) ২. عِبَادَات (ইবাদত-বন্দেগী, নামায রোযা প্রভৃতি) ৩. مُعَامَلات-(লেন দেন ইত্যাদি।) ৪. مُعَاشَرَات وَآدَابُ (ব্যবহার বা সামাজিক রীতিনীতি) ৫. مُجَازَاتُ (শাসন বা বিচার ব্যবস্থা)।

১ নং ও ৪ নং টি ফিক্হ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। বরং এদুটি ভিন্ন শাস্ত্রীয়রূপে ভিন্নাকারে গ্রন্থিত হয়েছে। এ কারণে গ্রন্থকার طَهَارَة দ্বারাই স্বীয় গ্রন্থকে শুরু করেছেন। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হল নামায। এর জন্য طَهَارَة অপরিহার্য। তাছাড়া রাসূল সা. ফরমায়েছেন– اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ পবিত্রতা অর্ধ ঈমান, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– اَللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্রতা অর্জন কারীদেরকে পসন্দ করেন।

قوله اَلطَّهَارَةُ ঃ শব্দটি বাবে نَصَرَ এর মাসদার অর্থ পবিত্রতা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা نجاست حقيقى و حُكمى তথা প্রকৃত ও বিধানগত নাপাকী হতে পবিত্রতা হওয়াকে طَهَارَة বলে। طهارة এর طاء বর্ণে হরকতভেদে অর্থের পরিবর্তন হয়। যথা- যবর হলে পবিত্রতা, পেশ হলে পবিত্রতা লাভের বস্তু, ও যের হলে পবিত্রতা লাভের বস্তু রাখার পাত্র। طهارة এর সকল শাখা বা প্রকারভেদকে শামিল করার উদ্দেশ্যে শুরুতে اَلِفْ ولامِ اِسْتِغْرَاقى (সামগ্রিকতাজ্ঞাপক আলিফ ও লাম) যুক্ত হয়েছে।

قوله قُمْتُمْ الخ ঃ উল্লিখিত আয়াতে قُمْتُمْ অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া উদ্দেশ্য নয়, যেমনটি জাহেরীগণ বলে থাকেন। বরং اَرَدْتُّمْ (ইচ্ছা পোষণ করা) উদ্দেশ্য। কারণ বাহ্যত দন্ডায়মান হওয়ার পূর্বেই পবিত্রতার্জন জরুরী। তাছাড়া প্রতিবারের নামাযের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উযূও জরুরী নয়। কারণ মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল সা. কর্তৃক একই উযূ দ্বারা একাধিক ওয়াক্তের নামায আদায় প্রমাণিত রয়েছে।

قوله فَاغْسِلُوْا ঃ غَسْل (ধৌত করা) শব্দ মূল হতে গঠিত অর্থ– পূর্ণাঙ্গে পানি প্রবাহিত করা। ফোটার নির্ঝরণ ঘটলে তাকে غَسْل বলে। পানি না ঝরলে غسل সাব্যস্ত হবে না। আর পেশ সহকারে غسل অর্থ গোসল বা স্নান করা।

قوله اِلَى الْمَرَافِقِ الخ ঃ مِرْفَقٌ (কনুই) এর বহু বচন مَرَافِق - كَعْبٌ অর্থ উঁচু স্থান, এর থেকে, كَاعِبَة (যুবতী)। আয়াতে কনুই পর্যন্ত ধোয়ার নির্দেশ এসেছে। কনুই ও টাখনুসহ ধুতে হবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম যুফর (র.)-এর মতে কনুই ও টাখনুর নিম্নাংশ পর্যন্ত ধোয়া জরুরী। এর দলীল হল– اِلَى অব্যয়টি তার পূর্বের বস্তুর শেষ সীমা বুঝায়। যেমন– اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ এর মধ্যে রোযা পালনের শেষ সীমা হল রাত পর্যন্ত। রাত পূর্বের নির্দেশের মধ্যে শামিল নয়। জমহুর তথা সংখ্যা গরিষ্ঠ ইমামগণের মতে কনুই ও টাখনু সহ ধোয়া জরুরী, তাঁদের মতে উপরোক্ত দলীলের উত্তর এই যে, الى এর ما قَبْل ও مَابَعد (তথা আগে-পরের বস্তুটি) যদি একই জাতীয় হয় তাহলে পরবর্তীটি পূর্ববর্তী অংশের মধ্যে শামিল হবে নতুবা নয়। যথা– اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسُهَا এর মধ্যে رَاسٌ শব্দটি سَمَكَة তথা মাছ খাওয়ার মধ্যে শামিল। আর এক জাতীয় না হলে দাখিল থাকবে না। যেমন উপরোক্ত আয়াতে দ্রষ্টব্য।

قوله وَاَرْجُلَكُمْ ঃ এর লামে যবর ও যের উভয় কিরাত বিদ্যমান। যবর পড়লে وَاَيْدِيَكُمْ এর উপর عطف হয়ে ধোয়ার বিধানে শামিল হবে। আর এটাই সংখ্যা গরিষ্ঠ ইমামের অভিমত। এ কিরাতটি হযরত নাফে' ইবনে আমের কাসায়ী ইয়া'কুব, ইমাম হাফ্স প্রমূখ রহেমাহুমুল্লাহু হতে স্বীকৃত। পা ধোয়ার বিষয়টি উপরোক্ত নবীজী (সা.), সাহাবায়ে কেরাম, ও পরবর্তী উম্মতের আমল দ্বারা ও প্রমাণিত।

আর لام বর্ণে যেরের কিরাত অনুযায়ী এর عَطْف, رُؤُوْسِكُمْ এর উপর হয়ে পা মাস্হ করার বিধানে শামিল হয়। যেমনটি রাফেযী সম্প্রদায়ের অভিমত।

এ কিরাত অনুযায়ী আহলে সুন্নতের উত্তর এই যে, উভয়ক্ষেত্রে اَيْدِيَكُمْ এর উপর عطف হয়ে ধোয়ার বিধানে শামিল। যেরটি جَرِّجِوَار বা পূর্ববর্তী শব্দের অনুকরণে হয়েছে মাত্র। যা আরবী সাহিত্যে প্রচলিত ও স্বীকৃত।

<u>হিকমত ঃ</u> পা ধোয়ার বিষয়টি মাথা মাস্হের পর উল্লেখের ব্যাপারে কাশ্শাফ গ্রন্থকার এই রহস্য ব্যাক্ত করেন যে, পা ধোয়ার ক্ষেত্রে স্বভাবত মানুষে পানী বেশী ব্যয় করে থাকে, যাতে এমনটি না করা হয় এদিকেই ইঙ্গিত বহন করে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন উভয় কিরাতই সহীহ্। যবরের কিরাতটি পায়ে মোজা বিহীন অবস্থায়। আর যেরের কিরাতটি পায়ে মোজা থাকা অবস্থায় প্রজোয্য।

<u>মাথা মাস্হের পরিমান ঃ</u> قوله وَالْمَفْرُوْضُ فِى مَسْحِ الرَّأْسِ ঃ মাথা মাস্হের পরিমানের আয়াতটি مُجْمَلٌ (অস্পষ্ট) থাকায় ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী আলিমগনের মতে এক চতুর্থাংশ ফরয। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে সামান্যতম এমনকি তিন চুল পরিমান হলে ও যথেষ্ট। অপর দিকে ইমাম মালেক এর মতে সমস্ত মাথা মাস্হ কর ফরয।

<u>হানাফীগনের দলীল ঃ</u> মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটি হানাফীণের দলীল। এটা ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী প্রমূখ সহীহসূত্রে উল্লেখ করেছেন।

قوله نَاصِيَة ঃ মাথার মোট চারটি অংশ রয়েছে। نَاصِيَة অগ্রভাগ, قَذَال পিছনভাগ ও فَوْدَيْن ডান ও বাম ভাগ।

<u>ফায়েদা ঃ</u> বর্ণিত হাদীস দ্বারা ৫টি বিষয় প্রমাণিত হয়। ১। অন্যের পতিতভূমিতে প্রবশে জায়েয হওয়া। ২। পেশাব করা জায়েয হওয়া ৩। পেশাব উযূ ভঙ্গ কারী হওয়া, ৪। উযূ নষ্টের পর উযু করা, ও ৫। মোজার ওপর মাস্হ করা।

وَسُنَنُ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ الْمُتَوَضِّئُ مِن نَّوْمِهِ وَتَسْمِيَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ اِبْتِدَاءِ الْوُضُوْءِ وَالسِّوَاكُ وَالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ وَالْأَصَابِعِ وَتَكْرَارُ الْغَسْلِ اِلَى الثَّلٰثِ۔

অনুবাদ ॥ উযূর সুন্নত সমূহ ঃ উযূর সুন্নত হল ১। উযূ ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্যে নিদ্রা হতে জাগ্রত হলে পাত্রে হাত ডুবানোর পূর্বে তিনবার হাত ধৌত করা। ২। উযূর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ পড়া। ৩। মেসওয়াক করা, ৪। গড়গড়াসহ কুলি করা, ৫। নাকে পানি দেওয়া। ৬। উভয় কান মাস্‌হ করা, ৭। দাড়ি খেলাল করা। ৮। আঙ্গুলসমূহ খেলাল করা। ৯। প্রতি অঙ্গ তিন তিনবার ধৌত করা।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله سُنَن -سُنَن শব্দটি سُنَّةٌ এর বহুবচন। অর্থ নিয়ম-পদ্ধতি, পন্থা। চাই তা খারাপ হোক বা ভাল। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً....وَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً

সুন্নাতের সংজ্ঞা ঃ নবী করীম (সা.) যে কাজটি ইবাদতরূপে করেছেন তবে মাঝে মধ্যে তরকও করেছেন সেটি সুন্নত। সুতরাং অভ্যাসগত কাজ সুন্নতের মধ্যে দাখিল নয়।

নিদ্রা ভঙ্গের পর হাত ধোয়া ঃ قوله غَسْلُ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا জমহুর তথা অধিকাংশ আলিমের মতে নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়ার পর সর্বাগ্রে উভয় হাত কব্জী পর্যন্ত তিনবার ধোয়া সুন্নত, চাই দিনে হোক বা রাতে। যেহেতু হাতের দ্বারা পবিত্রতা শুরু করতে হয়; এজন্যে এটাই সর্বাগ্রে হওয়া যুক্তিযুক্ত এবং হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে দিনের বেলা ঘুম হতে জাগলে মুস্তাহাব, আর রাত্রে ঘুম হতে উঠলে ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যারা কেবল ঢিলা কুলুখ দ্বারা এস্তেঞ্জা করে তাদের জন্যে ওয়াজিব। কারণ ঘুমের কারণে নাপাক স্থানটি আদ্র হওয়ার পর উক্ত স্থানে হাত লেগে নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর বাকীদের জন্যে সুন্নত।

قوله وَتَسْمِيَةُ اللّٰهِ الخ অধিকাংশ ইমামের মতে উযুর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ পড়া সুন্নাত। ইমাম আহমদ এর মতে ফরয। হযরত রাসূল (সা.) ফরমায়েছেন- لَاوُضُوْءَ لِمَنْ لَّمْ يُسَمِّ اِسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى যে আল্লাহর নাম না নেয় তার উযু (পূর্ণাঙ্গ) হয় না। এখানে পূর্ণ ফযীলত লাভ না হওয়া উদ্দেশ্য। কেননা উযূ সম্পর্কীয় আয়াতে এর উল্লেখ না থাকায় এটাই প্রমান করে। উল্লেখ্য যে, হাদীসে বিসমিল্লাহ খাছ নয়। বরং যে কোন উপায়ে আল্লাহর নাম হতে পারে। যেমন মুহীতের ভাষ্য মতে- اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه দ্বারাও সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। কোন কোন বর্ণনায় بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ পড়ার কথা উল্লেখ আছে। হেদায়া গ্রন্থকারের ভাষ্য মতে বিস্‌মিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব।

قوله اَلسِّوَاكُ ঃ মেস্‌ওয়াক (দাতন) করা সুন্নত। নবী করীম (সা.ঃ) ফরমায়েছেন لَوْلَا اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ আমার উম্মতের জন্যে কষ্টকর না হলে প্রতি নামাযের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (নাসায়ী, ইবনে মাজা প্রভৃতি)

মতভেদ ঃ হানাফীগনের মতে মেসওয়াক করা উযূর সুন্নত, শাফেয়ীগনের মতে নামাযের সুন্নত. ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে ধর্মীয় সুন্নত।

উপকারীতা ঃ মেসওয়াক করে উযু করার পর নামায পড়লে ৭০ গুণ সওয়াব বেশী হয়। (আহমদ, ইবনে খুযায়মা, দারকুৎনী ও বায়হাকী। নাহরুল ফায়েকের বর্ণনামতে মেসওয়াকে ৩৬ প্রকার উপকার লাভ হয়। সর্বনিম্নতম উপকার হল দুর্গন্ধ দূরীভূত হওয়া। আর সর্বোপরি হল মৃত্যুকালে কালেমায়ে শাহাদাত স্মরণ হওয়া।

قوله اَلْمَضْمَضَةُ ঃ مَضْمَضَه অর্থ গড়গড়াসহ কুলি করা। اِسْتِنْشَاق অর্থ নাকে পানি দেয়া। নাকে পানি দেয়ার ধরণ দুইটি। ১। প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন পানি দ্বারা কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া, হানাফী মাযহাবে এটাই প্রাধান্য প্রাপ্ত, ২। একবার পানি নিয়ে তা থেকে কুলি করা ও নাকে দেয়া। এভাবে মোট তিনবার পানি নিয়ে উভয়টি আদায় করা। আল্লামা মাযনী (র.) এর বর্ণনামতে ইমাম শাফেয়ী (র.) এর নিকট এটাই শ্রেয়।

ইমামগণের মতভেদ ঃ অধিকাংশ ইমামের মতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া উভয়টি সুন্নতে মুয়াক্কাদা। যা ২২টি সনদ সূত্রে প্রমাণিত। তবে ইমাম মালেক (র.) এর মতে উভয়টি ফরয।

قوله مَسْحُ الْاُذُنَيْنِ ঃ মাথা মাস্হের অবশিষ্ট পানি দ্বারা উভয় কান মাস্হ করাও সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম মালেক (র.) এর অভিমত। ইমাম শাফেয়ীও আবু ছাওর (র.) এর মতে নূতন পানি দ্বারা মাস্হ করা সুন্নত। মাস্হকালে কানের পিঠ ও পেটের উঁচুনীচু অংশে হাত ফিরান সুন্নতে শামিল।

قوله وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ ঃ ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর মতে দাড়ি খেলাল করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা, طرفين এর মতে সুন্নতে যায়িদা।

খেলালের তরীকা ঃ ডান হাতের তালুর পিঠ বুকের দিকে রেখে আঙ্গুল গুলো থুতনীর নিচ দিয়ে দাড়ির মধ্যে প্রবিষ্ট করে খেলাল করতে হয়। দাড়ি যদি ঘন না হয় এবং চামড়া দৃষ্টিগোঁচর হয় তাহলে চামড়া পর্যন্ত পানি পৌছান জরুরী। আর ঘন হলে এবং চামড়া দৃষ্টি গোঁচর না হলে উপর অংশ ধোয়া জরুরী এবং খেলাল করা সুন্নত।

قوله وَتَخْلِيْلُ الْاَصَابِعِ ঃ খেলালের বিধান ও ফযীলত ঃ রাসূল (সা.) ফমায়েছেন – خَلِّلُوا اَصَابِعَكُمْ كَيْ لَا تَتَخَلَّلُهَا نَارُ جَهَنَّمَ তোমরা স্বীয় আঙ্গুল খেলাল কর যাতে তার মধ্যে দোজখের অগ্নি প্রবিষ্ট না হয়।

খেলালের পদ্ধতি ঃ হাতের ক্ষেত্রে এক হাতের পাঞ্জা বা আঙ্গুল সমূহ অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবিষ্ট করে ঘসতে হবে। আর পায়ের ক্ষেত্রে বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল হতে শুরু করে বাম পায়ের কণিষ্ঠা আঙ্গুলে শেষ করতে হবে।

قوله وَتَكْرَارُ الْمَسْحِ ঃ উযূর পূর্ণাঙ্গতার জন্যে প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধোয়া সুন্নত। মূলত ঃ একবার ধোয়া ফরয। দুই বার ধোয়া সুন্নত ও তিন বার ধোয়া পূর্ণতাকল্পে সুন্নতে যায়িদা। শায়খ আবু বকরের মতে তিন বারই ফরয।

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّىْ اَنْ يَّنْوِىَ الطَّهَارَةَ وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ وَيُرَتِّبَ الْوُضُوْءَ فَيَبْتَدِأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِذِكْرِهٖ وَبِالْمَيَامِنِ وَالتَّوَالِىْ وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ ـ

অনুবাদ ॥ উযূর মুস্তাহাবসমূহ ঃ উযূ কারীর জন্যে মুস্তাহাব হল– ১। পবিত্রতা লাভের নিয়ত করা, ২। মাস্হের মধ্যে পূর্ণ মাথাকে বেষ্টন করে নেয়া। ৩। ধারাবাহিকভাবে উযূ করা। সুতরাং উযূর আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা যেটার আলোচনা দ্বারা শুরু করেছেন ঐ অঙ্গ দ্বারা শুরু করবে। ৪। ডান দিক হতে শুরু করা। ৫। একের পর এক ধৌত করা। ৬। ঘাড় মাস্হ করা।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মুস্তাহাবের সংজ্ঞা. مُسْتَحَبٌّ ঃ বাবে اِسْتِفْعَال এর مُضَارِع مجهول-এর ছীগা, অর্থ পসন্দনীয়. যে কাজ করলে সওয়াব হয় এবং না করলে কোন গোনাহ্ হয় না তাকে মুস্তাহাব বলে। বস্তুত! মুস্তাহাবের উপর আমল কাজের পূর্ণতা বিধানের জন্য সহায়ক হয়। এর অপর নাম সুন্নতে যায়িদা।

قوله اَنْ يَّنْوِىَ الطَّهَارَةَ ঃ নিয়্যতের আভিধানিক অর্থ দৃঢ় ইচ্ছা বা সংকল্প করা। উল্লেখ্য যে ইচ্ছা বা সংকল্পের স্থান হল অন্তর। অতএব অন্তরে যে কোন কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করা বা অর্জনের উদ্দেশ্য রাখাই নিয়্যত। মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়। তবে অধিকাংশ আলিমের মতে অন্তরে ইচ্ছে রাখার সাথে সাথে মুখে উচ্চারণ করা মুস্তাহাব। হানাফী আলিমগণের মতে উযূর নিয়্যত করা সুন্নত।

উযুতে নিয়্যতের বিধান ও মতভেদ ঃ হানাফী আলিম গণের মতে উযূর নিয়্যত করা সুন্নত, আর কুদূরীর বর্ণনামতে সুন্নতে যায়িদা বা মুস্তাহাব। আদদুররুল মুখতারের গ্রন্থকারের মতে সুন্নতে মুয়াক্কাদা, ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.) এর মতে ফরয।

নিয়্যতের পদ্ধতি ঃ কোন কোন বর্ণনায় নামাজের জন্যে উযূ করলে এ রূপে নিয়্যত করা মুস্তাহাব – نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاِسْتِبَاحَةً لِلصَّلٰوةِ অন্য কাজের জন্য হলে শেষে اِسْتِبَاحَةً لِلصَّلٰوةِ না বলে উক্ত কাজের কথা বলবে যেমন – لِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ ইত্যাদি।

قوله وَيَسْتَوْعِبُ رَاْسَهُ بِالْمَسْحِ ঃ কুদূরীর বর্ণনা মতে সম্পূর্ণ মাথা মাস্হ করা মুস্তাহাব, তবে অধিকাংশ ফকীহগণের মতে সুন্নতে মুয়াক্কাদা। সম্ভবত মুস্তাহাব শব্দের ব্যাপকতার অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে মুসান্নিফ (র.) একে মুস্তাহাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) উসমান (রা.) এর বর্ণিত হাদীসও অন্যান্য অঙ্গের উপর কিয়াস করে তিনবার মাস্হ করা সুন্নত বলেন। হানাফীগণ বলেন– মাথা মাস্হকে অন্য সব মাস্হের উপর কিয়াস করা বাঞ্ছনীয়। ধোয়ার উপর নয়। বস্তুতঃ তিন বারের উদ্দেশ্য হল পূর্ণতালাভ। যেহেতু মাথার এক চতুর্থাংশ মাসহ ফরয। সুতরাং পূর্ণমাথা মাসহের দ্বারাই এর পূর্ণতা লাভ হয়। হযরত আনাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) কর্তক বর্ণিত হাদীস এ মতের দলীল যা তবরানী, বুখারী, মুসলিম প্রমূখ উল্লেখ করেছেন।

মাথা মাস্হের পদ্ধতি ঃ উভয় হাতের তিনটি করে আঙ্গুল মিলিয়ে মাথার অগ্রভাগে রাখতে হবে। বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুল এবং তালু উঁচু রেখে পিছনের দিকে টানতে হবে। অতঃপর উভয় হাতের তালু দ্বারা উভয় কানের পার্শ্ব দিয়ে টেনে সামনে আনতে হবে। এরপর বৃদ্ধা আঙ্গুল কানের লতির নীচে রেখে তর্জনী (শাহাদাত) আঙ্গুল দ্বারা কানের ভিতর অংশ এবং বৃদ্ধা আঙ্গুল দ্বারা বাইরের অংশ মাসহ করতে হবে। সর্বশেষে হাতের পিঠ দ্বারা ঘাড় মাসহ করতে হবে। ঘাড় মাস্হের সময় নূতন পানি নিতে হবে না।

وَالْمَعَانِى النَّاقِضَةُ لِلْوُضُوْءِ كُلُّ مَاخَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ وَالدَّمُ وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيْدُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبَدَنِ فَتَجَاوَزَ إِلٰى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيْرِ وَالْقَيْئُ إِذَا كَانَ مِلْأَ الْفَمِ وَالنَّوْمُ مُضْطَجِعًا أَوْ مُتَّكِئًا أَوْ مُسْتَنِدًا إِلٰى شَيْئٍ لَوْ أُزِيْلَ لَسَقَطَ عَنْهُ وَالْغَلَبَةُ عَلٰى الْعَقْلِ بِالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُوْنِ وَالْقَهْقَهَةُ فِىْ كُلِّ صَلٰوةٍ ذَاتِ رُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ ـ وَفَرْضُ الْغُسْلِ الْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ وَغَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ وَسُنَّةُ الْغُسْلِ أَنْ يَّبْدَأَ الْمُغْتَسِلُ بِغَسْلِ يَدَيْهِ وَفَرْجِهٖ وَيُزِيْلُ النَّجَاسَةَ إِنْ كَانَتْ عَلٰى بَدَنِهٖ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهٗ لِلصَّلٰوةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلٰى رَأْسِهٖ وَعَلٰى سَائِرِ بَدَنِهٖ ثَلٰثًا ثُمَّ يَتَنَحّٰى عَنْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَنْقُضَ ضَفَائِرَهَا فِى الْغُسْلِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أُصُوْلَ الشَّعْرِ ـ

অনুবাদ ॥ উযূ ভঙ্গের কারণসমূহ ঃ ১। পেশাব-পায়খানর রাস্তা দ্বারা বহির্গমনকারী সকল বস্তু এবং ২। রক্ত, ৩। পিত্ত, ৪। পূঁজ বের হয়ে এমন স্থানে (অঙ্গে) গড়িয়ে পড়া যা পাক করার হুকুমে শামিল। ৫ মুখ ভরা পরিমান বমি। ৬। শুয়ে, হেলান দিয়ে বা কোন বস্তুতে এমন ভাবে ঠেস লাগিয়ে ঘুমান যে, তা সরালে সে নিশ্চিত পড়ে যাবে। ৭। বেহুসীর কারণে সঙ্গাহীন হওয়া। ৮। পাগল হওয়া। ৯। রুকু, সাজদা বিশিষ্ট নামায়ে অট্টহাসী দেওয়া। (গোসলের ফরয সমূহ ঃ) গোসলের ফরয (৪টি) ১। কুলি করা, ২ নাকে পানি দেয়া ও ৩। সমস্ত শরীর ধোয়া। (গোসলের সুন্নত সমূহ ঃ) গোসলের সুন্নত হল (৫ পাঁচটি) ১। গোসলকারী সর্ব প্রথম উভয়হাত ও লজ্জাস্থান ধৌত করবে। ২। শরীরের কোথাও নাপাকী থাকলে তা দূরীভূত করবে। অতঃপর ৩। নামাযের উযুর ন্যায় উযূ করবে। তবে পা ধুবে না। এরপর ৪। মাথায় ও সর্বাঙ্গে তিনবার পানি প্রবাহিত করবে। অতঃপর ৫। গোসলের স্থান হতে সরে উভয় পা ধুবে। মহিলাদের চুলের গোড়ায় পানি পৌছে গেলে তাদের জন্যে বেনী বা খোপা খোলা জরুরী নয়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْمَعَانِى النَّاقِضَةُ ঃ اَلْمَعَانِىْ শব্দটি مَعْنٰى এর বহুঃ বচন। এখানে عِلَّت বা কারণ অর্থে ব্যবহৃত। ফাল্‌সাফা তথা দর্শণ শাস্ত্রের পরিভাষা হতে প্রভেদ করার লক্ষ্যে عِلَّت না বলে مَعَانِى শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। نَاقِض শব্দটি اَلنَّقْضُ মাসদার হতে গঠিত। অর্থ ভঙ্গকারী, বিনষ্টকারী, বহুবচনে نَوَاقِضُ ।

উযূ ভঙ্গের কারণ ঃ উযূ ভঙ্গকারী বস্তু প্রথমতঃ তিন ধরনের (১) শরীর হতে নির্গমণ কারী; (২) শরীরে প্রবেশকারী, (৩) শরীরে প্রভাব বিস্তার কারী। ১ম প্রকারটি আবার দু'ধরনের হতে পারে। (এক) পেশাব পায়খানার রাস্তা দ্বারা নির্গমনকারী, (দুই) অন্য যে কোন অঙ্গ হতে নির্গমনকারী। উভয় ছুরতে (ক্ষেত্রে) উক্ত বস্তু স্বভাবজাত হতে পারে বা অস্বাভাবিক হতে পারে। এগুলোর মধ্যে যে গুলো সর্বসম্মত রূপে উযূ ভঙ্গকারী সে গুলোকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করেছেন। (আর সর্বক্ষেত্রে এটা মুসান্নিফ (র.) এর বৈশিষ্ট ও বটে) যথা।

১। পেশাব পায়খানার রাস্তা দ্বারা কোন কিছু বের হওয়া যা আয়াত إِذَا جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ (যখন তোমাদের কেউ পায়খানা হতে আসে) এর ব্যাপকতার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, (ক) এখানে বের হওয়া দ্বারা প্রকাশ পাওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং পেশাব পায়খানা ইত্যাদি দেখা যাওয়া মাত্র উযূ নষ্ট হয়ে যাবে। (খ) পেশাব

পায়খানা ছাড়া অন্য কোন বস্তু যথা কৃমি, বায়ু, বীর্য, মজী (কামরস) অদি (পূঁজ জাতীয় বস্তু যা রোগের কারণে বের হয়) পাথর ইত্যাদি দ্বারা ও উযূ নষ্ট হয়ে যায়। তবে নারী পুরুষের পেশাবের পথ দ্বারা বর্হিগমনকারী বায়ুও কীট উযূ ভঙ্গকারী নয়।

(গ) পেশাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়া অন্য অঙ্গ হতে স্বাভাবিক নির্গমনকারী বস্তু যথা– ঘাম, থুথু ও অশ্রু উযূ ভঙ্গকারী নয়। আর অস্বাভাবিক যথা– রক্ত, পূঁজ-কসানী ইত্যাদি উযূ ভঙ্গকারী।

قوله وَالدَّمُ وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيْدُ ঃ রক্ত পূঁজ, পানি (কষানী) বের হয়ে ক্ষতস্থানে হতে গড়িয়ে গেলে উযূ নষ্ট হবে, নতুবা নয়। নাক, কান, চোখ ইত্যাদির অভ্যান্তরে রক্ত বা পূঁজ বের হয়ে বাইরে না আসলে উযূ নষ্ট হবে না একথার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যে مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيْرِ বলা হয়েছে।

قوله وَالْقَيْحُ ঃ قَيْحٌ অর্থ– পূঁজ, বমি, قَيْئٌ একই অর্থে। পাঁচ প্রকার বস্তুর বমি হতে পারে। ১. পানি ২. খাদ্য ৩. পিত্ত, ৪. রক্ত ও ৫. কফ। প্রথম তিন প্রকারের বমি মুখ ভরা পরিমান হলে সর্বঐক্য মতে উযূ নষ্ট হয়ে যাবে, নতুবা নয়। আর কফ বমি হলে طرفين তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে কোন ক্ষেত্রে উযূ নষ্ট হবে না। বমিতে জমাট রক্ত বের হলেও উযূ নষ্ট হবে না। তরল হলে شيخين (আবু হানীফা ও আবু ইউসূফ (র.) এর মতে উযূ নষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মুখভরা পরিমাণ হলে নষ্ট হবে নতুবা নয়।

قوله اَلنَّوْمُ مُضْطَجِعًا ঃ শুয়ে হেলান বা ঠেস দিয়ে ঘুমালে গুহ্যদ্বার ঢিলা হয়ে বায়ূ বের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে উযূ বিনষ্ট হয়।

قوله اَلْقَهْقَهَةُ ঃ সাধারণ নামায ছাড়া অন্য যে কোন অবস্থায় অট্টহাসি দিলে উযূ নষ্ট হয়না। উল্লেখ্য যে, হাসি তিন প্রকার ১. تبسم স্বরবিহীন মুস্‌কি হাসি, ২. ضحك মৃদু স্বরে হাসি, যাতে দাঁত বের হয় তবে স্বর শ্রুত হয় না ও ৩. قهقهه অট্টহাসি। যার স্বর অন্যদের কানেও পৌঁছে। নামাযের মধ্যে এরূপে খিলখিল করে হাসলে উযূ ও নামায উভয় নষ্ট হয়ে যায়। ২য়টি নামায ভঙ্গকারী তবে উযূ ভঙ্গকারী নয়। আর ১মটি নামায ও উযূ কোনটি ভঙ্গ করে না। গোসলের তুলনায় উযূর প্রয়োজন বেশী। এজন্যে কুরআনে উযুর বিবরণ আগে এসেছে। গ্রন্থকার ও তার অনুসরণ করে আগে উযু তৎপর গোসলের বর্ণনা এনেছেন। غسل শব্দের غ এর উপর পেশ হলে অর্থ গোসল করা। আর যবর হলে অর্থ হবে ধৌত করা।

قوله اَلْمَضْمَضَةُ الخ ঃ কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া উলাময়ে আহনাফের মতে উযূর সুন্নত। কারণ আয়াতে وُجُوْه শব্দ এসেছে, যা مُوَاجَهَة (সামনা সামনি হওয়া) থেকে গৃহীত। সামনা সামনি হওয়ার ক্ষেত্রে বাহ্যিক অংশই দৃষ্টি গোচর হয়। এজন্যে মুখও নাকের অভ্যান্তরে পানি পৌঁছান ফরয নয়। অপরদিকে গোসলের ব্যাপারে আয়াতে فَاطَّهَّرُوْا বলা হয়েছে। যার অর্থ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করা। সুতরাং এর জন্যে যত টুকু অংশে পানি পৌঁছান সম্ভব তা এর মধ্যে শামিল। একারণে নাকের ভিতর ও পানি পৌঁছানো ফরয।

قوله ثُمَّ يَتَوَضَّأُ الخ ঃ যদি গোসলের স্থানে পানি জমা থাকে তাহলে শেষে সেখান থেকে সরে পা ধুবে। আর পানি জমা না থাকলে প্রথমে পা ধোয়াসহ উযূ পূর্ণ করবে।

قوله لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الخ ঃ মহিলাদের জন্যে চুলের বেনী বা খোপা খোলা জরূরী নয়। চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছলেই যথেষ্ট। জাওহারাতুন্নায়্যিরা গ্রন্থকার লিখেন যে, হায়েয নেফাস হতে পাক হওয়ার জন্যে যে গোসল করতে হয় উক্ত গোসলের সময় চুল খুলে পানি পৌঁছান জরুরী, নতুবা খোলা জরুরী নয়।

ফায়েদা ঃ গোসল মোট ৪ প্রকার। প্রথম ফরয গোসল। এটা চার কারণে হয়। যথা ১. লিঙ্গের অগ্রভাগ পেশাব-পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করলে। উভয়ের উপর গোসল ফরয, বীর্যপাত হোক বা না হোক। ২. উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত। যে কোন উপায়ে বীর্য পাত ঘটলে চাই পুরুষ হোক বা মহিলা ৩। হায়েযের পরবর্তী গোসল। ৪। নেফাসের পরবর্তী গোসল।

সুন্নত গোসল ও চার প্রকার, ১. জুমআর নামাযের জন্য গোসল, ২. উভয়ে ঈদের গোসল, ৩. ইহরামের গোসল। ৪. আরাফার দিনের গোসল। ৩য় প্রকার ঃ গোসল ওয়াজিব মুর্দাকে গোসল করা। ৪র্থ প্রকার ঃ মুস্তাহাব। এটা কয়েক প্রকার। যথা– ইসলাম গ্রহনের জন্যে গোসল করা, বালেগ হওয়ার পর গোসল করা, পাগলামী দূরীভূত হওয়ার পর গোসল করা ইত্যাদি।

وَالْمَعَانِى الْمُوجِبَةُ لِلْغُسْلِ اِنْزَالُ الْمَنِيِّ عَلٰى وَجْهِ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ اِنْزَالٍ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَالْاِحْرَامِ وَعَرَفَةَ وَلَيْسَ فِى الْمَذِيِّ وَالْوَدِيِّ غُسْلٌ وَفِيْهِمَا الْوُضُوْءُ۔ وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْاَحْدَاثِ جَائِزَةٌ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْاَوْدِيَةِ وَالْعُيُوْنِ وَالْاٰبَارِ وَمَاءُ الْبِحَارِ وَلَا تَجُوْزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ اُعْتُصِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ وَلَا بِمَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَاَخْرَجَهُ عَنْ طَبْعِ الْمَاءِ كَالْاَشْرِبَةِ وَالْخَلِّ وَالْمَرَقِ وَمَاءِ الْبَاقِلَّاءِ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَمَاءِ الزَّرْدَجِ وَتَجُوْزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ اَحَدَ اَوْصَافِهِ كَمَاءِ الْمَدِّ وَالْمَاءِ الَّذِىْ يَخْتَلِطُ بِهِ الْاُشْنَانُ وَالصَّابُوْنُ وَالزَّعْفَرَانُ۔

<u>অনুবাদ ॥ গোসল ফরয হওয়া প্রসঙ্গ ঃ</u> গোসল ফরযকারী বস্তুগুলো হলো– ১. যৌন উত্তেজনার সাথে পুরুষ বা মহিলার বীর্যপাত হওয়া। ২. নারী পুরুষের যৌনাঙ্গের মিলন ঘটা, যদিও বীর্যপাত না হয়, ৩. হায়েয (ঋতুস্রাব) ৪. নেফাস (প্রসবান্তের স্রাব)। (সুন্নত গোসল) নবী করীম (সা.) নিম্নোক্ত গোসল সমূহ সুন্নত স্থির করেছেন। ১. জুমুআর নামাযের জন্য, ২. উভয় ঈদের নামাযের জন্য, ৩. হজ্বের ইহরাম বাঁধার জন্য এবং ৪. আরাফার ময়দানে গমনের জন্যে। মযী ও অদী নির্গত হলে গোসল ফরয নয়। তবে উভয়টিতে উযূ (নষ্ট হয় বিধায় উযূ) আবশ্যক। পানির বিবারণ ঃ নিম্নোক্ত পানি সমূহ দ্বারা নাপাকী হতে পবিত্রতা লাভ করা জায়েয। (১) আকাশ তথা বৃষ্টি, উপত্যকা, হ্রদ, বিল, ঝর্ণা, নদী কুপ এবং সাগরের পানি। (২) বৃক্ষ বা ফল নিংড়ান পানি (নির্যাস) দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয নয়। (৩) এরূপ যে পানিতে অন্য বস্তুর প্রাধান্যতার ফলে তা পানির মৌলিক গুণাবলী বিনষ্ট করে দেয়। যেমন– শরবত, সিরকা, শুরবা (ঝোল), সবজীর রস, গোলাপের পানি, এবং গাজরের পানি, (৪) আর যে পানিতে কোন পবিত্র বস্তু পড়ে পানির কোন একটি গুণ (বৈশিষ্ট্য) পরিবর্তন করে দেয়। তাদ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয। যথা– বন্যার পানি, এবং উশ্নান (সুগন্ধী ঘাস), সাবান, জাফরান (ইত্যাদি) মিশ্রিত পানি।

<u>শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ</u> قوله اِنْزَالُ الْمَنِيِّ الخ ঃ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বীর্যপাত ঘটলেই গোসল ফরয। চাই উত্তেজনা থাকুক বা না থাকুক। ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে বীর্য স্বীয় স্থান হতে নির্গত হওয়ার কালে উত্তেজনা পাওয়া গেলে গোসল ফরয। চাই বের হওয়ার সময় উত্তেজনা থাকুক বা না থাকুক। আর ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর মতে বীর্যপাত ঘটার সময় উত্তেজনা থাকলে গোসল ফরয হবে নতুবা নয়।

قوله وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ ঃ التقاء অর্থ মিলিত হওয়া। خِتَانَيْن - خِتَان এর দ্বিবচন, অর্থ খতনার স্থান বা লিঙ্গের অগ্রভাগ। উল্লেখ্য যে, (ক) এখানে মিলিত হওয়ার দ্বারা প্রবেশ করা উদ্দেশ্য। সুতরাং কেবল উভয়ের লজ্জা স্থান মিলিত হওয়ার দ্বারা গোসল করয হবে না। যতক্ষণ না অগ্রভাগ ভিতরে প্রবেশ করবে। (খ) এখানে خِتَان দ্বারা পুরুষের গুপ্তাঙ্গের অগ্রভাগ উদ্দেশ্য। সুতরাং কোন জিন যদি মানুষের আকৃতি ধারণ ছাড়াই কোন নারীর সঙ্গে সহবাস করে। আর এতে উক্ত নারীর বীর্যপাত না ঘটে তাহলে তার ওপর গোসল ফরয হবে না। তবে মানুষের আকৃতি ধারণ করে এমন করলে তখন গোসল ফরয হবে।

قوله اَلْمَذِىُّ وَالْوَدِىُّ الخ ঃ উত্তেজনার প্রথম ভাগে স্বচ্ছ আঠাল পানিকে مذى বা কামরস বলে। আর রোগের কারণে পেশাবের আগে বা পরে নির্গত সাদা তরল বস্তুকে وَدِى বলে। এ দুটির কোনটিতে গোসল ফরয হয় না। তবে উযূ নষ্ট হয়। اَحْدَاث শব্দটি حَدَث এর বহুবচন। অর্থ নাপাকী, অপবিত্রতা, এটা আবার দু'প্রকার اَصْغَر যাতে কেবল উযূ ফরয হয়। ও اكبر। যাতে গোসল ফরয হয়। এখানে احداث দ্বারা উভয় প্রকার حدث উদ্দেশ্য।

পানির প্রকারভেদ ঃ قوله بِمَاءِ السَّمَاءِ ঃ سَمَاءٌ অর্থ আকাশ, এখানে বৃষ্টি উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, পানি প্রধানতঃ দু' প্রকার (ক) মুতলাক বা সাধারণ পানি। (খ) মুকায়্যাদ যা শুধু পানি শব্দের দ্বারা তা বোধগম্য হয় না বরং অন্য শব্দের সাথে মিলিত হয়ে পানি আখ্যায়িত হয়। যথা গাছের পানি, ওপরের পানি, ফলের রস প্রভৃতি। মুতলাক পানি আবার চার প্রকার।

(১) طَاهِرٌ مُطَهِّر নিজে পবিত্র ও অন্যকে পবিত্রকারী। যথা– সাধারণ পানি।

(২) طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّر নিজে পবিত্র তবে, অন্যকে পবিত্রকারী নয়। যথা একবার ব্যবহৃত পানি।

(৩) طَاهِرٌ مَكْرُوْهُ الْاِسْتِعْمَال পবিত্র তবে অন্যের জন্যে তা ব্যবহার করা মাকরূহ। যথা রৌদ্রে গরম কৃত পানি। বেগানা পুরুষের জন্যে বেগানা নারির বা এর বিপরীতের উচ্ছিষ্ট পানি।

(৪) مَشْكُوْك সন্দেহযুক্ত পানি। যেমন গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট পানি।

قوله وَالْاَوْدِيَة ঃ اَوْدِيَة শব্দটি وَادِىٌ-এর বহুঃ অর্থ উপত্যকা, নিম্নভূমি, নদীর অববাহিকা ভূমি, এখানে নিম্ন ভূমি তর্থা খাল-বিল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে সমস্ত পানি সংরক্ষণ কষ্টকর বা অসম্ভব এরূপ পানিতে যতক্ষণ প্রকাশ্য নাপাকী দৃষ্টি গোচর না হয় তা পাক সাব্যস্ত হবে।

قوله غَلَبَتْ عَلَيْهِ الخ ঃ পানিতে অন্যবস্তুর প্রাধান্য ঘটলে তাদ্বারা উযু বৈধ নয়, এ প্রাধান্যতা গুণের দিকে দিয়ে না অংশের দিক দিয়ে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হেদায়ার বর্ণনামতে অংশের দিকে দিয়ে। এটাই সহীহ, এটা ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে গুণের দিক দিয়ে প্রধান্যতা কুদূরী গ্রন্থকার (রঃ)-এমতকেই অবলম্বন করেছেন।

قوله فَغَيَّرَ اَحَدَ اَوْصَافِهِ الخ ঃ পানির তিনটি মৌলিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে। এ গুলোকে পানির ওয়াস্ফ বা গুণ বলে, যথা– স্বাদ, রং, গন্ধ। অন্য কোন পাক বস্তুর সংমিশ্রনে এর কোন একটি গুণ পরিবর্তন ঘটলে তা দ্বারা পবিত্রতার্জন জায়েয। একাধিক গুণ পরিবর্তন ঘটলে গ্রন্থকারের মতে তা দ্বারা পবিত্রতার্জন নাজায়েয। তবে অধিকাংশ ফকীহগণের মতে একটি মাত্র গুণ বাকী থাকা পর্যন্ত জায়েয।

وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَجُزِ الْوُضُوءُ بِهِ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحِفْظِ الْمَاءِ مِنَ النَّجَاسَةِ فَقَالَ لَايَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلَنَّ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَايَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ، وَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ جَازَ الْوُضُوءُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُرَ لَهَا أَثَرٌ لِأَنَّهَا لَاتَسْتَقِرُّ مَعَ جَرَيَانِ الْمَاءِ ـ وَالْغَدِيرُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَايَتَحَرَّكُ أَحَدُ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِيكِ الطَّرَفِ الْآخَرِ إِذَا وَقَعَتْ فِي أَحَدِ جَانِبَيْهِ نَجَاسَةٌ جَازَ الْوُضُوءُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ النَّجَاسَةَ لَاتَصِلُ إِلَيْهِ ـ

অনুবাদ॥ পানি পাক-নাপাকের বিবরণ ঃ قَوْلُهُ وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ وَقَعَتْ (১) যে কোন আবদ্ধ পানিতে নাপাকি পড়লে তা নাপাক হয়ে যায়। (পানি) কম হোক বা বেশী। কেননা নবী করীম (সা.) ফরমায়েছেন– তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে পেশাব না করে। এবং তাতে জানাবাতের (তথা ফরয) গোসল না করে। রাসূল (সা.) আরো ফরমায়েছেন– তোমাদের কেউ যখন ঘুম হতে জাগে সে যেন কখনই তিনবার হাত ধোয়ার পূর্বে পানি পাত্রে হাত না ডুবায়। কেননা সে জানেনা তার হাত রাতে কোথায় অবস্থান করেছে। (২) প্রবাহমান পানিতে নাপাকী পড়লে তার প্রভাব (চিহ্ন) দেখা না গেলে উক্ত পানি দ্বারা উযূ জায়েয। কেননা স্রোতের কারণে নাপাকী স্থির থাকেনা। আর এমন বড় পুকুর যার এক পার্শ্বের পানি নাড়লে অপর পার্শ্বের পানি নড়েনা তার এক পার্শ্বে নাপাকী পড়লে অপর পার্শ্বে উযূ গোসল করা জায়েয। কেননা এটা স্পষ্ট যে, উক্ত পার্শ্বে নাপাকী পৌঁছেনি।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ دَائِمٌ সদা বিদ্যমান, স্থির অর্থে, لَايَبُولَنَّ কখনো পেশাব করবে না। مَنَام-নিদ্রা, ঘুম। لَايَغْمِسَنَّ ডুবানো। اِنَاءٌ-পাত্র। بَاتَتْ-রাত যাপন করেছে। جَرَيَان-প্রবাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ পানি পাক-নাপাক সম্পর্কে মতভেদ ঃ قَوْلُهُ كُلُّ مَاءٍ دائِمٍ ঃ دَائِمٌ অর্থ সদাবিদ্যমান বা সার্বক্ষণিক এখানে স্থির তথা আবদ্ধ পানি উদ্দেশ্য। এরূপ পানিতে নাপাক বস্তু পড়লে সাথে সাথে তা নাপাক হয়ে যায়; যতক্ষণ তা ৪০ বর্গহাত না হয়। এর দলিল স্বরূপ মুসান্নিফ (র) দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রথম হাদীসে রাসূল (সা.) পানিকে নাপাক পতিত হওয়া থেকে হেফাযত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যাদ্বারা বুঝা যায় যে, পানিতে নাপাকী পড়লে তা নাপাক হয়ে যায়। অপর হাদীসে হাতে নাপাকী লাগার সন্দেহে তিনবার না ধুয়ে পাত্রে হাত ডুবাতে নিষেধ করেছেন। এর দ্বারা ও বুঝা যায় যে, পানিতে নাপাক পড়লে অবশ্যই তা নাপাক হয়ে যায়।

মুসান্নিফ (র.)-এর পানি নাপাক হওয়ার ব্যাপারে উপরোক্ত দলিল পেশ করার কারণ এই যে, ইমাম মালেক (র.) اَلْمَاءُ طَهُورٌ لَايُنَجِّسُهُ شَيْئٌ (পানি পবিত্রকারী। কোন বস্তু তাকে অপবিত্র করে না।) হাদীসের দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন যে, পানি কম হোক বা বেশী যতক্ষণ পর্যন্ত তার কোন গুণ (রং, ঘ্রাণ, স্বাদ) পরিবর্তন না করবে ততক্ষণ তা অপবিত্র হয় না। আর ইমাম শাফেয়ী র. এর মতে দু মটকা (মাটির বড় পাত্র) পরিমানের কম হলে

সামান্য নাপাক পড়লে তা নাপাক হবে। আর এর চেয়ে বেশী হলে নাপাক হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর দলিল – إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَا يَحْمِلُ خَبَثًا (পানি দু' মটকা পর্যন্ত পৌছলে তা নাপাকী বহন করে না).

হানাফীগণের পক্ষ হতে ইমাম মালেক (র.) এর দলিলের উত্তর এই যে, উপরোক্ত হাদীসটি সমস্ত পানির ব্যাপারে নয়। বরং বীরে বুযাআ (বুযাআ' কূপে) এর পানির ব্যাপারে। যার পানি প্রবাহের দ্বারা খেত বাগান সেঞ্চন করা হত। সুতরাং তা আবদ্ধ বা স্থির পানির হুকুমে নয়।

আর ইমাম শাফেয়ী' (র.) এর দলিলের উত্তর এই যে, এ হাদীসের সনদ, অর্থ, মর্ম ইত্যাদি ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনের নিকট দূর্বলতা ও অস্পষ্টতা রয়েছে। সুতরাং, স্পষ্ট ও সহীহ হাদীস থাকা কালে এর দ্বারা দলিল পেশ করা গ্রহণ যোগ্য নয়।

<u>প্রবাহমান পানি দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ</u> قوله الْمَاءُ الْجَارِي ঃ جَارِيْ অর্থ প্রবাহমান। এখানে প্রবাহমান বলতে কোন্ ধরনের প্রবাহ উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যথা–

(১) স্বাভাবিক স্রোত বলতে মানুষে যা বুঝে।

(২) যে পানি খড় কূটা ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

(৩) এক জায়গা হতে আজলা করে পানি উঠানোর পর দ্বিতীয়বার পানি উঠাতে গেলে প্রথমবারের পানি যদি স্বস্থানে বিদ্যমান না থাকে তা প্রবাহমান।

قَوْلُهُ تَحَرَّكَ ঃ নাড়া দেওয়ার ধরনের ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। যথা–

(১) ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র.) এর মতে গোসলের সময়ের নড়াচড়া বা তরঙ্গ।

(২) আবু হানীফার এর অপর এক বর্ণনায় হাতের নাড়ায় সৃষ্টি তরঙ্গ।

(৩) মুহাম্মদ (র.) এর মতে উযূর সময়ের সৃষ্ট তরঙ্গ উদ্দেশ্য।

<u>غَدِيْرٌ عَظِيْمٌ দ্বারা উদ্দেশ্যঃ</u> উল্লেখ্য যে, পরবর্তী উলামায়ে কেরাম এর পরিমাপ ৪০ বর্গহাত নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ যে হাউজ বা পুকুরের কিনারা ৪০ হাত এবং এত টুকু গভীর যে, হাত দ্বারা পানি উঠাতে গেলে মাটিতে হাত স্পর্শ করেনা তা مَاءٌ كَثِيْرٌ বা অধিক পানি বিবেচিত হবে। হাউজ বা পুকুরটি গোলাকার হলে ৪৬ হাত, আর ত্রিভূজ আকৃতির হলে প্রত্যেক দিকে ১৫.২৫ (সোয়া পনর) হাত হবে।

وَمَوْتُ مَالَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِى الْمَاءِ لَايُفْسِدُ الْمَاءَ كَالْبَقِّ وَالذُّبَابِ وَالزَّنَابِيْرِ وَالْعَقَارِبِ وَمَوْتُ مَايَعِيْشُ فِى الْمَاءِ لَايُفْسِدُ الْمَاءَ كَالسَّمَكِ وَالضِّفْدَعِ وَالسَّرْطَانِ. وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لَايَجُوْزُ اِسْتِعْمَالُهُ فِى طَهَارَةِ الْاَحْدَاثِ وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ كُلُّ مَاءٍ اُزِيْلَ بِهِ حَدَثٌ اَوْ اُسْتُعْمِلَ فِى الْبَدَنِ عَلٰى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَكُلُّ اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ جَازَتِ الصَّلٰوةُ فِيْهِ وَالْوُضُوْءُ مِنْهُ اِلَّاجِلْدُ الْخِنْزِيْرِ وَالْاٰدَمِىِّ وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرَانِ.

অনুবাদ ॥ যে সব প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত নেই তা পানিতে মরে গেলে পানি নাপাক হয় না। যেমন মশা, মাছি, ভিমরুল, বিছা প্রভৃতি। তদরূপ যে সব প্রাণী পানিতে বাস করে তা পানিকে নাপাক করে না। যেমন– মাছ, ব্যাঙ, কাকড়া প্রভৃতি।

ব্যবহৃত পানির বিধান ঃ ব্যবহৃত পানি নাপাকী হতে পবিত্রতা হাসিলের জন্যে ব্যবহার করা না জায়েয। ব্যবহৃত পানি দ্বারা ঐ পানি উদ্দেশ্য যা দ্বারা একবার পবিত্রতা হাসিল করা হয়েছে। অথবা, (নৈকট্য) সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে শরীরে (উযূ-গোসলে) ব্যবহার করা হয়েছে।

শোধিত চর্মের বিধান ঃ শূকর ও মানুষের চর্ম ব্যতিত সকল চর্ম দাবাগাত তথা শোধন করার দ্বারা পাক হয়ে যায়। তাতে নামায পড়া, তা দ্বারা তৈরীকৃত পাত্রের পানি দ্বারা উযূ গোসল করা জায়েয। মৃত প্রাণীর হাড় ও পশম পাক।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ نفس অর্থ আত্মা, মানুষ, এখানে রক্ত অর্থে। سَائِلَةٌ অর্থ প্রবামান। রক্ত নাপাক হওয়ার জন্যে প্রবাহমান হওয়া শর্ত, যাকে কুরআনের ভাষায় دَمٌ مَسْفُوْحٌ বলা হয়েছে। সুতরাং সব রক্ত নাপাক নয়। মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদির মধ্যে যে রক্ত রয়েছে তা কোনটির মধ্যে প্রবাহমান নয়। আবার কোনটির রক্ত রক্ত হিসাবে বিবেচিত নয়। যেমন মাছের রক্ত। সুতরাং পানর মধ্যে এ সবের মৃত্যুতে পানি নাপাক হয়না। بق মশা, ذباب মাছি, زَنَابِيْر - زُنْبُوْرٌ এর বহুঃ ভিমরুল, বল্লা, عَقَارِب - عَقْرَب-এর বহুঃ বিছা, ضِفْدَعٌ - ব্যাঙ, سَرْطَانٌ-কাকড়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ ব্যবহৃত পানি দ্বারা উদ্দেশ্য ও এর বিধান ঃ قَوْلُهُ وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ ঃ مُسْتَعْمَلُ অর্থ ব্যবহৃত। এখানে উযূ গোসল বা সওয়াবের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শরীর হতে ঝরে পড়া পানি উদ্দেশ্য। সুতরাং শরীরে লেগে থাকা পানি মুস্তা'মাল ধর্তব্য নয়। ব্যবহৃত পানির বিধানের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র.) হতে তিন ধরনের মতামত রয়েছে। যথা (ক) ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর সনদ সূত্রে প্রাপ্ত বর্ণনা মতে নাজাসাতে খফীফা। (খ) ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর সনদে প্রাপ্ত বর্ণনা মতে নিজে পাক তবে অন্যকে পাক করতে পারে না। উল্লেখ্য যে এ মতের উপরই ফতোয়া। (গ) হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনা মতে নাজাসাতে গলীযা; কঠোর নাপাক।

قَوْلُهُ وَكُلُّ اِهَابٍ دُبِغَ الخ ঃ اِهَابٌ অর্থ চর্ম চামড়া, دُبِغَ অর্থ শোধিত করা হয়। লবন, ফিটকারী ইত্যাদি শোধনের উপকরনের মাধ্যমে চামড়ার গন্ধ, আদ্রতা ইত্যাদি দূরীভুত করাকে দাবাগত করা বলে। এরূপ দাবাগত কৃত চামড়া পাক। পানিতে পড়লে বা এরূপ চামড়ার পানি পাত্রে পানি ভরলে তা সর্ব ঐক্য মতে পাক।

قَوْلُهُ اِلَّاجِلْدُ الْخِنْزِيْرِ الخ ঃ শূকরের চামড়া পাক না হওয়ার কারণ হলো শুকরের সর্বাঙ্গই মজ্জাগত ভাবে নাপাক। আর মানুষের সম্মান ও মর্যাদার পাত্র হওয়ার কারণে তার চামড়া দ্বারা এমনটি করাই নাজায়েয। সুতরাং পাক নাপাক হওয়ার প্রশ্নই আসেনা।

قَوْلُهُ شَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا الخ ঃ সকল মৃত প্রাণীর পশম, হাড়, নখ ইত্যাদি সবই পাক। তবে শূকরের সব কিছুই নাপাক। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে উপরোক্ত সব কিছুই নাপাক।

وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ نُزِحَتْ وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَّهَا فَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ عُصْفُوْرَةٌ أَوْ صَعْوَةٌ أَوْ سُوْدَانِيَّةٌ أَوْ سَامَ اِبْرِصَ نُزِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ عِشْرِيْنَ دَلْوًا إِلَى ثَلْثِيْنَ بِحَسَبِ كِبَرِ الدَّلْوِ أَوْ صِغَرِهَا وَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ دَجَاجَةٌ أَوْ سِنَّوْرٌ نُزِحَ مِنْهَا مَابَيْنَ أَرْبَعِيْنَ دَلْوًا إِلَى خَمْسِيْنَ ـ وَإِنْ مَاتَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ أدَمِيٌّ نُزِحَ جَمِيْعُ مَافِيْهَا مِنَ الْمَاءِ وَإِنِ انْتَفَخَ الْحَيَوَانُ فِيهَا أَوْ تَفَسَّخَ نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا صَغُرَ الْحَيَوَانُ أَوْ كَبُرَ ـ

অনুবাদ॥ কূপের মাসায়েল ঃ কোন কূপে নাপাকী পতিত হলে উক্ত নাপাকী উঠিয়ে ফেলতে হবে। কূপের সমস্ত পানি উঠিয়ে ফেলাই হল কূপের পবিত্রতা। কূপের মধ্যে ইঁদূর, চড়ুই, টুনটুনি, গিরগিটি (ফেউটি) টিকটিকি পড়ে মরে গেলে ছোট-বড় বালতির তারতম্য অনুযায়ী ২০-৩০ বালতি পানি উঠিয়ে ফেলতে হবে। আর যদি কবুতর, মুরগী অথবা বিড়াল পড়ে মরে যায় তাহলে ৪০-৫০ বালতি পানি উঠাতে হবে। কূপের মধ্যে কুকুর, ছাগল বা মানুষ মরে গেলে কূপের সমস্ত পানি উঠিয়ে ফেলতে হবে। আর যদি মরার পর ফুলে বা ফেটে যায় তাহলেও সমস্ত পানি উঠাতে হবে চাই প্রাণীটি ছোট হোক বা বড়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ بِئْرٌ - কূপ, বহুঃ أَبَارٌ ـ نُزِحَتْ ,اَلنَّزْحُ - (টানা, উঠান) হতে, فَارَةٌ - ইঁদুর, عُصْفُوْرَةٌ - চড়ুই, চড়ুইর ন্যায় ছোট্ট পাখি, صَعْوَةٌ - টুনটুনি, سُوْدَانِيَّةٌ - গিরগিটি, سَامَ اِبْرِصَ - টিকটিকী, دَلْوٌ -বালতি, বহুঃ دِلَاءٌ ـ سِنَّوْرٌ - বিড়াল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা॥ قَوْلُهُ إِذَا وَقَعَتْ الخ ঃ যে কোন বস্তুতে দৃশ্যমান নাপাক বস্তু পতিত হলে আগে তা অপসারণ করতে হবে। অতঃপর শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে পাক করতে হবে। নাপাকী না সরান ব্যতিত পাক হবে না। সুতরাং কূপে নাপাক বস্তু পড়লে আগে তা উঠাতে হবে। পরে নির্দিষ্ট সংখ্যক বালতি পানি উঠাতে হবে। পানি উঠানোর সাথে সাথে বাকী সব পাক হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَتْ فِيْهَا فَارَةٌ الخ ঃ ১টি ইঁদুর বা এ পরিমাণের অন্য যে কোন প্রাণী পড়ে মরলে ২০ বালতি পরিমাণ পানি উঠানো ওয়াজিব। আর ৩০ বালতি পরিমাণ উঠানো মুস্তাহাব। এভাবে অন্যান্যগুলোর মধ্যে ও কম সংখ্যক বালতি পরিমাণ উঠানো ওয়াজিব। আর বাকী সংখ্যক মুস্তাহাব।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিধান স্বাভাবিকভাবে পড়ে যাবার ক্ষেত্রে। আর যদি অন্যকোন প্রাণীর আক্রমণের কারণে ভীতু হয়ে পতিত হয় তাহলে সমস্ত পানি উঠান ওয়াজিব। কারণ এ ক্ষেত্রে ভয়ে পেশাব করে দেওয়ার প্রবল আশংকা থাকে। দুটি ইঁদুর পড়ে মরলে শায়খাইনের মতে ২০ হতে ৩০ বালতি। আর ৩ হতে ৯টি পড়ে মরলে আবু হানীফা (র.) এর মতে ৪০ হতে ৬০ বালতি আর ১০টি হলে সম্পূর্ণ পানি উঠাতে হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ فِيْهَا كَلْبٌ الخ ঃ কুকুর ও শূকরের ক্ষেত্রে মরা শর্ত নয়। বরং পতিত হলেই সমস্ত পানি ফেলান জরুরী। অন্যকোন প্রাণী পড়লে যদি জীবিত উঠান হয় তাহলে তার মুখ পানিতে ডুবেছে কিনা দেখতে হবে। যদি ডুবে থাকে তাহলে তার ঝুটার বিধান দেখে সে অনুযায়ী পানি পাক-নাপাক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অর্থাৎ ঝুটা পাক হলে পানি পাক থাকবে, ঝুটা সন্দেহ যুক্ত হলে পানি সন্দেহ যুক্ত, ঝুটা নাপাক হলে পানি নাপাক।

وَعَدَدُ الدِّلَاءِ يُعْتَبَرُ بِالدَّلْوِ الْوَسَطِ الْمُسْتَعْمَلِ لِلْآبَارِ فِى الْبُلْدَانِ فَإِنْ نُزِحَ مِنْهَا بِدَلْوٍ عَظِيْمٍ قَدْرَ مَا يَسَعُ مِنَ الدِّلَاءِ الْوَسَطِ اُحْتُسِبَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْبِئْرُ مَعِيْنًا لَا يُنْزَحُ وَ وَجَبَ نَزْحُ مَافِيْهَا اَخْرَجُوْا مِقْدَارَ مَا فِيْهَا مِنَ الْمَاءِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّهٗ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا مِأتَا دَلْوٍ اِلٰى ثَلٰثِمِائَةٍ ـ وَإِذَا وُجِدَ فِى الْبِئْرِ فَارَةٌ مَيْتَةٌ اَوْ غَيْرُهَا وَلَا يَدْرُوْنَ مَتٰى وَقَعَتْ وَلَمْ تَنْتَفِخْ وَلَمْ تَنْفَسِخْ اَعَادُوْا صَلٰوةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِذَا كَانُوْا تَوَضَّئُوْا مِنْهَا وَغَسَلُوْا كُلَّ شَيْئٍ اَصَابَهٗ مَاؤُهَا ـ وَإِنْ انْتَفَخَتْ اَوْ تَفَسَّخَتْ اَعَادُوْا صَلٰوةَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا فِىْ قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْئٍ حَتّٰى يَتَحَقَّقُوْا مَتٰى وَقَعَتْ ـ وَسُؤْرُ الْاٰدَمِىِّ وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهٗ طَاهِرٌ وَسُؤْرُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ نَجِسٌ وَسُؤْرُ الْهِرَّةِ وَالدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّاةِ وَسِبَاعِ الطُّيُوْرِ وَمَا يَسْكُنُ فِى الْبُيُوْتِ مِثْلُ الْحَيَّةِ وَالْفَارَةِ مَكْرُوْهٌ وَسُؤْرُ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ مَشْكُوْكٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْاِنْسَانُ غَيْرَهٗ تَوَضَّأَ بِهٖ وَتَيَمَّمَ وَبِاَيِّهِمَا بَدَأَ جَازَ ـ

অনুবাদ ॥ বালতির সংখ্যা নির্ধানে শহরে কূপ হতে পানি উঠানোর জন্যে ব্যবহৃত বালতি ধর্তব্য হবে। সুতরাং যদি বড় বালতি দ্বারা (কয়েকবারে) এ পরিমাণ পানি উঠানো হয়, যা মধ্যম ধরনের বালতিতে (অধিক সংখ্যক বারে) সংকুলান হয় তাহলে এর (মধ্যম বালতি) দ্বারা হিসাব করা হবে। কূপ যদি প্রবাহমান হয়, যা সেঞ্চন করা সম্ভব নয় আর সমস্ত পানি সেঞ্চন ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাহলে যে পরিমাণ পানি বর্তমান আছে উক্ত পরিমাণ উঠিয়ে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে আগে পানির পরিমান স্থির করে নিতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে ২০০ -৩০০ বালতি পানি উঠাতে হবে। কূপের মধ্যে যদি মৃত ইঁদুর বা অন্যকোন প্রাণী পাওয়া যায় আর কোন্ সময় পড়েছে তা কেউ না জানে। আর তা ফুলে বা ফেটে-গলে না থাকে তাহলে এর পানি দ্বারা উযু করে থাকলে পূর্বের একদিন একরাতের নামায দোহরাতে হবে। এবং যে সব জিনিসে উক্ত পানি লেগেছে তাও ধুয়ে নিতে হবে। আর যদি পঁচে গলে থাকে তাহলে আবু হানীফা (র.)-এর এক বর্ণনা মতে তিনদিন তিনরাতের নামায দোহরাতে হবে। আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে তাদের কিছুই দোহরাতে হবে না যতক্ষণ না সঠিকরূপে জানা না যায়, যে কখন পড়েছে।

ঝুটা বা উচ্ছিষ্টের বিবরণ ঃ মানুষ ও যে সব প্রাণীর গোশত হালাল তার ঝুটা-উচ্ছিষ্ট পাক। কুকুর, শূকর ও হিংস্র পশুর ঝুটা নাপাক। বিড়াল, মুরগী, হিংস্র পাখ-পাখালী এবং গৃহে অবস্থানকারী প্রাণী যথা– সাপ ও ইঁদুর এর ঝুটা মাকরূহ। গাধা ও খচ্চরের ঝুটা সন্দেহযুক্ত। অতএব যদি কেউ তাছাড়া অন্যকোন পানি না পায় তাহলে ঐ পানি দ্বারা উযূ করবে এবং তায়াম্মুম ও করবে। আর যেটা দ্বারা শুরু করুক জায়েয।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ مَيْتَةٌ – মুর্দার, মৃত প্রাণী, لَا يَدْرُوْنَ – জানে না, اَعَادُوْا – দোহরাবে, يَتَحَقَّقُوْا – নিশ্চিত হবে, سُؤْرٌ – ঝুটা, سِبَاعٌ – سَبُعٌ ـ سِبَاعٌ – এর বহুঃ হিংস্র, بَهِيْمَةٌ ـ بَهَائِم – এর বহুঃ চতুষ্পদ প্রাণী, مُخَلَّاةٌ – ছেড়ে রাখা, ছুটা, طَيْرٌ ـ طُيُوْرٌ – এর বহুঃ পাখি, حَيَّةٌ – সাপ, بَغْلٌ – খচ্চর।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা</u>॥ قَوْلُهُ عَدَدُ الدِّلَاءِ الخ ঃ হানাফীগণের মতে বালতির সংখ্যা ধর্তব্য নয় বরং উক্ত পরিমান ধর্তব্য। উদাহরণ স্বরূপ বড় এক বালতিতে যদি মধ্যম ২ বালতি পরিমান পানি ধরে তবে ২০ এর পরিবর্তে ১০ বালতি যথেষ্ট।

<u>উচ্ছিষ্ট বা ঝুটার প্রকারভেদ ও বিধান ঃ</u> قوله سُؤْرُ الْآدَمِيِّ الخ ঃ **ঝুটার প্রকারভেদ**। ঝুটা মোট পাঁচ প্রকার। যথা ঃ

(১) طَاهِرٌ بِالْاِتِّفَاقِ – সর্বৈক্য মতে পবিত্র। যেমন– মানুষ ও হালাল প্রাণীর ঝুটা। তবে শর্ত হল মুখে নাপাক কোন বস্তুর চিহ্ন বা আছর (প্রভাব) না থাকতে হবে।

(২) نَجِس بِالْاِتِّفَاق – সর্বৈক্য মতে অপবিত্র। যেমন শূকর, কুকুরের ঝুটা। (একমাত্র ইমাম মালেক (র.)এর এতে মতনৈক্য করেন।)

(৩) مُخْتَلَف فيه – মত পার্থক্য বিশিষ্ট। যেমন শৃগাল, বাঘ, ভল্লুক, হাতি প্রভৃতির ঝুটা। হানাফীগণের মতে নাপাক, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে পাক।

(৪) مَكْرُوه – মাকরূহ যেমন গাধা ও নাপাকখেকো প্রাণীর ঝুটা।

(৫) مَشْكُوك – সন্দেহ যুক্ত যেমন-গাধা ও খচ্চরের ঝুটা, মুসান্নিফ (র.) ক্রমানুসারে এগুলো বর্ণনা করেছেন।

<u>মানুষের ঝুটার বিধান ঃ</u> উল্লেখ্য যে, হিন্দু-খৃষ্টান, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ঝুটা পাক। ফতোয়া মতে তাদের পানাহারের অতিরিক্ত অংশ হালাল হলে মুসলমানদের জন্যে তা পানাহার করা জায়েয। তবে তাকওয়া বা পরহেযগারীতার বিষয়টি ভিন্ন। অমুসলিম জাতির নিকট পাক-নাপাকীর কোন প্রভেদ নেই। এ কারণে তা পরিহার করাই তাক্ওয়া। তদরূপ বেগানা নারী-পুরুষের ঝুটা পানাহার না করা অনেকের মতে তাকওয়া।

قَوْلُهُ سُؤْرُ الْهِرَّةِ الخ ঃ বিড়ালের ঝুটা, ছাড়া মুরগী, চিল, বাজ, কাক ইত্যাদির ঝুটা ইমাম আবু ইউসূফ ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে মাকরূহ নয়; বরং পাক। ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে মাকরূহে তানযিহী।

التمرين – (অনুশীলনী)

১। طَهَارَةٌ এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? ط বর্ণের ওপর হরকতের বিভিন্নতায় অর্থের কি প্রভেদ হয় এবং এর বহু শাখা সত্ত্বে একবচন আনার কারণ কি? বর্ণনা কর।

২। প্রমাণের ভিত্তিতে উযূর ফরয সমূহ ও উহার সীমা বর্ণনা কর।

৩। نَوَاقِض وُضُوء (উযূর ভঙ্গের কারণ) কয়টি ও কি কি? বিস্তারিত লিখ।

৪। উযূর ফরয, সুন্নত ও মুস্তাহাব সমূহ আলোচনা কর।

৫। উযূর মুস্তাহাব কয়টি ও কি কি? নিয়্যত ও মাথা মাসহের ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ কি? বর্ণনা কর।

৬। গোসলের ফরয কয়টি? এবং কি কি কারণে গোসল ফরয হয়? লিখ।

৭। গোসলের সুন্নত কয়টি এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে গোসল করা সুন্নত? বর্ণনা কর।

৮। মহিলাদের জন্যে গোসলের সময় খোপা খোলা জরুরি কিনা? লিখ।

৯। مَاء مُطْلَق ও مَاء مُقَيَّد বলতে কি বুঝ? বিস্তারিত লিখ।

১০। উযূ ও গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা লাভের জন্যে কোন্ কোন্ প্রকার পানি ব্যবহার বৈধ এবং কোন্ কোন্ পানি দ্বারা বৈধ নয়? লিখ।

১১। পানি মোট কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখ।

১২। وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ اِذَا وَقَعَتْ فِيْهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَجُزِ الْوُضُوْءُ بِهِ قَلِيْلًا كَانَ اَوْ كَثِيْرًا অত্র ইবারতটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও এর স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ কর। এ প্রসঙ্গে কোন মতভেদ থাকলে তা স্ববিস্তারে আলোচনা কর।

১৩। مَاء جَارِى ও غَدِير عَظِيم দ্বারা উদ্দেশ্য কি এবং এর বিধান কি? বর্ণনা কর।

১৪। دِبَاغَت কাকে বলে? এর বিধান ও পদ্ধতি কি? বর্ণনা কর।

১৫। مَاء مُسْتَعْمَل কাকে বলে এবং এর বিধান কি? মতান্তরসহ উল্লেখ কর।

১৬। কূপে নাপাক পতিত হলে তা পাক করার বিধান কি? বিশদভাবে লিখ।

১৭। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ঝুটা বা উচ্ছিষ্টের হুকুম কি? বিস্তারিত লিখ।

بَابُ التَّيَمُّمِ

وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَوْخَارِجَ الْمِصْرِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ نَحْوَ الْمِيلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا أَنَّهُ مَرِيضٌ فَخَافَ إِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ إِشْتَدَّ مَرَضُهُ أَوْخَافَ الْجُنُبُ إِنِ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ يَقْتُلُهُ الْبَرْدُ أَوْ يُمَرِّضُهُ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ وَالتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ يَمْسَحُ بِأَحَدِهِمَا وَجْهَهُ وَبِالْأُخْرٰى يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَالتَّيَمُّمُ فِي الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ سَوَاءٌ ـ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَالْحَجَرِ وَالْجِصِّ وَالنُّورَةِ وَالْكُحْلِ وَالزِّرْنِيخِ وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَايَجُوزُ إِلَّا بِالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ خَاصَّةً ، وَالنِّيَّةُ فَرْضٌ فِي التَّيَمُّمِ وَمُسْتَحَبَّةٌ فِي الْوُضُوْءِ ـ وَيُنْقِضُ التَّيَمُّمَ كُلُّ شَيْءٍ يُنْقِضُ الْوُضُوْءَ وَيُنْقِضُهُ أَيْضًا رُؤْيَةُ الْمَاءِ إِذَا قَدَرَ عَلٰى إِسْتِعْمَالِهِ وَلَايَجُوزُ التَّيَمُّمُ إِلَّا بِصَعِيدٍ طَاهِرٍ ـ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ يَرْجُوْ أَنْ يَجِدَهُ فِي اٰخِرِ الْوَقْتِ أَنْ يُّؤَخِّرَ الصَّلٰوةَ إِلٰى اٰخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ وَصَلّٰى وَإِلَّا تَيَمَّمَ وَيُصَلِّيْ بِتَيَمُّمِهِ مَاشَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ ـ

তায়াম্মুম প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ তায়াম্মুমের সময় যদি কোন মুসাফির ব্যক্তি পানি না পায় বা শহরের বাইরে অবস্থানকারী যদি এমন দূরত্বে হয় যে, তার এবং পানির মাঝে এক মাইল বা এর চেয়ে অধিক দূরত্ব হয়। অথবা পানি তো পায় কিন্তু সে অসুস্থ। ফলে পানি ব্যবহার করলে তার রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার ভয় করে। অথবা কোন জুনুবী ব্যক্তি যদি এরূপ আশংকা করে যে, গোসল করলে ঠান্ডায় তার প্রাণ কেড়ে নিবে বা অসুস্থ বানিয়ে দিবে তাহলে সে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।

পদ্ধতি ঃ তায়াম্মুম হল মাটিতে দু'বার হাত মারা। একবার (হাত মারার) দ্বারা মুখ মন্ডল মাস্‌হ করবে। আর অপর বার (হাত মারার) দ্বারা দু'হাতের কনুই পর্যন্ত মাস্‌হ করবে। জানাবাত (ফরয গোসল) ও হদস (উযূ) এর তায়াম্মুম একই রকম। ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে মাটি জাতীয় যে কোন বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয। যেমন– মাটি বালু, পাথর, সুরকী, চূনা, সুরমা ও হরিতাল প্রভৃতি। ইমাম আবু ইউসূফ (র.) বলেন– মাটি ও বালু ছাড়া তায়াম্মুম জায়েয নয়। তায়াম্মুমের মধ্যে নিয়ত করা ফরয, আর উযূর মধ্যে মুস্তাহাব।

<u>তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ ও আনুসঙ্গিক মাসায়েল ঃ</u> (১) যে সব বস্তু উযূ ভঙ্গ করে তা তায়াম্মুম ও ভঙ্গ করে। ব্যবহারে সক্ষম এমন পানি দর্শন ও তায়াম্মুম বিনষ্ট করে, (২) পাক মাটি ছাড়া তায়াম্মুম জায়েয নয়, (৩) যে ব্যক্তি পানি পায়না তবে শেষ ওয়াক্তে পানি পাওয়ার সে আশাবাদী তার জন্যে নামায বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব। সুতরাং (তখন) সে পানি পেলে উযূ করে নামায পড়বে নইলে তায়াম্মুম করবে। একই তায়াম্মুম দ্বারা ফরয ও নফলের যত নামায পড়তে ইচ্ছুক পড়বে।

<u>শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ</u> تَيَمُّمٌ – অর্থ ইচ্ছা করা, পবিত্র মাটি দ্বারা শরীয়ত সম্মত পন্থায় পবিত্রতার ইচ্ছা করাকে تَيَمُّم বলে, خَارِجَ الْمِصْرِ – শহরের বাইরে, مِيْل – মাইল, اِشْتَدَّ – বৃদ্ধি পাবে অর্থে, يُمَرِّضُ – তাকে অসুস্থ বানাবে, صَعِيْدٌ – মাটি تُرَابٌ -মাটি, رَمْلٌ -বালু, جَصٌّ -সুরকী, نُوْرَةٌ - চূনা, كُحْلٌ -সুরমা, زَرْنِيْخٌ - হরিতাল।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা॥ তায়াম্মুমের সূচনা ঃ</u> তায়াম্মুম এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য যা পূর্বে কোন উম্মতের জন্য বৈধ ছিল না। গায্ওয়ায়ে মুরাইসী' হতে প্রত্যাবর্তন কালে রাসূল (সাঃ) এক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন। সেখানে হযরত আয়েশা (রা.) এর হার হারিয়ে যায়, আর তা অনুসন্ধানে অনেক বিলম্ব হয়ে যায়। এদিকে নামাযের ওয়াক্ত এসে যায়। সেখানে পানি না থাকায় তাঁরা সংকটে পতিত হন। হযরত আবু বকর (রা.) মেয়েকে বকা-ঝকা করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরেই তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে হযরত আয়েশার মর্যাদা ও সমুন্নত হয়।

<u>তায়াম্মুমের রুকন দুটি ঃ</u> (১) দু'বার হাত মারা, (২) মুখ মন্ডল ও উভয় হাত মাস্হ করা।

<u>তায়াম্মুমের শর্ত ছয়টি ঃ</u> (১) নিয়ত করা (ফরযের মধ্যে শামিল), (২) মাসহ করা, (৩) কমপক্ষে তিন আঙ্গুল দ্বারা মাস্হ করা, (৪) মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু হওয়া, (৫) তায়াম্মুমের মাটি পবিত্র হওয়া, (৬) পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়া।

<u>সুন্নত আটটি ঃ</u> (১) বিসমিল্লাহ পড়া, (২) উভয় হাতের তালু মাটিতে মারা, (৩) মাটিতে হাত মারার পর নিজের দিকে টানা, (৪) পুনরায় সামনে হাত নেওয়া, (৫) হাত সামান্য ঝেড়ে ফেলা, (৬) আঙ্গুলসমূহ প্রশস্ত রাখা, (৭) ধারাবাহিকতা রক্ষা করা তথা আগে মুখ অতঃপর হাত মাস্হ করা, (৮) উভয় অঙ্গ মাস্হের মধ্যে বিলম্ব না করা।

قوله بَيْنَ الْمِصْرِ نَحْوَ الْمِيْلِ ঃ এখানে শহর দ্বারা পানির স্থান উদ্দেশ্য, শহরে পানির সহজ লভ্যতার কারণেই শহর বলা হয়েছে। পানি এক মাইল দূরত্বে হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে এটাই অধিকাংশের অভিমত। ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর মতে পানি হতে এ পরিমাণ দূরে থাকলে যে, পানি আনতে গেলে কাফেলা হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকা আছে। কারো মতে মুখে আযান দিলে যে পর্যন্ত আযানের শব্দ শোনা না যায় এতটুকু দূরত্ব হলে।

<u>مِيْل এর পরিমাণ ঃ</u> এ ব্যাপারে সর্বাধিক সহীহ মত হল আবুল আব্বাস আহমদ শিহাবুদ্দীন (র.) এর। তিনি বলেন– চার ফরসখে এক বারীদ, তিন মাইলে এক ফরসখ। এক হাজার বা' এ একমাইল। চার গজে (হাতে) এক বা'। আর ২৪ আঙ্গুলে (ইঞ্চিতে) গজ। আর ছয়টি যবের পিঠ পরস্পর মিললে এক আঙ্গুল। মোটকথা চার হাজার হাত তথা ২০০০ গজে শরয়ী এক মাইল।

<u>তায়াম্মুম বৈধের ক্ষেত্র সমূহ ঃ</u> নিম্নোক্ত কারণসমূহে তায়াম্মুম বৈধ। যথা–(১) পানি কমপক্ষে এক মাইল দূরে হওয়া, (২) পানি উঠানোর ব্যবস্থা না থাকা, (৩) পানি আনতে গেলে প্রাণ নাশের আশংকা থাকা, (৪) এমন বাহনে আরোহণ করা যেখান থেকে নেমে পানি ব্যবহার অসম্ভব, (৫) পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়া। (যদি ঠান্ডা পানি ক্ষতিকর কিন্তু গরম পানি ক্ষতিকর নয় তবে গরম পানি ব্যবহার করতে হবে, (৬) পানি ব্যবহার করলে পিপাসায় কাতর হওয়ার আশংকা থাকা, (৭) পানি আনতে অক্ষম হওয়া, (৮) উযূ করতে গেলে জানাযার নামায ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকা।

قوله مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ঃ মাটিজাত দ্রব্য দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। মাটি জাত বলতে সেসব দ্রব্য উদ্দেশ্য যা পুড়ালে ছাই হয় না বা বিগলিত হয় না। তবে চূনা এর ব্যতিক্রম।

قوله رُؤْيَةُ الْمَاءِ الخ ঃ যে সব বিষয়ে উযূ ও গোসল ভঙ্গ হয় তাতে তায়াম্মুম ও ভঙ্গ হয়। তবে গোসলের তায়াম্মুম ভঙ্গ হবার জন্য গোসলের ফরয আদায় পরিমাণ পানি পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। আর নামাযের মধ্যে দেখলেও উক্ত নামায সহীহ হয়ে যাবে।

وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلصَّحِيحِ الْمُقِيمِ إِذَا حَضَرَتْ جَنَازَةٌ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ فَخَافَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ تَفُوتَهُ صَلٰوةُ الْجَنَازَةِ فَلَهُ أَنْ يَّتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ وَكَذٰلِكَ مَنْ حَضَرَ الْعِيدَ فَخَافَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ يَّفُوتَهُ الْعِيدُ ـ وَإِنْ خَافَ مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ تَفُوتَهُ الْجُمُعَةُ تَوَضَّأَ فَإِنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ صَلَّاهَا وَإِلَّا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَكَذٰلِكَ إِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ فَخَشِيَ إِنْ تَوَضَّأَ فَاتَهُ الْوَقْتُ لَمْ يَتَيَمَّمْ وَلٰكِنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي فَائِتَتَهُ ، وَالْمُسَافِرُ إِذَا نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ لَمْ يُعِدْ صَلٰوتَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُعِيدُ وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلٰى ظَنِّهِ أَنَّ بِقُرْبِهِ مَاءً أَنْ يَطْلُبَ الْمَاءَ وَإِنْ غَلَبَ عَلٰى ظَنِّهِ أَنَّ هُنَاكَ مَاءً لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ حَتّٰى يَطْلُبَهُ وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ طَلَبَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَإِنْ مَنَعَهُ تَيَمَّمَ وَصَلّٰى ـ

অনুবাদ॥ (৪) সুস্থ মুকীম ব্যক্তির সামনে জানাযা উপস্থিত হলে যদি তার অলী অন্য কেউ হয় ফলে উযূ করতে গেলে নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে তার জন্যে তায়াম্মুম করা জায়েয, (৫) তদরূপ কেউ ঈদের জামাতে হাজির হল এমতাবস্থায় সে আশংকা করল যে, উযূ করতে গেলে তার ঈদের জামাত ছুটে যাবে তার জন্যে ও তায়াম্মুম জায়েয। (৬) যে ব্যক্তি জুমআর নামাযে হাজির হয়ে আশংকা করে যে যদি উযূতে লিপ্ত হয় তাহলে তার জুমআ ছুটে যাবে তথাপি সে উযূ করবে। অতঃপর জুমআ পেলে জুমআ পড়বে। নতুবা চার রাকাত যোহর পড়বে। তদরূপ যদি সময় সংকীর্ণ হয় ফলে আশংকা করে যে, যদি উযূ করে তাহলে সময় চলে যাবে তাহলে সে তায়াম্মুম করবে না বরং উযূ করে তার কাযা নামায পড়বে। (৭) মুসাফির যদি তার বাহনে রক্ষিত পানির কথা ভুলে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে। অতঃপর নামাযের ওয়াক্ত বাকী থাকতেই পানির কথা স্মরণ হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে নামায দোহরাতে হবে না। আর ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর মতে (উযূ করে) নামায দোহরাতে হবে। (৮) তায়াম্মুমকারীর যদি প্রবল ধারণা না হয় যে, তার নিকটবর্তী কোন স্থানে পানি আছে তাহলে তার জন্যে পানি খোঁজ করা জরুরী নয়। আর যদি পানি থাকার প্রবল ধারণা থাকে তাহলে পানি খোঁজ না করে তায়াম্মুম করা জায়েয নয়। (৯) যদি কোন সফররত ব্যক্তির সঙ্গির সাথে পানি থাকে তাহলে তায়াম্মুমের আগে তার নিকট পানি খুঁজবে। অতঃপর যদি সে দিতে অস্বীকার করে তবে তায়াম্মুম করে নামায পড়বে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ أَدْرَكَ – পায়, ضَاقَ – সংকীর্ণ হয়, نَسِيَ – ভুলে যায়, يُعِيدُ – দোহরাবে, لَمْ يَغْلِبْ عَلٰى ظَنِّهِ – প্রবণ ধারণা না হয়. هُنَاكَ – সেখানে, لَمْ يَجُزْ – যথেষ্ট হবে না. رَفِيق – সঙ্গি, সাথী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা॥ قَوْلُهُ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ঃ মাটিজাত দ্রব্য দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয, মাটি জাত বলতে সেসব দ্রব্য উদ্দেশ্য যা পুড়ালে ছাই হয় না বা বিগলিত হয় না। তবে চূনা এর ব্যতিক্রম।

قَوْلُهُ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ الخ ঃ হানাফী মাজহাবে একই তায়াম্মুমে যে কোন নামায এবং যত ওয়াক্ত ইচ্ছা পড়তে পারে। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে প্রত্যেক ফরযের জন্য ভিন্ন তায়াম্মুম করতে হবে। উল্লেখ্য যে, কারো উপর গোসল ফরয হলে যদি গোসলের দ্বারা ক্ষতির প্রবল আশংকা থাকে কিন্তু উযূ ক্ষতিকর না হয় তাহলে গোসলের পরিবর্তে সে তায়াম্মুম করবে, আর নামাযের জন্য ভিন্ন তায়াম্মুম করবে।

قَوْلُهُ رُؤْيَةُ الْمَاءِ الخ ঃ যে সব বিষয়ে উযূ ও গোসল ভঙ্গ হয় তাতে তায়াম্মুম ও ভঙ্গ হয়। তবে গোসলের তায়াম্মুম ভঙ্গ হবার জন্য গোসলের ফরয আদায় পরিমাণ পানি পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। আর নামাযের মধ্যে পানি দেখলে উক্ত নামায সহীহ্ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَالْمُسَافِرُ إِذَا نَسِيَ الخ ঃ উল্লেখ্য যে, এটা মুসাফিরের সাথে খাছ নয়। জামে সগীরের বর্ণনা মতে মুসাফির হৌক বা না হৌক সবার জন্য একই বিধান। তবে নামাযের মধ্যে পানির কথা স্মরণ হলে নামায ছেড়ে উযূ করবে ও নুতনভাবে নামায পড়বে। আর যদি পানি নেই ধারণা করে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে। অতঃপর জানতে পারে যে, পানি আছে তাহলে সর্বৈক্য মতে নামায দোহরাতে হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الخ ঃ যদি পানি পাওয়ার প্রবল ধারণা হয় তাহলে পানি খোঁজ করা আবশ্যক। তবে কতটুকু দূরত্বে থাকলে পানি খোঁজ করতে হবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

(১) হেদায়া ও কান্যের ভাষ্য মতে এক গালওয়াহ অর্থাৎ ৪০০ হাত বা ২০০ গজ।

(২) হালবী (র.) এর বর্ণনা মতে ৩০০ হাত বা নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার এরিয়া।

(৩) বাদায়ের ভাষ্য মতে যতদূর যেয়ে তালাশ করায় তার নিজের ও সাথীদের কষ্ট না হয় সে পরিমাণ আর এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত।

قَوْلُهُ مَعَ رَفِيْقِهِ الخ ঃ ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর মতে সাথীর নিকট চাওয়া ওয়াজিব, তরফাইনের মতে ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) এরও এই অভিমত। আর চাওয়া সত্ত্বে না পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকলে সর্বৈক্যমতে চাওয়া ওয়াজিব নয়।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। تَيَمُّمْ কাকে বলে? তায়াম্মুমের রুকন, শর্ত ও সুন্নত কয়টি ও কি কি ?

২। তায়াম্মুমের সূচনা কখন হয়? কি কি বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম বৈধ? মতান্তরসহ উল্লেখ কর।

৩। তায়াম্মুম জায়েয কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বর্ণনা দাও।

৪। একই তায়াম্মুমের দ্বারা একাধিক ওয়াক্তের নামায পড়া জায়েয কিনা? মতান্তরসহ উল্লেখ কর।

৫ । কতটুকু দূরত্বে পানি থাকলে তায়াম্মুম বৈধ নয় এবং সাথীর নিকট পানি থাকলে চাওয়া জায়েয কিনা?

৬। কেউ কাছে পানি থাকা সত্ত্বে তা ভুলে যাওয়ার দরুন তায়াম্মুম করে নামায পড়লে তার বিধান কি বিস্তারিত লিখ।

৭। কি কি কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয় লিখ।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مُوجِبٍ لِلْوُضُوْءِ اِذَا لَبِسَ الْخُفَّيْنِ عَلٰى طَهَارَةٍ ثُمَّ اَحْدَثَ فَاِنْ كَانَ مُقِيْمًا مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَاِنْ كَانَ مُسَافِرًا مَسَحَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا وَابْتِدَاؤُهَا عَقِيْبَ الْحَدَثِ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلٰى ظَاهِرِهِمَا خُطُوْطًا بِالْاَصَابِعِ يُبْتَدَأُ مِنَ الْاَصَابِعِ اِلَى السَّاقِ وَفَرْضُ ذٰلِكَ مِقْدَارُ ثَلٰثِ اَصَابِعَ مِنْ اَصَابِعِ الْيَدِ وَلَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلٰى خُفٍّ فِيْهِ خَرْقٌ كَثِيْرٌ يَتَبَيَّنُ مِنْهُ قَدْرُ ثَلٰثِ اَصَابِعِ الرِّجْلِ وَاِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ جَازَ ـ

মোজা মাস্‌হ প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ মোজা মাস্‌হের বিধান ও নিয়ম ঃ ১. উযূ ওয়াজিবকারী সর্বপ্রকার অপবিত্রতা হতে (পা ধোয়ার পরিবর্তে) মোজার ওপর মাস্‌হ করা সুন্নতে রাসূল (সা.) দ্বারা প্রমাণিত। যখন তা (পা ধুয়ে) পবিত্রতা লাভের পর পরিধান করে থাকে, অতঃপর নাপাক হয়ে যায়, ২. মোজা পরিহিত ব্যক্তি মুকীম হলে একদিন ও একরাত পর্যন্ত মাস্‌হ করতে পারে, আর মুসাফির হলে তিনদিন তিন রাত মাস্‌হ করতে পারে। এ সময়টা শুরু হবে নাপাক হওয়ার পর হতে। ৩. **পদ্ধতিঃ** হাতের আঙ্গুল সমূহ দ্বারা উভয় মোজার পিঠে রেখাকৃতি করে মাস্‌হ করতে হয়। আঙ্গুল হতে শুরু করে পায়ের নলির দিকে টানবে। এর ফরয হল হাতের তিন আঙ্গুল পরিমান। ৪. যে মোজা এত অধিক ফাটা যে, পায়ের তিন আঙ্গুল পরিমাণ বের হয়ে যায় তার ওপর মাস্‌হ করা জায়েয নয়। আর এর কম হলে জায়েয।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ خُفَّيْنِ ـ خُفٌّ – এর দ্বিবচন, অর্থ– মোজা, بِالسُّنَّةِ – হাদীস বা নবীজীর আমল দ্বারা, اِذَا لَبِسَ – যখন পরিধান করে, عَقِيْبَ – পিছনে, পরে, خُطُوْطًا ـ خَطٌّ – এর বহুঃ রেখা, দাগ, سَاقٌ – পায়ের নলি, خَرْقٌ – ফাটল, يَتَبَيَّنُ - প্রকাশ পায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ ঃ মোজা মাস্‌হ এ উম্মতের বিশেষত্ব, মুতাওয়াতির হাদীস ও আমল দ্বারা প্রমাণিত। প্রায় ৮০জন সাহাবী (রা.) মোজা মাস্‌হের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মাস্‌হ জায়েযের শর্তাবলী ঃ قوله اِذَا لَبِسَ الْخُفَّيْنِ الخ ঃ মাস্‌হ জায়েয হওয়ার শর্ত – (১) মোজা এমন মোটা হওয়া যে, তা না বাঁধলেও পায়ে আটকে থাকে, (২) কম পক্ষে তিন মাইল পথ নির্বিঘ্নে হেটে যাওয়া যায় এমন মোটা ও মজবুত হওয়া, (৩) পানি প্রবেশ করে এমন মোজা না হওয়া, (৪) এমন ঘন হওয়া যাতে পায়ের চামড়া দৃষ্টি গোচর না হয়।

قوله عَلَى الطَّهَارَةِ ঃ মাস্‌হ জায়েয হওয়ার জন্যে উযূ করে মোজা পরিধান করা শর্ত। আগে পা না ধুয়ে মোজা পরলে উক্ত মোজার ওপর মাসহ জায়েয হবে না।

قوله وَابْتِدَائُهَا الخ ঃ মোজা পরিধানের পর যখন নাপাক হবে ঐ সময় হতে মাস্‌হের সময়সীমা শুরু হবে। কেননা তখন হতেই মোজা নাপাক প্রবেশ হতে প্রতিবন্ধক হয়।

قوله عَلٰى ظَاهِرِهِمَا ঃ মোজা মাসহের ব্যাপারটি মূলতঃ কিয়াস বহির্ভূত (নতুবা উপরে মাসহের পরিবর্তে নীচে মাস্‌হই যুক্তিযুক্ত ছিল।) এ কারণে হাদীসের নিয়ম পদ্ধতিকে স্বঅবস্থায় রাখা জরুরী। উল্লেখ্য যে, মাস্‌হ একবারই যথেষ্ট।

وَلَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ نَزَعَ خُفَّيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَصَلَّى وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوْءِ وَمَنِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيْمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَسَحَ تَمَامَ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَمَنِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُسَافِرٌ ثُمَّ أَقَامَ فَإِنْ كَانَ مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ لَزِمَهُ نَزْعُ خُفَّيْهِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ تَمَّمَ مَسْحَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَنْ لَبِسَ الْجُرْمُوْقَ فَوْقَ الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَا مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنَعَّلَيْنِ وَقَالَا يَجُوْزُ إِذَا كَانَا ثَخِيْنَيْنِ لَا يَشِفَّانِ۔

অনুবাদ ॥ ৫. যার উপর গোসল ফরয তার জন্যে মোজার উপর মাস্‌হ করা জায়েয নয়।

মাস্‌হ ভঙ্গের কারণ সমূহ ঃ ১. যে সব বিষয় উযূ ভঙ্গ করে তা মোজার মাস্‌হ ও ভঙ্গ করে, তাছাড়া পা হতে মোজা খোলায় এবং মাসহের সময়সীমার সমাপ্তি ও মাস্‌হকে বিনষ্ট করে। ২. সুতরাং যখন সময়সীমা অতিবাহিত হবে (আর উযূ ঠিক থাকে) তখন মোজাদ্বয় খুলে পা ধুয়ে নিবে এবং নামায পড়বে, উযূর বাকী অঙ্গসমূহ দ্বিতীয়বার ধুতে হবে না। ৩. যে ব্যক্তি মুকীম অবস্থায় মাস্‌হ শুরু করে। অতঃপর একদিন একরাত অতিক্রমের পূর্বে সফর শুরু করে তাহলে (প্রথম হতে) তিনদিন তিনরাত মাস্‌হ করবে। ৪. আর যে ব্যক্তি মুসাফির অবস্থায় মাসহ শুরু করে পরে মুকীম হয় সে যদি একদিন একরাত বা ততোধিক দিন মাস্‌হ করে থাকে তাহলে তার জন্যে মোজা খুলে মাস্‌হ করা জরুরী। আর যদি এর চেয়ে কম হয়ে থাকে তাহলে একদিন একরাত মাস্‌হ পূর্ণ করবে। ৫. যে ব্যক্তি মোজার ওপর জুরমূক পরিধান করে সে জুরমুকের ওপরই মাস্‌হ করবে। ৬. জাওরাবের উপর মাস্‌হ নাজায়েয, তবে পূর্ণ চামড়ার বা নীচে চামড়া লাগান থাকলে জায়েয, সাহিবাঈনের মতে মোটা ও ছেড়া না হলে জায়েয।

শব্দ বিশ্লেষণ ঃ نَزْعُ الْخُفِّ – মোজা খোলা, টানা, مُضِيُّ الْمُدَّةِ –সীমা অতিক্রম করা, بقية – অবশিষ্ট, جُرْمُوْق – মোজা হেফাযতের জন্য ওপরে পরিধেয় আবরণ, جَوْرَبَيْن – জাওরাব পূর্ণ চামড়া দ্বারা তৈরী মোজার উপর পরিধেয় বস্তু, لَايَشِفَّانِ – পানি প্রবেশ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قَوْلُهُ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ঃ এটা সফওয়ান ইবনে আস্‌সাল (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

قوله وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ ঃ মাস্‌হের সময় পেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মাস্‌হ ভঙ্গ হয়ে যাবে। সুতরাং অন্যকোন কারণে উযূ বিনষ্ট না হলে কেবল পা ধুয়ে মোজা পরিধান করাই যথেষ্ট। বাকী উযূ দোহরাতে হবে না। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে নুতনভাবে উযূ করা জরুরী। এটা ঐ সময় যখন পা ধোয়ার জন্য পানি বিদ্যমান থাকে। আর যদি পানি না থাকে, আর ঐ সময় সে নামাযরত থাকে তাহলে অধিকাংশ আলিমের মতে নামায সহীহ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ اَلْجُرْمُوْقُ ঃ ময়লা ও কাদা-মাটি হতে হেফাজতের জন্যে মোজার উপর জরমূক পরা হয়। এটা সাধারণত টাখনু পর্যন্ত হয়।

اَلْجَوْرَبَيْنِ ঃ جَوْرَبٌ এর দ্বিবচন, সম্পূর্ণ চর্মদ্বারা প্রস্তুত শক্ত মোজা বিশেষ।

وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالْبُرْقُعِ وَالْقُفَّازَيْنِ وَيَجُوزُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَإِنْ شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ غَيْرِ بُرْءٍ لَمْ يَبْطُلِ الْمَسْحُ وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ بَطَلَ۔

অনুবাদ ॥ (৬) পাগড়ী, টুপী বোরকা ও হাত মোজার ওপর মাস্‌হ করা জায়েয নয়, ব্যান্ডজের ওপর মাস্‌হ করা জায়েয যদি তা বিনা উযুতে বাঁধে। যদি ক্ষত না সারার পূর্বে ব্যান্ডেজ পড়ে যায় তথাপি মাস্‌হ বাতিল হবে না, তবে ক্ষত ভাল হওয়ার পারে পড়ে গেলে মাস্‌হ বাতিল হয়ে যাবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ عِمَامَةٌ – পাগড়ী, قَلَنْسُوَةٌ – টুপী, قُفَّازَيْنِ – قُفَّازٌ - এর দ্বিবচন, হাত মোজা, جَبِيْرَةٌ এর বহুঃ جَبَائِرُ – ব্যান্ডেজ, পট্টি, بُرْءٌ – সুস্থ হওয়া, ভাল হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قَوْلُهُ عَلَى الْعِمَامَةِ ঃ পাগড়ীর ওপর মাস্‌হ করা হানাফী গণের মতে নাজায়েয। কেননা আয়াতে وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ (তোমরা মাথা মাস্‌হ কর) বলা হয়েছে। পাগড়ীর ওপর মাস্‌হ করাকে কেউ মাথা মাস্‌হ করা বলেনা। বাকী বিভিন্ন হাদীসে পাগড়ীর ওপর মাস্‌হ জায়েয হওয়া সম্পর্কে যা প্রতীয়মান হয় তার উত্তর এই যে, এটা প্রথম ছিল পরে তা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ عَلَى الْجَبَائِرِ ঃ মোজার ন্যায় ব্যান্ডেজের ওপর মাস্‌হ করা জায়েয। তবে চার দিক দিয়ে উভয়ের মাঝে ব্যবধান আছে। যথা–

(১) ব্যান্ডেজের উপর মাস্‌হের কোন সময়সীমা নেই। কিন্তু মোজা মাসহের নিদিষ্ট সময় সীমা রয়েছে।

(২) ক্ষত শুকানোর পূর্বে ব্যান্ডেজ পড়ে গেলে মাস্‌হ বাতিল হয় না, মোজার ক্ষেত্রে বাতিল হয়ে যায়।

(৩) ব্যান্ডেজ বাধার জন্য পবিত্র হওয়া শর্ত নয়। মোজা মাস্‌হের জন্য শর্ত।

(৪) ক্ষত শুকানোর পর ব্যান্ডেজ পড়ে গেলে কেবল ঐ জায়গা ধুয়ে ফেললেই যথেষ্ট। আর মোজাদ্বয়ের একটি খুললেই উভয় পা ধোয়া জরুরী।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। মাস্‌হের বৈধতার দলিল কি? মোজা মাসহের শর্ত কয়টি ও কি কি?

২। মোজা মাস্‌হের সময় সীমা কার জন্যে কতটুকু? মাস্‌হের পদ্ধতি কি?

৩। جَوْرَبٌ ও جُرْمُوْقٌ কাকে বলে? এর হুকুম কি?

৪। মাস্‌হ ভঙ্গের কারণ কয়টি ও কি কি?

بَابُ الْحَيْضِ

أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلٰثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَمَا نَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ وَهُوَ اِسْتِحَاضَةٌ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَمَازَادَ عَلٰى ذٰلِكَ فَهُوَ اِسْتِحَاضَةٌ ـ وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِىْ أَيَّامِ الْحَيْضِ فَهُوَ حَيْضٌ حَتّٰى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا وَالْحَيْضُ يُسْقِطُ عَنِ الْحَائِضِ الصَّلٰوةَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّوْمَ وَتَقْضِى الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِى الصَّلٰوةَ وَلَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَلَا تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَلَا يَأْتِيْهَا زَوْجُهَا وَلَايَجُوْزُ لِحَائِضٍ وَلَا لِجُنُبٍ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ وَلَايَجُوْزُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ اِلَّا اَنْ يَّأْخُذَهُ بِغِلَافِهِ فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِاَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَجُزْ وَطْيُهَا حَتّٰى تَغْتَسِلَ اَوْ يَمْضِىْ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلٰوةٍ كَامِلَةٍ وَاِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ جَازَ وَطْيُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ ـ

<u>অনুবাদ ॥ হায়েয প্রসঙ্গ ঃ</u> ১. হায়েযের সর্বনিম্ন সময়সীমা হল তিন দিন তিন রাত, এর কম হলে তা হায়েয নয় বরং ইস্তিহাযা, আর হায়েযের সর্বোচ্চ সীমা হল ১০ দিন। এর অধিক হলে তা ইস্তিহাযা। ২. হায়েযের দিন সমূহে লাল, হলুদ এবং মেটে রঙের যে রক্ত মহিলারা দেখে তা হায়েয, খাটি সাদা রং দেখা পর্যন্ত।

<u>ঋতুবতী মহিলার বিধান ঃ</u> ১. হায়েয ঋতুবর্তী মহিলাদের নামায রহিত করে এবং রোযাকে হারাম করে, (পরে) রোযা কাযা করবে, নামায কাযা করবে না, মসজিদে প্রবেশ করবে না, বায়তুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করবে না এবং তার সাথে তার স্বামী সঙ্গম করবে না, ২. ঋতুবর্তী ও জুনুবী মহিলার জন্যে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয নয়। ৩. উযূ বিহীন ব্যক্তির জন্যে গিলাফ ছাড়া কুরআন মজীদ স্পর্শ করা জায়েয নেই। ৪. দশদিনের কমে হায়েযের রক্ত বন্ধ হলে গোসল করা বা পূর্ণ এক ওয়াক্ত নামাযের সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গম করা জায়েয নয়। আর ১০ দিনের পর রক্ত বন্ধ হলে গোসলের আগে ও সঙ্গম করা জায়েয।

<u>শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ</u> حَيْض – অর্থ প্রবাহিত হওয়া, পরিভাষায় প্রাপ্ত বয়সে মহিলাদের যোনি পথে প্রবাহিত রক্ত ঋতুস্রাব। اَلْحُمْرَةُ – লাল, اَلصُّفْرَةُ – হলদে, اَلْكُدْرَةُ – মেটে, اَلْبَيَاضُ – সাদা, وَلَايَاْتِيْهَا زَوْجُهَا – এখানে স্বামী আমার দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য, اَلْمُصْحَف – কুরআন মজীদ।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥</u> قوله اَقَلُّ الْحَيْضِ الخ ঃ হায়েযের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা যা উল্লিখিত হয়েছে তা হানাফীগণের অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে নিম্নে একদিন উর্ধ্বে ১৫ দিন। ইমাম মালেক (র.) এর মতে নিম্নতম এক ঘন্টা ও হতে পারে। আর অধিকের কোন সীমা নেই।

<u>ফায়েদা ঃ হায়েযের সূচনা ঃ</u> ১. হাকেম ও ইবনে মুনযির হযরত আনাস (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যে সময় হযরত হাওয়াকে বেহেশত হতে বের করা হয় তখন হতে এর সূচনা হয়। (এর কারণ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন– গন্দম ছিড়ার দরুন যখন গাছ থেকে রস ঝরতে থাকে। তখন গাছে বদদোয়া করে। ফলে হায়েযের সূত্রপাত হয়।) ২. এটাও বর্ণিত আছে যে, আদম (আ.) এর কন্যা সন্তানের উপর এটা চাপিয়ে দেওয়া হয়। ৩. কারো কারো মতে বনী ইস্রাঈলের থেকে এর সূত্রপাত হয়। হযরত আয়েশা (রা.) এর একটি হাদীস দ্বারা এর সমার্থন বুঝা যায়।

<u>ঋতুস্রাবের রং ঃ</u> قوله وَمَاتَرَاهُ الْمَرْأَةُ ঃ হায়েযের রক্তের রং মোট ছয় প্রকার হতে পারে। যথা– (১) সাদা, (২) লাল, (৩) হলদে, (৪) সবুজ, (৫) ঘোলা ও (৬) মেটে। লাল ও কালো রঙের রক্ত ইজমা মতে হায়েয। গাঢ় ও হলদে রক্ত সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে হায়েয। হালকা হলদে ঘোলা ও মেটে রঙের রক্ত তরফাইনের মতে হায়েয। ইমাম আবু ইউসূফ (র.)-এর মতে হাল্‌কা মেটে রক্ত হায়েয নয়। তবে হায়েযের শেষাংশে হলে তা হায়েয সাব্যস্থ হবে। আর খাটি সাদা রং সম্পর্কে কারো কারো অভিমত এই যে, এটা হায়েয বন্ধ হবার পর দৃষ্টি গোচর হয়। তবে আল্লামা হানীফ গঙ্গুহী (র.) এর তাহকীক মতে এর দ্বারা হায়েয বন্ধ হওয়া উদ্দেশ্য। মূলতঃ এটা কোন রক্তই নয়।

قوله تَقْضِى الصَّلٰوةَ الخ ঃ নামায ও রোযার কাজার মধ্যে পার্থক্যের কারণ ঃ যেহেতু রোযা বৎসরে একবার। এ কারণে তার কাযা আদায় করা কষ্টকর নয়। পক্ষান্তরে নামায আসে প্রতি দিনে ৫ বার। সুতরাং এটা কাযা করা মহিলাদের জন্য কষ্টকর। এহেতু শরীঅত এটাকে মাফ করে দিয়েছে।

قوله وَلَايَاتِيهَا زَوْجُهَا ঃ নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত অঙ্গ বিবস্ত্র করে পরস্পর মিলিয়ে যৌন আনন্দ উপভোগ করা নিষিদ্ধ। তবে বাকী অঙ্গদ্বারা জায়েয। এ সময়ে সহবাস করা কঠোর হারাম।

قوله قِرَاءَةُ الْقُرْاٰن الخ ঃ দোয়া স্বরূপ সামান্য অংশ– যেমন بِسْمِ اللّٰهِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বা এক এক শব্দ ভিন্ন ভিন্ন পড়া বা পড়ান জায়েয।

وَالطُّهْرُ اِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِىْ مُدَّةِ الْحَيْضِ فَهُوَ كَالدَّمِ الْجَارِىْ وَاَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا غَايَةَ لِاَكْثَرِهٖ وَدَمُ الْاِسْتِحَاضَةِ هُوَ مَاتَرَاهُ الْمَرْاَةُ اَقَلَّ مِنْ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ اَوْ اَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ اَيَّامٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرُّعَافِ لَايَمْنَعُ الصَّلٰوةَ وَلَا الصَّوْمَ وَلَا الْوَطْىَ وَاِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَشَرَةِ وَلِلْمَرْاَةِ عَادَةٌ مَعْرُوْفَةٌ رُدَّتْ اِلٰى اَيَّامِ عَادَتِهَا وَمَازَادَ عَلٰى ذٰلِكَ فَهُوَاسْتِحَاضَةٌ وَاِنِ ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوْغِ مُسْتَحَاضَةً فَحَيْضُهَا عَشَرَةُ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْبَاقِىْ اِسْتِحَاضَةٌ ـ وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهٖ سَلَسُ الْبَوْلِ وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ وَالْجَرْحُ الَّذِىْ لَايَرْقَأُ يَتَوَضَّؤُوْنَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلٰوةٍ وَيُصَلُّوْنَ بِذٰلِكَ الْوُضُوْءِ فِى الْوَقْتِ مَاشَاءُوْا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ فَاِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وُضُوْءُهُمْ وَكَانَ عَلَيْهِمْ اِسْتِيْنَافُ الْوُضُوْءِ لِصَلٰوةٍ اُخْرٰى وَالنِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِيْبَ الْوِلَادَةِ وَالدَّمُ الَّذِىْ تَرَاهُ الْحَامِلُ وَمَا تَرَاهُ الْمَرْاَةُ فِىْ حَالِ وِلَادَتِهَا قَبْلَ خُرُوْجِ الْوَلَدِ اِسْتِحَاضَةٌ وَاَقَلُّ النِّفَاسِ لَا حَدَّ لَهٗ وَاَكْثَرُهٗ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا وَمَا زَادَ عَلٰى ذٰلِكَ فَهُوَ اِسْتِحَاضَةٌ وَاِذَا تَجَاوَزَ الدَّمُ عَلَى الْاَرْبَعِيْنَ وَقَدْ كَانَتْ هٰذِهِ الْمَرْاَةُ وَلَدَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ وَلَهَا عَادَةٌ فِى النِّفَاسِ رُدَّتْ اِلٰى اَيَّامِ عَادَتِهَا وَاِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ فَنِفَاسُهَا اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا وَمَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِىْ بَطْنٍ وَاحِدٍ فَنِفَاسُهَا مَاخَرَجَ مِنَ الدَّمِ عَقِيْبَ الْوَلَدِ الْاَوَّلِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَ زُفَرُ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الْوَلَدِ الثَّانِىْ ـ

অনুবাদ ॥ হায়েযের সময় সীমার মধ্যে দু'রক্তের মাঝে যে তুহর বা পবিত্রতা দেখা যায় তা হায়েয পরিগণিত হবে। তুহর বা পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময় হল পনের দিন। বেশীর কোন সীমা নেই। ৮. তিন দিনের কমে ও ১০ দিনের উর্ধ্বে যে রক্ত দেখা যায় তা হল ইস্তিহাযা। এর বিধান নাকসীরের (নাক দিয়ে রক্ত ঝরার) বিধানের ন্যায়। এটা নামায, রোযা ও সহবাসের প্রতিবন্ধক নয়। ৯. যদি রক্তস্রাব ১০ দিনের বেশী হয় আর উক্ত মহিলার হায়েযের নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে, তাহলে তাকে নির্দিষ্ট অভ্যাসের দিকে ফিরাতে হবে। আর অভ্যাসের অতিরিক্ত দিনগুলি ইস্তিহাযা গণ্য হবে। ১০. যদি কোন মহিলা বালেগা হওয়ার সাথে সাথে ইস্তিহাযাগ্রস্থ হয় তাহলে প্রতিমাসে ১০ দিন তার হায়েয ধরা হবে, বাকীটা ইস্তিহাযা। ১১. ইস্তিহাযার রোগিনী এবং যার অনবরত পেশাব ঝরে বা সব সময় নাক হতে রক্ত ঝরে, যে ক্ষত হতে সব সময় পূঁজ-রক্ত ঝরে এ ধরনের রোগীরা প্রত্যেক ওয়াক্তে উযূ করবে এবং ঐ উযূ দ্বারা উক্ত ওয়াক্তের ফরয ও নফল যত ইচ্ছা পড়বে। ওয়াক্ত শেষ হলে তাদের উযূ বাতিল হয়ে যাবে। পরে তাদের অন্য নামাযের জন্যে নূতন উযূ করা আবশ্যক।

নিফাসের সংজ্ঞা সময়সীমা ও বিধান ঃ ১. সন্তান প্রসবের পর যে রক্ত বের হয় তাকে নিফাস বলে। গর্ভ ধারিনী গর্ভ অবস্থায় যে রক্ত দেখে এবং সন্তান প্রসবকালে.প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত মহিলারা যে রক্ত দেখে তা ইস্তিহাযা। ২. নিফাস তথা সন্তান প্রসবান্তে ক্ষরিত রক্তের কোন সময়সীমা নেই। তবে সর্বোচ্চ তা ৪০ দিন হতে পারে। এর অতিরিক্ত হলে তা ইস্তিহাযা। ৩. যদি রক্ত ৪০ দিন অতিক্রম হয়ে যায় আর উক্ত মহিলা এর আগে ও সন্তান প্রসব করে থাকে এবং তাঁর নিফাসের নির্দিষ্ট অভ্যাস থাকে তবে উক্ত অভ্যাসের দিনগুলো প্রতি রুজু করতে হবে। আর যদি নির্দিষ্ট কোন অভ্যাস না থাকে তাহলে ৪০ দিন নিফাস গণ্য হবে। ৪. যদি কোন মহিলার একই গর্ভে দু'টি সন্তান প্রসব হয় তাহলে শায়খাইন (র.)-এর মতে প্রথম সন্তানের পর হতেই তার নিফাস গণ্য হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ ও যুফর (র.) এর মতে দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠের পর হতে নিফাস গণনা করা হবে।

শব্দিক বিশ্লেষণ ঃ طُهْرٌ – পবিত্রতা, تَخَلَّلَ – মাঝে পতিত হয়, اَلْجَارِىْ – প্রবাহিত, غَايَةً – সীমা, رُعَافٌ – নাকসীর, নাক দ্বারা রক্ত ঝরা, عَادَةً – অভ্যাস, مَعْرُوْفَةً – পরিচিত, নির্দিষ্ট অর্থে। سَلِسُ الْبَوْلِ –পেশাবের ফোটা ঝরা বা ~~বহুমূত্র রোগ~~, اَلرُّعَافُ الدَّائِمُ –সদা নাক হতে রক্ত ঝরা, لَايَبْرَئُ – নিরাময় হয়না, اِسْتِيْنَاف – নুতনভাবে শুরু করা, عَقِيْب – পিছনে, পরে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَالطُّهْرُاِذَاتَخَلَّلَ الخ ঃ দু'রক্তের মাঝের রক্ত বিহীন দিনগুলো রক্ত প্রবাহিত হওয়ার মধ্যেই শামিল। চাই হায়েযের রক্ত হোক বা নেফাসের। মহিলাদের রক্ত স্রাবের ধারাবাহিকতা থাকা না থাকার মাসআলা বেশ জটিল। এ কারণে সহজবোধ্যতার জন্যে মতভেদসহ ছক আকারে পেশ করা হল–

ক্রমিক	মাছআলা	আবূ ইউসূফ (র.)	মুহাম্মদ (র.)	ইমাম যুফর (র.)	হাসান (র.)
১	১ দিন রক্ত ৮ দিন তুহর ১দিন রক্ত	সম্পূর্ণ হায়েয	হায়েয নয়	হায়েয নয়	হায়েয নয়
২	২ দিন রক্ত ৭ তুহর ও ১ দিন রক্ত	,,	,,	সম্পূর্ণ হায়েয	,,
৩	৩ দিন রক্ত ৬ তুহর ১ দিন রক্ত	,,	৩ দিন হায়েয বাকী ইস্তিহাযা	,,	প্রথম ৩ দিন হায়েয বাকী ইস্তিহাযা
৪	১ দিন রক্ত ৬ তুহর ৩ দিন রক্ত	,,	শেষ ৩ দিন হায়েয	,,	শেস ৩ দিন হায়েয
৫	৪ দিন রক্ত ৫ তুহর ১দিন রক্ত	,,	সম্পূর্ণ হায়েয	,,	প্রথম ৪ দিন হায়েয
৬	১দিন রক্ত ৫ তুহর ৪ দিন রক্ত	,,	,,	,,	শেষ ৪ দিন হায়েয
৭	১ দিন রক্ত ২ তুহর ১ দিন রক্ত	,,	,,	,,	সম্পূর্ণ হায়েয
৮	৩ দিন রক্ত ৬ তুহর ৩ দিন রক্ত	প্রথম ১০ দিন হায়েয	প্রথম ৩ দিন হায়েয বাকী ইস্তিহাযা	প্রথম ১০ দিন হায়েয	প্রথম ৩ দিন হায়েয বাকী ইস্তহাযা

ইস্তিহাযা ঃ قوله اَلْاِسْتِحَاضَةُ ঃ পাঁচ প্রকারের রক্তকে ইস্তিহাযা গণ্য করা হয়। যথা– (১) ৯ বছরের কম ও ৫৫ বছরের অধিক বয়সী হলে, (২) ৩ দিনের কম হলে, (৩) ১০ দিনের অধিক হলে, (৪) গর্ভাবস্থায় প্রবাহিত হলে, (৫) নিফাসে ৪০ দিনের বেশী হলে।

قوله حُكْمُ الرُّعَافِ ঃ অনবরত নাক দ্বারা রক্ত ঝরাকে رُعَاف বলে, এর বিধান হল প্রতি ওয়াক্তের নামাযের সময় নুতন উযূ করে নামায পড়বে। রমযান হলে রোযা রাখবে। নামায ও রোযা কোনটি মাফ নয়।

قوله رُدَّتْ اِلٰى عَادَتِهَا ঃ অর্থাৎ যে কয়দিন হায়েয আসা তার অভ্যাস বা নিয়ম ছিল ঐ কয়দিনই হায়েয গণ্য করতে হবে, বাকী ইস্তিহাযা।

قوله وَالْمُسْتَحَاضَة ইস্তিহাযার রোগী, বহুমূত্র ও নাক দ্বারা অনবরত রক্তঃ ক্ষরণের রোগী ইত্যাদির জন্যে হানাফী মাযহাবমতে এক ওয়াক্তের উযূ দ্বারা উক্ত ওয়াক্তের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত সহ কাযা নামায ও যা ইচ্ছে আদায় করতে পারে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে প্রত্যেক ফরয নামাযের জন্যে ভিন্ন উযূ করতে হবে।

قوله فَنِفَاسُهَا مَاخَرَجَ الخ ঃ শায়খাইন (র.) এর মতের স্বপক্ষে বলেন যে, যেহেতু প্রথম সন্তান ভূমিষ্টের সাথে সাথে তার জরায়ুর মূখ খুলে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। সুতরাং ঐ সময় হতেই নিফাস ধর্তব্য হবে। উল্লেখ্য যে. নিফাস শুরুর ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও ইদ্দত সমাপ্তি সর্বৈক্যমতে দ্বিতীয় সন্তান থেকে ধর্তব্য হবে। আর দুই সন্তান প্রসবের মাঝে ছয় মাসের কম হলে শেষেরটি জারজ পরিগণিত হবে।

اَلتَّمْرِيْنْ – (অনুশীলনী)

১। حيض এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? কখন হতে এর সূচনা হয়েছে বিস্তারিত লিখ।
২। حيض এর সর্বনিম্ন ও সর্বোর্ধ সময়সীমা বর্ণনা কর। এর কম-বেশী স্রাবকে কি বলে?
৩। হায়েয ও এস্তেহাযার বিধান কি বিস্তারিত লিখ।
৪। طهر কাকে বলে? এর সময়সীমা কতটুকু বর্ণনা কর।
৫। مَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِىْ بَطْنٍ وَاحِدٍ এর মতান্তরসহ ব্যাখ্যা কর।
৬। رُعَاف এর সংজ্ঞা ও হুকুম বর্ণনা কর।
৭। نِفَاس কাকে বলে? এর সময়সীমা ও বিধান কি? লিখ।

بَابُ الْاَنْجَاسِ

تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ وَاجِبٌ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّيْ وَثَوْبِهِ وَالْمَكَانِ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ اِزَالَتُهَا بِهِ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَاِذَا اَصَابَتِ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ لَهَا جِرْمٌ فَجُفَّتْ فَدَلَكَهُ بِالْاَرْضِ جَازَ الصَّلٰوةُ فِيهِ وَالْمَنِيُّ نَجِسٌ يَجِبُ غَسْلُ رَطْبِهِ فَاِذَا جَفَّ عَلَى الثَّوْبِ اَجْزَاهُ فِيهِ الْفَرْكُ ، وَالنَّجَاسَةُ اِذَا اَصَابَتِ الْمِرْاٰةَ اَوِ السَّيْفَ اِكْتَفٰى بِمَسْحِهِمَا وَاِنْ اَصَابَتِ الْاَرْضَ نَجَاسَةٌ فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ وَذَهَبَ اَثَرُهَا جَازَتِ الصَّلٰوةُ عَلٰى مَكَانِهَا وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ مِنْهَا۔

নাপাকী প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ ১. নামাযী ব্যক্তির শরীর, কাপড় ও নামাযের স্থান নাপাকী থেকে পবিত্র করা ওয়াজিব। ২. নাপাকী হতে পবিত্রতা হাসিল করা জায়েয পানি দ্বারা এবং এমন সকল তরল বস্তু দ্বারা যাদ্বারা নাপাকী দূরীভূত করা সম্ভব। যথা–সিরকা, (জুস) গোলাপ পানী প্রভৃতি। ৩. যদি মোজায় শরীর বিশিষ্ট নাপাকী লাগে (তথা শক্ত দৃশ্যমান হয়) আর তা শুকিয়ে যাওয়ার পর মাটিতে মুছে ফেলে তাহলে উক্ত মোজা পরিধান করে নামায পড়া জায়েয। ৪. বীর্য নাপাক। পাতলা (তরল) হলে তা ধোয়া ওয়াজিব। আর যদি কাপড়ে লেগে শুকিয়ে যায় তাহলে কোন বস্তু দ্বারা খুটে ফেললে যথেষ্ট হবে। ৫. যদি আয়না বা তরবারী (ও এ জাতীয় শক্ত বস্তুতে) নাপাকী লাগে তাহলে তা ঘসে পরিষ্কার করাই যথেষ্ট।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ الاَنْجَاس - نَجَسٌ – এর বহুঃ ج যবরযুক্ত হলে মূল নাপাকী, আর যেরযুক্ত হলে নাপাক বস্তুটি, تَطْهِير পবিত্র করা, مَائِع – তরল, পাতলা, اِزَالَتُهَا – উহা দূরীভূত করা, جِرْم – শরীর, فَدَلَكَهُ – তা মুছে ফেললো, الفَرْكُ – খুচিয়ে বা খুটে উঠানো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ الخ – পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ, আল্লাহ পাক নিজে পবিত্র, পবিত্রতাকে তিনি পসন্দ করেন। কেবল পোশাক পরিচ্ছদই নয় বরং ঘর-বাড়ীর পরিবেশ, সকল কাজ কারবার ইত্যাদি সব কিছুরই নির্মলতা ও পরিচ্ছন্নতা ইসলামে অতি গুরুত্বপূর্ণ। অতএব সর্বপ্রকারের অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতা দূর করণে সচেষ্ট থাকা অপরিহার্য।

قوله وَيَجُوزُ الخ ঃ এটা শায়খাইন (র.) এর অভিমত, ইমাম মুহাম্মদ, শাফেয়ী, মালেক ও যুফর (র.) এর মতে কেবল পানি দ্বারাই পাক হতে পারে।

قوله يُمْكِنُ اِزَالَتُهَا ঃ এর দ্বারা মধু, তৈল ইত্যাদি তরল বস্তু বাদ দেয়া উদ্দেশ্য যাদ্বারা পাক হয় না।

قوله نَجَاسَةٌ لَهَا جِرْمٌ الخ ঃ এখানে جرم তথা শরীর বিশিষ্ট দ্বারা ঘনত্ব ও স্থূলদেহ বিশিষ্ট হওয়া উদ্দেশ্য যা শুকিয়ে গেলে ও কোন বস্তু দ্বারা উঠিয়ে ফেলা সম্ভব। যেমন– মল, গোবর প্রভৃতি। বর্ণিত মতটি শায়খাইন (র.)-এর। ইমাম মুহাম্মদ এর মতে এ ক্ষেত্রে ও ধোয়া জরুরী।

قوله وَاِنْ اَصَابَتِ الْاَرْضَ الخ ঃ হানাফী তিন ইমামের মতে উক্ত মাটি পাক হয়ে যাবে, তবে তা দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয নয়। আর ইমাম শাফেয়ী ও যুফর (র.) এর মতে পাক হবে না। সুতরাং নামায ও তায়াম্মুম কোনটিই জায়েয নয়।

وَمَنْ اَصَابَتْهُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ كَالدَّمِ وَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْخَمْرِ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ اَوْمَا دُوْنَهُ جَازَتِ الصَّلٰوةُ مَعَهُ وَاِنْ زَادَ لَمْ يَجُزْ وَاِنْ اَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ كَبَوْلِ مَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ جَازَتِ الصَّلٰوةُ مَعَهُ مَالَمْ تَبْلُغْ رُبْعَ الثَّوبِ وَتَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ الَّتِىْ يَجِبُ غَسْلُهَا عَلٰى وَجْهَيْنِ فَمَا كَانَ لَهُ عَيْنٌ مَرْئِيَّةٌ فَطَهَارَتُهَا زَوَالُ عَيْنِهَا اِلَّا اَن يَّبْقٰى مِنْ اَثَرِهَا مَايَشُقُّ اِزَالَتُهَا وَمَا لَيْسَ لَهُ عَيْنٌ مَرْئِيَّةٌ فَطَهَارَتُهَا اَن يَّغْسَلَ حَتّٰى يَغْلِبَ عَلٰى ظَنِّ الْغَاسِلِ اَنَّهُ قَدْ طَهُرَ وَالْاِسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ يُجْزِئُ فِيْهِ الْحَجَرُ وَالْمَدَرُ وَمَا قَامَ مَقَامَهُمَا يَمْسَحُهُ حَتّٰى يُنَقِّيَهُ وَلَيْسَ فِيْهِ عَدَدٌ مَسْنُوْنٌ وَغَسْلُهُ بِالْمَاءِ اَفْضَلُ وَاِنْ تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا لَمْ يَجُزْ فِيْهِ اِلَّا الْمَاءُ اَوِ الْمَائِعُ وَلَا يَسْتَنْجِىْ بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ وَلَا بِطَعَامٍ وَلَا بِيَمِيْنِهِ۔

অনুবাদ ॥ ৬. কোন ব্যক্তির (শরীরে বা কাপড়ে) যদি এক দেরহাম বা তার চেয়ে কম পরিমাণ নাজাসাতে গালীযা (কঠোর নাপাকী) লাগে যেমন রক্ত, মল-মূত্র, মদ প্রভৃতি তাহলে উক্ত অবস্থায় নামায পড়া জায়েয। আর এর অধিক হলে জায়েয নয়। ৭. আর যদি নাজাসাতে খাফীফা (হাল্‌কা নাপাকী) লাগে যথা– হালাল প্রাণীর মূত্র তাহলে কোন অঙ্গের বা অংশের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ না হলে উক্ত অবস্থায় নামায পড়া জায়েয। ৮. যে সব নাপাকী হতে পবিত্রতা হাসিলের জন্যে ধৌত করা ওয়াজিব তা দু'প্রকার। (ক) যদি তা দৃশ্যমান বস্তু হয় তাহলে তার অস্তিত্ব বিলীন হওয়াই তার পবিত্রতা; তবে যদি তার চিহ্ন দূরীভূত করা দুরূহ হয় তা এবং (খ) যার দৃশ্যমান অস্তিত্ব নেই এর পবিত্রতা হল ধৌতকারীর ধারণায় নাপাকী অবশিষ্ট নেই এমন সময় পর্যন্ত ধৌত করা।

এস্তেঞ্জা প্রসঙ্গ ঃ ১. (পেশাব-পায়খানার পর) এস্তেঞ্জা (পবিত্রতা হাসিল) সুন্নত। পাথর, মাটির ঢিলা এবং এর স্থলাভিষিক্ত বস্তু এর জন্যে যথেষ্ট। পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত নাপাকীর স্থান মুছতে হবে। এর কোন নির্দিষ্ট সুন্নত সংখ্যা নেই। তবে (সর্বশেষ) পানি দ্বারা ধৌত করাই উত্তম, ২. আর নাপাকী (মল-মূত্র) যদি বের হওয়ার স্থান (এক দেরহাম) হতে অতিক্রম করে যায় তাহলে পানি বা ঐ জাতীয় তরল বস্তু ছাড়া পাক হবে না। ৩. হাড়, গোবর খাদ্য দ্রব্য দ্বারা এবং ডান হাত দ্বারা এস্তেঞ্জা করবে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ مُغَلَّظَة – কঠোর, مُخَفَّفَة – হালকা, পাতলা (নিম্নমানের উদ্দেশ্য), غَائِط – মল, পায়খানা, مَرْئِيَة – দৃশ্যমান, اَثَرِهَا – তার প্রভাব, চিহ্ন, مَايَشُقُّ اِزَالَتُهَا – যা দূর করা দূরূহ, কষ্টকর, مَدَرٌ – ঢিলা-মাটি, يُنَقِّيَه – তা পরিষ্কার করে, رَوْثٌ – গোবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা॥ قوله مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ ঃ নাজাসাতে গলীজা কাকে বলে এ প্রসঙ্গে হানাফী আলিমগণের মধ্যে কিছুটা মত পার্থক্য আছে। যথা– ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে যে নাপাকী প্রমাণিত হওয়ার দলিলের বিপক্ষে কোন দলিল নেই সেটা নাজাসাতে গলীজা। আর থাকলে সেটা খফীফা সাহিবাইনের

মতে যে নাপাকীর ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা গলীজা, আর ইজমা না হলে সেটা খফীফা (বা শিথিলতা সম্পন্ন)।

<u>পাক-নাপাক রক্ত :</u> قوله وَالدَّمُ : রক্ত দ্বারা মানুষ বা পশুর প্রবাহিত রক্ত উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, গোশতের মধ্যে যবাইর পরে যে রক্ত থাকে তা নাপাক ও হারাম নয়। কোরবানীর পশুর প্রবাহিত রক্ত নাপাক।

মোট ১২ প্রকারের রক্ত নাপাক নয়। যথা– (১) অপ্রবাহিত রক্ত, (২) শহীদের রক্ত, (৩) গোশতের রক্ত, (৪) রগের রক্ত, (৫) কলিজা, (৬) দিল, (৭) পরান, (৮) মাছ, (৯) মশা, (১০) মাছি ও (১১) ছারপোকার রক্ত।

قوله مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ : গাঢ় হলে এক দিরহাম তথা রৌপ্য মুদ্রা (২০ কীরাত ওযন) ও তরল হলে হাতের তালু পরিমাণ মাফ। আর খফীফা হলে শরীর বা কাপড়ের যেকোন অঙ্গের এক চতুর্থাংশের কম হলে মাফ, উক্ত অবস্থায় নামায পড়া জায়েয।

قوله اَلْاِسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ : ইস্তিঞ্জা অর্থ পবিত্রতা লাভ করা, চাই তা ঢিলা, পানি বা টয়লেটপেপার দ্বারাই হোক। পেশাব-পায়খানার পর উক্ত স্থান পরিষ্কার করা সুন্নত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা সর্বক্ষেত্রে নয়, বরং অবস্থাভেদে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা– মল-মূত্র যদি এক দেরহাম পরিমান জায়গা অতিক্রম করে যায় তাহলে তাথেকে পবিত্রতার্জন ফরয। আর এক দেরহাম পরিমান জায়গায় লাগলে ওয়াজিব, এক দিরহামের কম জায়গায় লাগলে সুন্নতে মুয়াক্কাদা, আর পার্শ্বে মোটেই না লাগলে মুস্তাহাব।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। কোন্ কোন্ বস্তু হতে নাপাকী দূরীভূত করা ওয়াজিব?

২। নাপাকী হতে পবিত্র করার জন্য গ্রন্থকার মোট যে কয়টি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন বিস্তারিত লিখ।

৩। নাজাসাতে গলীজা কাকে বলে? এর বিধান কি বিস্তারিত লিখ।

৪। কোন্ রক্ত পাক ও কোন্ রক্ত নাপাক বিস্তারিত লিখ।

৫। استنجاء অর্থ কি? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এর বিধান কি? বিশদভাবে লিখ।

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

اَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِىْ وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ فِى الْاُفُقِ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَالَمْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَاَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ سِوٰى فَيْءِ الزَّوَالِ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهٗ ـ

নামায অধ্যায়

অনুবাদ ॥ নামাযের ওয়াক্ত প্রসঙ্গ ঃ ১. ফজরের শুরু ওয়াক্ত হল যখন সুবহে সাদিক উদয় হয়। আর তা হল পূর্বাকাশে চওড়া (আড়াআড়ি) শুভ্র আভা। ফজরের শেষ ওয়াক্ত হল সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। ২. যুহ্‌রের প্রথম ওয়াক্ত হল যখন সূর্য (পশ্চিম আকাশে) হেলে যায়। আর শেষ ওয়াক্ত হল আবু হানীফা (র.) এর মতে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া মূল ছায়া ছাড়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। ইমাম আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন- যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমান হবে (তখন পর্যন্ত)।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ صَلٰوةٌ – নামাযের প্রতিশব্দ, صِلِى – শব্দমূল হতে গঠিত, মূল অর্থ, تَحْرِيْكُ الصَّلْوَيْنِ – নিতম্বদ্বয় নড়াচড়া করা, নামাযের মধ্যে উভয় নিতম্ব নড়াচড়া করার কারণে এ নাম হয়েছে। এর বহুঃ صَلَوَات – صَلٰوةٌ শব্দটি দোয়া, এস্তেগফার, রহমত, দরূদ ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়, اَلْفَجْرُ الثَّانِى – সুবহে সাদিক, اَلْبَيَاضُ – শুভ্রতা, اَلْمُعْتَرِضُ – আড়াআড়ি, প্রস্থ, اُفُقٌ – দিগন্ত, আকাশের কিনারা, فَيْءٌ ছায়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ اَلْفَجْرُ الثَّانِىْ **ঃ** সুবহে সাদিক, রাতের শেষলগ্নে প্রথমে একবার পূর্বাকাশ কিছুটা আলোকিত হয়ে পরে উক্ত আলো দূরীভূত হয়ে যায়। এটাকে فَجْرِ اَوَّلْ বা সুবহে কাযিব বলে। এর সামান্য পরে প্রস্থভাবে পুনরায় আলোকিত হয়ে ক্রমান্বয়ে দিনের সূচনা করে। ওটাকে فَجْرِ ثَانِى বা সুবহে সাদিক বলে। হযরত জিব্রাঈল (আ.) প্রথম দিন সুবহে সাদিকের সময় এবং দ্বিতীয় দিন সূর্যোদয়ের সামান্য পূর্বে ফজরের নামায পড়িয়ে নবী করীম (সা.) কে বলেছিলেন-এর মাঝেই আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য ফজরের নামাযের সময়।

قوله وَاَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ الخ ঃ যুহরের ওয়াক্ত সর্ব সম্মতিক্রমে সূর্য পশ্চিমাকাশে অবনমিত হওয়ার পর হতে শুরু হয়। তবে শেষ হওয়ার মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে মূল ছায়া ছাড়া প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। আর সাহিবাইন, ইমাম যুফর, মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র.) এর মতে এক গুণ হওয়া পর্যন্ত। অবশ্য ইমাম হাসান (র.) কর্তৃক বর্ণিত ইমাম আবু হানীফা (র.) এর অপর একমত জমহুর এর মতই। ইমাম তাহাবী এটাই গ্রহণ করেছেন। তহ্‌তাবী (র.) বলেন– যুহর এক গুণ ছায়া হওয়ার পূর্বে এবং আছর দ্বিগুণ ছায়া হওয়ার পরে পড়ার মধ্যে সাবধানতা বিদ্যমান। যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

ছায়ায়ে আস্‌লী বা মূল ছায়া নির্ণয়ের পদ্ধতি ঃ সমতল স্থানে বৃত্ত তৈরী করে তার মধ্যভাগে একটি কাঠি স্থাপন করতে হবে। অতঃপর সকালে ছায়া কমতে কমতে যখন বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করবে তথায় একটি চিহ্ন দিবে। দ্বিপ্রহরে ছায়া হ্রাস পাওয়া বন্ধ হওয়ার স্থানে আরেকটি চিহ্ন এবং পুনরায় বর্ধিত হয়ে যখন বৃত্ত অতিক্রম করবে সে স্থানেও একটি চিহ্ন দিবে। এবার দুই প্রান্তের চিহ্নের উপর সরল রেখা টেনে ঠিক মধ্যভাগ বরাবর যতটুকু দূরত্ব থাকবে তাই মূল ছায়া গণ্য হবে। চিত্রাকারে প্রদত্ব হল লক্ষ কর–

উ:
বাহির প্রবেশ
প পূ:
দ:

وَاَوَّلُ وُقْتِ الْعَصْرِ اِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلٰى الْقَوْلَيْنِ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَالَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ وَاَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ تَغَبِ الشَّفَقُ وَهُوَ الْبَيَاضُ الَّذِىْ يُرٰى فِى الْاُفُقِ بَعْدَ الْحُمْرَةِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى هُوَ الْحُمْرَةُ وَاَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ اِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَالَمْ يَطْلُعُ الْفَجْرُ الثَّانِىْ وَاَوَّلُ وَقْتِ الْوِتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَالَمْ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَيُسْتَحَبُّ الْاِسْفَارُ بِالْفَجْرِ وَالْاِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِى الصَّيْفِ وَتَقْدِيْمُهَا فِى الشِّتَاءِ وَتَاْخِيْرُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَتَغَيَّرُ الشَّمْسُ وَتَعْجِيْلُ الْمَغْرِبِ وَتَاخِيْرُ الْعِشَاءِ اِلٰى مَاقَبْلَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَيُسْتَحَبُّ فِى الْوِتْرِ لِمَنْ يَّاْلَفُ صَلٰوةَ اللَّيْلِ اَنْ يُّؤَخِّرَ الْوِتْرَ اِلٰى اٰخِرِ اللَّيْلِ وَاِنْ لَمْ يَثِقْ بِالْاِنْتِبَاهِ اَوْتَرَ قَبْلَ النَّوْمِ ـ

অনুবাদ॥ ৩. আসরের ওয়াক্তের শুরু হল উভয় বর্ণনা মতে যুহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর হতে। আর শেষ ওয়াক্ত হল সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত। ৪. মাগরিবের ওয়াক্তের শুরু সূর্যাস্তের পর, আর এর শেষ ওয়াক্ত শাফাক বা শুভ্র আভা অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত। আবু হানীফা (র.) এর মতে শাফাফ ঐ শুভ্র আভা যা আকাশের কিনারায় (পশ্চিম দিগন্তে) রক্তিম আভার পরে পরিলক্ষিত হয়। সাহিবাইনের মতে রক্তিম আভাটিই শাফাক। ৫. ইশার ওয়াক্তের শুরু হল শাফাক (রক্তিম বা শুভ্র আভা) অস্তমিত হওয়ার পর এবং শেষ ওয়াক্ত হল সুবহে সাদিক উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। ৬. বিতিরের ওয়াক্তের শুরু ইশার নামাযের পর এবং শেষ ওয়াক্ত ফজর উদয় না হওয়া পর্যন্ত।

নামাযের মুস্তাহাব সময় ঃ মুস্তাহাব হল ফজরের নামায ফর্সা হওয়ার পরে পড়া। গ্রীষ্মকালে যুহরের নামায, তাপ কম হওয়ার (ঠাণ্ডা হওয়ার) পরে পড়া এবং শীতকালে ওয়াক্তের শুরুতে পড়া। আসরের নামায সূর্যের রং পরিবর্তন (হলুদ) না হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা। মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়া এবং ইশার নামায রাতের প্রথম প্রহরের (এক তৃতীয়াংশের) পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করা। আর বিতির নামাযের ব্যাপারে মুস্তাহাব হল যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ পড়ার আগ্রহশীল তার জন্যে রাতের শেষাংশে পড়া। আর যদি রাতে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে আস্থা না রাখে তাহলে নিদ্রার পূর্বে বিতির পড়বে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ شَفَق - এর মূল অর্থ হালকা, পাতলা, হালকা আলোকজ্জ্বল অর্থে ও ব্যবহৃত হয়, حُمْرَة - লালিমা, রক্তিম, اِسْفَار - ফর্সা করা, اِبْرَاد - ঠাণ্ডা করা, صَيْف - গ্রীষ্মকাল, شتاء - শীতকা يَّاْلَفُ - আগ্রহশীল হয়, لَمْ يَثِقْ - আস্থা না রাখে, بِالْاِنْتِبَاه - জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে, اَوْتَرَ - বিতির পড়বে।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা</u> ॥ قوله مَالَمْ تَغِبِ الشَّفَقُ মাগরিবের শেষ ওয়াক্ত হল হানাফী গণের মতে شفق অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত। আর ইমাম শাফেয়ী' (র.) এর মতে সূর্যাস্তের পর উযূ ও আযান ইকামাতের পর পাঁচ রাকাত বা কোন বর্ণনায় তিন রাকাত নামায পড়া পর্যন্ত। কারণ জিব্রাইল (আ.) উভয়দিন একই ওয়াক্তে মাগরিবের ইমামতী করেছিলেন। হানাফীগণ তিরমিযী, নাসায়ী ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত شفق অস্তমিত হওয়ার হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। তবে شفق এর অর্থ আবু হানীফা (র.) শুভ্র আভা ও সাহিবাইন রক্তিম আভা গ্রহণ করেন।

<u>**ফজরের মুস্তাহাব সময় ঃ** قوله وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَار ঃ</u>

(ক) ফজরের নামায হানাফীগণের মতে আলো উদ্ভাসিত হওয়ার পর।

(খ) শাফেয়ী (র.) ও অন্যান্য কতিপয় আলিমের মতে غلس তথা অন্ধকারে পড়া মুস্তাহাব।

(গ) হাদীসে উভয় ধরনের রেওয়ায়াত বিদ্যমান থাকায় কোন কোন আলিম বলেন– অন্ধকারে শুরু করে ফর্সা হওয়ার পর শেষ করাই উত্তম। যাতে উভয় ধরনের হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়।

(ঘ) কারো মতে এমন সময় পড়বে যাতে সুন্নত কিরাত সহ পড়ার পর ভুল হলে পুনরায় সুন্নত কিরাত সহ পড়া যায়। এটাই বিশুদ্ধতম মত।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। صلوة এর আভিধানিক অর্থ কি? নামাযকে এ নামে নামকরণের কারণ কি?

২। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সীমার বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

৩। ছায়ায়ে আসলী কাকে বলে? এবং তা নির্ণয়ের পদ্ধতি কি?

৪। ফজরের নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত কোন্‌টি? মতান্তরসহ উল্লেখ কর।

بَابُ الْاَذَانِ

اَلْاَذَانُ سُنَّةٌ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ دُوْنَ مَاسِوَاهَا وَلَاتَرْجِيْعَ فِيْهِ وَيَزِيْدُ فِىْ أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ وَالْاِقَامَةُ مِثْلُ الْاَذَانِ اِلَّا اَنَّهُ يَزِيْدُ فِيْهَا بَعْدَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ مَرَّتَيْنِ وَيَتَرَسَّلُ فِى الْاَذَانِ وَيَحْدُرُ فِى الْاِقَامَةِ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ فَاِذَا بَلَغَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَالْفَلَاحِ حَوَّلَ وَجْهَهُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيْمُ فَاِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ اَذَّنَ لِلْاُوْلٰى وَاَقَامَ وَكَانَ مُخَيَّرًا فِى الثَّانِيَةِ اِنْ شَاءَ اَذَّنَ وَاَقَامَ وَاِنْ شَاءَ اِقْتَصَرَ عَلَى الْاِقَامَةِ وَيَنْبَغِىْ اَنْ يُّؤَذِّنَ وَيُقِيْمَ عَلٰى طُهْرٍ فَاِنْ اَذَّنَ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ جَازَ وَيُكْرَهُ اَنْ يُّقِيْمَ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ اَوْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يُؤَذِّنُ لِلصَّلٰوةِ قَبْلَ دُخُوْلِ وَقْتِهَا اِلَّا فِى الْفَجْرِ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى -

আযান ইক্বামত প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ ১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ও জুমআর জন্য আযান দেয়া সুন্নত। অন্য নামাযের জন্য আযান সুন্নত নয়। আযানের মধ্যে তারজী' (দুরস্ত) নেই। ফজরের আযানে হায়্যা আলাল ফালাহর পর দু'বার "আস্‌সালাতু খায়রুম মিনান্নাওম" বৃদ্ধি করতে হবে। ২. ইক্বামাত ও আযানের ন্যায়। তবে এর মধ্যে 'হায়্যা আলাল ফালাহ'র পর দু'বার "ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ সালাহ্" বাড়াবে। ৩. আযানের মধ্যে থেমে থেমে বলবে। আর ইক্বামাতের মধ্যে তাড়াতাড়ি বলবে। ৪. আযান ও ইক্বামাত কিবলামুখী হয়ে বলবে। ৫. কাযা নামাযের জন্যে ও আযান ইক্বামত বলবে। যদি কয়েক ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায় তাহলে প্রথম নামাযের জন্যে আযান-ইক্বামত বলবে। আর বাকী নামাযের ব্যাপারে সে ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা করলে আযান ইক্বামত উভয় বলতে পারে। ইচ্ছা করলে শুধু ইক্বামতের উপর ও ক্ষান্ত করতে পারে। ৬ আযান-ইক্বামাত পাক অবস্থায় বলা উচিৎ, বিনা উযূতে আযান বললে ও জায়েয হয়ে যাবে। বিনা উযূতে ইক্বামত বলা, এবং জানাবাত (গোসল ফরয) অবস্থায় আযান দেয়া মাকরূহ। ৭. ওয়াক্তের পূর্বে নামাযের জন্যে আযান দিবে না। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর মতে ফজরের নামাযের জন্যে (ওয়াক্তের পূর্বে) আযান দিতে পারে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اذان – শব্দটি, فَعَال – এর ওযনে মাসদার, কারো মতে ইসমে মাসদার, কেননা, اَذَّنَ – এর মাসদার, تَاذِيْنٌ – ব্যবহৃত হয়, অর্থ ঘোষণা করা, تَرْجِيْع – অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, আযানের উভয় শাহাদতকে প্রথমে আস্তে বলার পর পুনরায় উচ্চঃস্বরে বলাকে تَرْجِيْع বলে। يَتَرَسَّلُ – ধীরে ধীরে, থেমে-থেমে বলবে, يَحْدُرُ – অবিরত বলে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ আযান প্রবর্তনের ঘটনা ঃ ইসলামের সূচনা লগ্নে মুসলমানের সংখ্যা কম থাকায় আযানের প্রয়োজন পড়তো না, কারণ মসজিদের নিকটবর্তী অবস্থানের কারণে নামাযের সময় হলেই তারা মসজিদে সমবেত হতো। মুসলমানের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি ও দূরে অবস্থানের কারণে একই সময় সমবেত হতে

সমস্যা দেখা দেয়। ফলে এর সহজ উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজন পড়ে। এ লক্ষে মহানবী (স.) সাহাবীগণকে নিয়ে একদা পরামর্শে বসেন। কেউ নামাযের সময় হলে ঘন্টা বাজানোর, কেউ অগ্নি প্রজ্বলিত করার, কেউবা শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার মন্তব্য পেশ করেন। নবীজী (স.) এর নিকট কোনটি মনঃপূত না হওয়ায় সেদিনকার পরামর্শ সভা মূলতবী হয়ে যায়। আল্লাহর মেহের! উক্ত রাতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রব্বিহি ও হযরত উমর (রা.) সহ অনেককেই স্বপ্ন যোগে আযানের শব্দ শেখান হয়। প্রত্যুষে আনন্দে যাঁর যাঁর স্বপ্ন নবীজী (সা.) কে অবহিত করতে ছুটে যান। নবীজী (সা.) একও অভিন্ন স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে বলেন–আল্লাহর পক্ষ হতেই ফেরেশতার মাধ্যমে এ সুন্দর পদ্ধতি জানান হয়েছে। সুতরাং আজ হতে এটাই হবে মুসলিম জাতিকে নামাযের জন্যে আহবান করার পদ্ধতি। পরে হযরত বেলালের কণ্ঠস্বর উঁচু হওয়ায় তাঁকে রীতিমত মুয়ায্যিন নির্ধারণ করা হয়।

قوله اَلْاَذَانُ سُنَّةٌ ঃ এখানে সুন্নত দ্বারা সুন্নতে মুওয়াক্কাদা উদ্দেশ্য। কারো কারো মতে উভয়টি ওয়াজিব। বস্তুতঃ গুরুত্বের দিক দিয়ে উভয়টি নিকটবর্তী। উল্লেখ্য যে, এ বিধান জামাতে নামাযের ব্যাপারে। একাকী নামাযীর জন্যে সুন্নতে গায়রে মুওয়াক্কদা বা মুস্তাহাব।

<u>**আযানের শব্দাবলীর ব্যাপারে মতভেদ ঃ**</u> আযানের শব্দাবলীর ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। যথা– ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে মোট ১৯টি, তা এভাবে যে, اَللّٰهُ اَكْبَرُ ৪ বার, প্রথমে দুবার আস্তে অতঃপর দু'বার জোরে (তারজী' সহ) মোট ৮ বার। حَيَّ عَلٰى দ্বয় ২ বার করে ৪ বার। অতঃপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ ২ বার ও لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - ১ বার। ইমাম মালেক (র.) এর মতে ১৭টি উপরোক্ত নিয়মে। তবে প্রথমে اَللّٰهُ اَكْبَرُ - ২ বার। আর ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে ১৫টি প্রথমোক্ত নিয়মে। তবে তিনি তারজী এর প্রবক্তা নন, বিধায় শাহাদত দ্বয়ে প্রথম ৪টি কম। উল্লেখ্য যে, হযরত বেলালের বর্ণিত হাদীস এর দলিল। আর শাফেয়ী (র.) আবু মাহযূরা (র.) এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন।

এর উত্তরে হানাফীগণ বলেন যে, আবূ মাহযূরা (রা.) কে শিক্ষা দেওয়ার মানসে শাহাদতের শব্দদ্বয় ডবল উচ্চারণ করা হয়েছে। উপরন্ত হযরত বেলাল যেহেতু স্থায়ী মুয়াযযিন, সুতরাং তাঁর বর্ণিত হাদীসই অধিক গ্রহণযোগ্য।

قوله وَيَزِيْدُ فِى الْفَجْرِ اَلصَّلٰوةُ الخ ঃ একবার ঘুমের কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ফজরের জামাতে হাযির হতে বিলম্ব হয়ে যায়। হযরত বেলাল (রা.) রাসূল (সা.) এর হুজরা শরীফের নিকট যেয়ে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ الخ বাক্য উচ্চারণ করেন। এতে নবীজীর নিদ্রা ভঙ্গ হলে দ্রুত মসজিদে হাজির হন এবং ঐদিন হতেই তিনি এ বাক্যটি ফজরের আযানে বৃদ্ধি করার নির্দেশ দেন।

قوله وَيَتَرَسَّلُ فِى الْاَذَانِ ঃ আযানে تَرَسِّيْل তথা থামার পদ্ধতি এই যে, দু'বার আল্লাহ আকবর বলে থামবে। পুনরায় দু'বার আল্লাহু আকবর বলে থামবে। এরপর প্রতি শ্বাসে এক একশব্দ একবার করে বলবে। সর্বশেষে এক শ্বাসে দু'বার আল্লাহু আকবর বলবে।

উল্লেখ্য যে, আযানের মধ্যে একই শব্দ একবার অতি দ্রুত ও আরেকবার অতিরিক্ত টেনে বলা এবং স্বরকে উঠান নামান তথা কাপানো যা আমাদের দেশে প্রায়ই জায়গায় প্রচলিত, অনেক মুহাক্কিক আলিম এটাকে মাকরূহ আখ্যায়িত করেছেন।

قوله اِلَّا فِى الْفَجْرِ ঃ আয়েম্মায়ে ছালাছার নিকট ফজরের আযান ওয়াক্তের আগে দেওয়া জায়েয। কারণ কোন কোন হাদীসে সুব্হে সাদিকের আগে আযান দেওয়া প্রমাণিত আছে। হানাফীগণের মতে তা তাহাজ্জুদের আযান ছিল, ফজরের নয়। আর এটা ক্ষেত্রে বিশেষ জায়েয।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। اذان এর আভিধানিক অর্থ কি এবং আযান প্রবর্তনের ঘটনা কি? লিখ।

২। اذان এর শব্দের সংখ্যার ব্যাপারে ইমামগণের মতান্তর কি? উল্লেখ কর।

৩। ترجيع ও ترسيل এর অর্থ ও এর বিধান কি? লিখ।

بَابُ شُرُوطِ الصَّلٰوةِ

يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّيْ اَنْ يُّقَدِّمَ الطَّهَارَةَ مِنَ الْاَحْدَاثِ وَالْاَنْجَاسِ عَلٰى مَاقَدَّمْنَا: وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَالْعَوْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ مَاتَحْتَ السُّرَّةِ اِلَى الرُّكْبَةِ وَالرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ دُوْنَ السُّرَّةِ: وَبَدَنُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ كُلُّهُ عَوْرَةٌ اِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَا كَانَ عَوْرَةً مِّنَ الرَّجُلِ فَهُوَ عَوْرَةٌ مِنَ الْاَمَةِ وَبَطْنُهَا وَظَهْرُهَا عَوْرَةٌ وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنْ بَدَنِهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَمَنْ لَّمْ يَجِدْ مَايُزِيْلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلّٰى مَعَهَا وَلَمْ يُعِدْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا صَلّٰى عُرْيَانًا قَاعِدًا يُوْمِيْ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَاِنْ صَلّٰى قَائِمًا اَجْزَأَهُ وَالْاَوَّلُ اَفْضَلُ -

নামাযের শর্তাবলী

অনুবাদ ॥ ১. নামায ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্যে সর্বাগ্রে ওয়াজিব হল পূর্বোল্লেখিত যাবতীয় নাপাকী ও অপবিত্রতা হতে পবিত্র হওয়া। ২. ছতর আবৃত করা, পুরুষের ছতর হল নাভীর নিচ হতে হাঁটু পর্যন্ত। হাঁটু ছতর তবে নাভী ছতর নয়। আর স্বাধীন মহিলার মুখ মন্ডল ও হাতের গোছা ছাড়া সর্বাঙ্গ ছতর। পুরুষের যে অঙ্গ ছতর ক্রীতদাসীর জন্যে তা ছতর। উপরন্ত তার পেট ও পিঠ ও ছতর। এছাড়া বাকী অঙ্গ ছতর নয়। ৩. কেউ নাপাকী দূর করার মত কিছু না পেলে উক্ত নাপাকী সহকারে নামায পড়বে পরে দোহরাতে হবে না। ৪. কেউ যদি ছতর আবৃত করার কাপড় না পায় তাহলে সে উলঙ্গ অবস্থায় বসে নামায পড়বে। রুকূ সাজদার জন্যে ইশারা করবে। (মাথা ঝুকাবে মাত্র)। দাঁড়িয়ে নামায পড়লে ও জায়েয হয়ে যাবে তবে প্রথমটিই উত্তম।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ شُرُوط - شَرْط এর বহুঃ যে কোন বস্তুর বহিরাগত এমন বিষয় যা ছাড়া তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না, (বলা হয়)–شَرْطُ الشَّيْئِ خَارِجُ الشَّيْئِ وَرُكْنُ الشَّيْئِ دَاخِلُ الشَّيْئِ– اَحْدَاث - حَدَثٌ এর বহুঃ এমন নাপাকী অবস্থা যা থেকে কেবল উযূ দ্বারাই পাক হওয়া যায়, اَنْجَاس - نَجَسٌ এক বহুঃ নাপাক বস্তু উদ্দেশ্য, عَوْرَةٌ গুপ্তাঙ্গ, ছতর, سُرَّة – নাভী, رُكْبَة – হাঁটু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَ الْعَوْرَة ঃ পুরুষের ছতর নাভীর নিচ হতে হাঁটুর প্রান্তসীমা পর্যন্ত। আর মহিলাদের-মুখ, হাতের পোছা ও পায়ের পাতা ছাড়া সর্বাঙ্গ ছতর। উল্লেখ্য যে, নামাযের মধ্যে যে কোন অঙ্গের এক চতুর্থাংশ খুলে গেলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। গ্রন্থকার পায়ের পাতার কথা উল্লেখ করেননি, অথচ বাকী দু অঙ্গের তুলনায় পা বের করার জরুরতই প্রকট। সুতরাং পা ছতরের বাইরে থাকাই সমীচীন। এ কারণে হেদায়া গ্রন্থকার স্পষ্টাকারে পা ছতর বহির্ভূত বলেছেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমান মহিলাদের সর্বাঙ্গই ছতরে শামিল বলে অনেক মুহাক্কিক আলেম ফতোয়া দিয়েছেন। অবশ্য তা নামাযের জন্যে নয় বরং বাইরে যাতায়াত বা পর পুরুষের সামনে যাওয়ার ব্যাপারে।

قوله وَمَن لَّمْ يَجِدْ مَايُزِيْلُ بِه ঃ এ ক্ষেত্রে দু'টি ছুরত হতে পারে। যদি এক চতুর্থাংশ বা এর চেয়ে কম অংশে নাপাক হয় তাহলে সবৈক্য মতে ঐ কাপড় পরেই নামায পড়তে হবে, বিবস্ত্র হয়ে পড়লে সহীহ হবে না। কারণ বস্তুর চতুর্থাংশ গোটা বস্তুর হুকুম বা বিধানে গণ্য হয়। আর যদি এর বেশী অংশ নাপাক হয় তাহলে শায়খাইনের মতে সে ইচ্ছাধীন। তবে উক্ত কাপড় পরে নামায পড়াই শ্রেয়। আর ইমাম মুহাম্মদ ও মালেক (র.) এর মতে তার এখতিয়ার থাকবেনা বরং উক্ত কাপড় পরেই নামায পড়তে হবে।

وَيَنْوِى لِلصَّلٰوةِ الَّتِىْ يَدْخُلُ فِيْهَا بِنِيَّةٍ لَّا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيْمَةِ بِعَمَلٍ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ خَائِفًا فَيُصَلِّىْ اِلٰى اَىِّ جِهَةٍ قَدَرَ فَاِنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهٖ مَنْ يَّسْئَلُهٗ عَنْهَا اِجْتَهَدَ وَصَلّٰى فَاِنْ عَلِمَ اَنَّهٗ اَخْطَأَ بَعْدَ مَا صَلّٰى فَلَا اِعَادَةَ عَلَيْهِ وَاِنْ عَلِمَ ذٰلِكَ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ اِسْتَدَارَ اِلَى الْقِبْلَةِ وَبَنٰى عَلَيْهَا ـ

অনুবাদ ॥ ৫. যে নামায সে শুরু করতে যাচ্ছে উক্ত নামাযের নিয়ত করবে, নিয়ত এমনভাবে করবে যে, উক্ত নিয়ত ও তাকবীরে তাহরীমার মাঝে অন্যকোন আমল দ্বারা ব্যবধান করবে না। ৬. কিবলার দিকে মুখ করবে। তবে যদি (প্রাণ সংহারক কোন বস্তুর ভয়ে) ভীত হয় তাহলে যে দিকে সক্ষম হবে সেদিকে ফিরে নামায আদায় করবে। যদি কেবলার ব্যাপারে কারো সন্দেহের সৃষ্টি হয়, আর জিজ্ঞেস করার মত কোন মানুষ যদি সেখানে উপস্থিত না থাকে তাহলে চিন্তা-ভাবনা করে (কেবলা নির্ধারণ করতঃ) নামায আদায় করবে। নামায আদায়ের পর যদি জানতে পারে যে, ভুল হয়েছে তথাপি তার জন্যে নামায দোহরাতে হবে না। যদি সে নামাযের মধ্যেই এটা জানতে পারে তাহলে (নামাযের মধ্যেই) কিবলার দিকে ঘুরে দাঁড়াবে এবং ঐ নামাযের পরেই বেনা করবে। (অর্থাৎ বাকী নামায ঐ নামাযের সাথে পড়ে নিবে। নতুন করে শুরু করতে হবে না)।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ خَائِف – ভীতু, শংকিত, جِهَة – দিক, بِحَضْرَتِه – তার সম্মুখে উপস্থিতিতে, اِجْتَهَد –গবেষণা বা চিন্তা-ভাবনা করবে, اَخْطَأَ – ভুল করেছে, اِسْتَدَارَ – ঘুরে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَيَنْوِى لِلصَّلٰوةِ ঃ যে নামায পড়তে চাচ্ছে উক্ত নামাযের নিয়ত অন্তরে রাখবে। উল্লেখ্য যে, نِيت অর্থ ইচ্ছা, সংকল্প। এর স্থান যবান নয় বরং অন্তর। অতএব অন্তরের ইচ্ছা-ই ধর্তব্য। সুতরাং কেউ অন্তরে এক নামায পড়ার ইচ্ছে রেখে মুখে বে-খেয়ালে অন্যকোন নামায উচ্চারণ করে তথাপি তার নাম নামায ছহীহ হয়ে যাবে। অন্তরের সংকল্পের সাথে সাথে মুখে উচ্চারণ করা মুস্তাহাব। তবে মুখে নিয়ত উচ্চারণে যদি তাকবীরে তাহরীমা বা রাকাত ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে উচ্চারণ না করাই উত্তম হবে।

قوله وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ الخ ঃ নামাযে কেবলামুখী হওয়া ফরয। কেননা ইরশাদ হয়েছে– فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهٗ তোমরা (নামাযে) খানায়ে কা'বার প্রতি মুখ ফিরাও। উল্লেখ্য যে, মক্কাবাসীর জন্যে হুবহু কা'বার প্রতি মুখ করে দাঁড়ান ফরয। আর দুরবর্তী সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে নিজ নিজ দেশ ও অঞ্চল হতে কা'বা যেদিকে অবস্থিত উক্ত দিকে ফিরে নামায পড়া ফরয। হুবহু কা'বা গৃহের প্রতি ফেরা ফরয নয়। অর্থাৎ নামাযী চক্ষুদ্বয়ের মধ্যভাগ হতে সমানভাবে দুদিকে দুটি সরল রেখা টানলে যদি কা'বা উভয় রেখার মাঝে ৯০ ডিগ্রী অপেক্ষা কমের মধ্যে হয় তাহলে তা কেবলার দিক বলে বিবেচিত হবে। এর মধ্যে মুখ ফিরিয়া নামায পড়লে যদিও হুবহু কা'বার দিক না হয় তথাপি নামায ছহীহ হয়ে যাবে। যথা– চিত্রে লক্ষ কর–

কা'বা
৯০°
নামাযী

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। عَوْرَة অর্থ কি? নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে এর সীমারেখা কি? বিস্তারিত লিখ।

২। নিয়্যত অর্থ কি? এর গুরুত্ব সম্পর্কে যা জান লিখ।

৩। কেবলামুখী হওয়া বলতে কি বুঝায়? কতটুকু পরিমাণ বাঁকা হয়ে দাঁড়ালেও নামায সহীহ হয়ে যাবে? বিস্তারিত লিখ।

بَابُ صِفَةِ الصَّلٰوةِ

فَرَائِضُ الصَّلٰوةِ سِتَّةٌ اَلتَّحْرِيْمَةُ وَالْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ وَالرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ وَالْقَعْدَةُ الْاَخِيْرَةُ مِقْدَارُ التَّشَهُّدِ وَمَا زَادَ عَلٰى ذٰلِكَ فَهُوَ سُنَّةٌ وَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِى صَلٰوتِهٖ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرِ حَتّٰى يُحَاذِىْ بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ فَإِنْ قَالَ بَدَلًا مِنَ التَّكْبِيْرِ اَللّٰهُ اَجَلُّ اَوْ اَعْظَمُ اَوْ اَلرَّحْمٰنُ اَكْبَرُ اَجْزَأَهٗ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَايَجُوْزُ اِلَّا اَنْ يَّقُوْلَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَوْ اَللّٰهُ الْاَكْبَرُ اَوْ اَللّٰهُ الْكَبِيْرُ وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى وَيَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ وَيَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَيُسِرُّ بِهِمَا ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً مَعَهَا اَوْ ثَلٰثَ اٰيَاتٍ مِنْ اَىِّ سُوْرَةٍ شَاءَ وَإِذَا قَالَ الْاِمَامُ وَلَا الضَّآلِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ وَيَقُوْلُهَا الْمُؤْتَمُّ وَيُخْفِيْهَا ـ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَيُفَرِّجُ اَصَابِعَهٗ وَيَبْسُطُ ظَهْرَهٗ وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهٗ وَلَا يُنَكِّسُهٗ وَيَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ثَلٰثًا وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ ـ

নামাযের পদ্ধতি

<u>অনুবাদ॥ নামাযের রোকনসমূহ</u> ঃ নামাযের (ভিতরগত) ফরয ছয়টি, ১. তাকবীরে তাহরীমা বলা ২. দাঁড়ান, ৩. কোরানের অংশ পড়া, ৪. রুকু করা, ৫. সাজদা করা, ৬. শেষে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসা. আর এর বেশী বসা সুন্নত।

<u>নামায আদায়ের পদ্ধতি</u> ঃ ১. কেউ নামায শুরু করলে সর্বাগ্রে তাকবীর (আল্লাহু আকবর) বলবে। তাকবীরের সাথে সাথে উভয় হাত এতটুকু উত্তোলন করবে যাতে উভয় বৃদ্ধাঙ্গুল উভয় কানের লতি বরাবর হয়। কেউ যদি আল্লাহু আকবরের স্থলে 'আল্লাহু আজাল্লু' বা আ'যম অথবা 'আররহমানু আকবর' বলে তাহলে তরফাইনের মতে নামায সহীহ হয়ে যাবে। আর ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর মতে কেবল 'আল্লাহু আকবর' আল্লাহুল আকবর, আল্লাহুল কাবীর ছাড়া (অন্য কিছু বললে) জায়েয হবে না। অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধারন করবে। উভয় হাত রাখবে নাভীর নীচে। অতঃপর سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ ও আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ নিম্নস্বরে (আস্তে) পড়বে। অতঃপর সুরায়ে ফাতিহা ও এর সাথে অন্যকোন সূরা বা যে কোন সূরা হতে তিনটি আয়াত পাঠ করবে। ইমাম যখন وَلَا الضَّآلِّيْنَ বলবেন তখন মুক্তাদী আস্তে আমীন বলবে। অতঃপর তাকবীর বলে রুকুতে যাবে ও উভয় হাত দ্বারা হাঁটুর উপর (শক্তভাবে) ধরবে। হাতের আঙ্গুল গুলো প্রশস্ত রাখবে, পিঠ (সোজা করে) বিছিয়ে দিবে, মাথা উঁচু ও করবে না, নীচু ও করবে না, রুকুর মধ্যে সুবহানা রব্বিয়াল আযীম কমপক্ষে তিনবার বলবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ فَرَائِضُ - فَرِيْضَةٌ – এর বহুঃ অবশ্য পালনীয়, অপরিহার্য বিষয়, اَلتَّحْرِيْمَةُ – হারাম করণ, অত্র তাকবীরের সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব সকল জায়েয কাজ হারাম হয়ে যায় বিধায় একে তাকবীরে তাহরীমা বলে। قَعْدَةٌ – বৈঠক, বসা, يُحَاذِى –বরাবর হবে, بِإِبْهَامَيْهِ – উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা, شَحْمَةٌ – কানের লতি, يَعْتَمِدُ – ধরবে অর্থে, يُسِرُّ – আস্তে বলবে, مُؤْتَمٌّ – মুক্তাদী। رُكْبَةٌ – হাঁটু, يُفَرِّجُ – প্রশস্ত রাখবে, ظَهْرٌ – পিঠ, لَايُنَكِّسُ – নীচু করবে না,

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله فَرَائِضُ الصَّلٰوةِ ঃ নামাযের মধ্যে ৬টি জিনিস ফরয বা রোকন প্রথমে তাকবীরে তাহরীমা বলা, এটা বস্তুতঃ নামাযের বহিরাংশের ফরয, নামাযের ভিতরগত রোকনের নিকটবর্তী হওয়ায় এটাকে ভিতরগত গণ্য করা হয়েছে। শায়খাইন (র.) এর মতে এটা ভিতরগত ফরয নয়। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ত্বহাবী (র.) প্রমূখের মতে এটা শর্ত নয় বরং রোকন।

قوله وَالْقِيَامُ ঃ দাঁড়িয়ে নামায পড়া ফরয। তবে নফল নামায বসে পড়ার অনুমতি আছে। যদি ও এতে সওয়াব অর্ধেক হয়। সুতরাং দাঁড়ানোর শক্তি থাকতে বসে ফরয নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। চাই পুরুষ হোক বা মহিলা।

নামাযে হাত উত্তোলন সীমা ঃ قوله وَرَفَعَ يَدَيْهِ ঃ হানাফীগণের মতে হাত উত্তোলনের সীমা কানের লাত পর্যন্ত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কাঁধ পর্যন্ত। ইমাম মালেক (র.)–এর মতে মাথা পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে, হাতের নিম্নভাগ কাঁধ বরাবর, বৃদ্ধা আঙ্গুল কানের লতি বরাবর। এবং বাকী আঙ্গুলের মাথা কানের উপরাংশ পর্যন্ত উঠানোর দ্বারা সব রেওয়াতের উপর আমল হয়ে যায়।

قوله سُنَّةٌ ঃ এখানে সুন্নত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) এর ব্যাপক অর্থ তথা সুন্নতে রাসূল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার অর্থ গ্রহণ করেছেন। কেননা এর মধ্যে ওয়াজিব ও শামিল রয়েছে।

নামাযে হাত কোথায় বাঁধবে? قوله وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ ঃ হযরত ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, সুফিয়ান সাওরী প্রমুখসহ সকল হানাফী আলেমের মতে নাভীর নীচে হাত বাধা সুন্নত। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা গ্রন্থে ইবরাহীম আদহাম (র.) এর বর্ণিত মারফু ও সহীহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে সীনার উপর হাত বাঁধা সুন্নত। ইমাম মালেক (র.) এর মতে হাত ছেড়ে রাখা সুন্নত।

قوله وَيُسِرُّ بِهِمَا ঃ ইমাম আবু হানীফা, আহমদ ও সাওরী (র.) এর মতে আউযু ও বিসমিল্লাহ আস্তে পড়া সুন্নত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে জাহরী নামাযে বিসমিল্লাহ স্বরাবে ও সিররি নামাযে নীরবে পড়া সুন্নত। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে ফরয নামাযে সূরার সাথে বিসমিল্লাহ পড়া না জায়েয।

اٰمِيْنَ বলার হুকুম ঃ قوله وَيَقُوْلُهَا الْمُؤْتَمُّ ঃ ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও আহমদ (র.) এর মতে ইমাম মুক্তাদী ও একাকী নামায আদায়কারী সকলের জন্যে আমীন বলা সুন্নত। তবে ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) এর মতে উচ্চস্বরে বলা সুন্নত। আর হানাফী ইমামগণ ও ইমাম শাফেয়ী (র.) এর পরবর্তী উক্তি মতে আস্তে আমীন বলা সুন্নত। ইমাম মালেক (র.) এর মতে কেবল মুক্তাদীর জন্যে আমীন বলা সুন্নত। এ ব্যাপারে হানাফীগণের দলিল হল হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীস যে, নামাযে চারটি বিষয় চুপে চুপে বলবে–আমীন, ছানা, আউযু ও বিসমিল্লাহ।

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَقُوْلُ الْمُؤْتَمُّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَ: اسْتَوٰى قَائِمًا كَبَّرَ وَسَجَدَ وَاعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَسَجَدَ عَلٰى أَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلٰى أَحَدِهِمَا جَازَ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَا يَجُوْزُ الْإِقْتِصَارُ عَلَى الْأَنْفِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ فَإِنْ سَجَدَ عَلٰى كَوْرِ عِمَامَتِهِ أَوْعَلٰى فَاضِلِ ثَوْبِهِ جَازَ وَيُبْدِئُ ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِىْ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَيَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلٰى ثَلٰثًا وَذٰلِكَ أَدْنَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيُكَبِّرُ وَإِذَا اطْمَأَنَّ جَالِسًا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَإِذَا اطْمَأَنَّ سَاجِدًا كَبَّرَ وَاسْتَوٰى قَائِمًا عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَلَا يَقْعُدُ وَلَا يَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَيَفْعَلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَافَعَلَ فِى الْأُوْلٰى إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَتَعَوَّذُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِى التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلٰى فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ إِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ الْيُمْنٰى نَصْبًا وَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَيَبْسُطُ أَصَابِعَهُ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَالتَّشَهُّدُ أَنْ يَّقُوْلَ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ وَلَا يَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا فِى الْقَعْدَةِ الْأُوْلٰى وَيَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً فَإِذَا جَلَسَ فِىْ اٰخِرِ الصَّلٰوةِ جَلَسَ كَمَا جَلَسَ فِى الْأُوْلٰى وَتَشَهَّدَ وَصَلّٰى عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا بِمَا شَاءَ مِمَّا يُشْبِهُ أَلْفَاظَ الْقُرْاٰنِ وَالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُوْرَةِ وَلَا يَدْعُوْ بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ -

---

__অনুবাদ__ ॥ অতঃপর মাথা উত্তোলন করে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলবে। আর মুক্তাদী বলবে "রব্বানা লাকাল হাম্‌দ"। যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলে সাজদায় গমন করবে। উভয় হাত জমীনের উপর রাখবে। চেহারা রাখবে উভয় হাতের মাঝে। সাজদা করবে নাক ও কপালের উপর, যদি এর কোন একটির উপর যথেষ্ট করে তথাপি আবু হানীফা (র.) এর মতে জায়েয হয়ে যাবে। আর সাহিবাইনের মতে ওযর ছাড়া কোন একটির উপর যথেষ্ট করা জায়েয হবে না। যদি কেউ পাগড়ীর

প্যাচের উপর বা বস্ত্রের অতিরিক্ত অংশের ওপর সাজদা করে তা জায়েয হবে। সাজদায় উভয় বাহু খুলে রাখবে, পেট উভয় উরু থেকে পৃথক রাখবে এবং পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী রাখবে। সাজদায় তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى বলবে। অতঃপর তাকবীর বলে মাথা উত্তোলন করবে। আর এটাই তাসবীহের নিম্নতম পরিমাণ। অতঃপর মাথা উত্তোলন করবে ও তাকবীর বলবে। শান্তভাবে বসার পর তাকবীর বলে সাজদায় গমন করবে। স্থিরতার সাথে সাজদা করার পর তাকবীর বলে পায়ের পাতার ওপর ভর করে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। যমীনের ওপর হাত দ্বারা ভর লাগাবে না। প্রথম রাকাতে যা কিছু করেছে দ্বিতীয় রাকতে তাই করবে। তবে ছানা ও আউযু পড়বে না এবং তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্যকোন তাকবীরে হাত উঠাবেনা। দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সাজদা হতে মাথা উঠানোর পর বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তার ওপর বসবে এবং ডান পায়ের আঙ্গুল সমূহ কেবলামুখী করে পা খাড়া রাখবে। আর উভয় হাত উভয় রানের ওপর রাখবে, আঙ্গুল সমূহ বিছিয়ে রাখবে। অতঃপর তাশাহ্হুদ পড়বে। তাশাহ্হুদ হল–আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি----। প্রথম বৈঠকে আবদহু ওয়া রাসূলুহ এরপর কিছু বৃদ্ধি করবে না। শেষের দু'রাকাতে কেবল সূরায়ে ফাতেহা পড়বে। নামাযের শেষে যখন বসবে প্রথম বৈঠকে বসার ন্যায় বসবে ও তাশাহ্হুদ পড়বে এবং নবীজী (সা.) এর ওপর দরূদ পড়বে। এরপর কুরআনের শব্দে ও হাদীসে বর্ণিত দোয়ার শব্দের সাথে সামঞ্জস্যশীল দোয়া করবে। মানুষের কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন দোয়া করবে না। অতঃপর ডানে সালাম ফিরাবে এবং বলবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ। এভাবে বাম দিকে ও সালাম ফিরাবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ جُبْهَةٌ – কপাল, ললাট, اِطْمَأَنَّ – ধীরস্থির হবে, শান্ত হবে, نَصَبَ – খাড়া/সোজা রাখবে, اِفْتَرَشَ – বিছিয়ে দিবে। اَلْمَأْثُوْرَةُ বর্ণিত। এখানে কোরান, হাদীসে বর্ণিত উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ তাহ্মীদ প্রসঙ্গে মতভেদ ঃ قوله اَلْمُؤْتَمُّ رَبَّنَا لَكَ الخ ঃ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ইমাম কেবল সামিআল্লাহু --- বলবে। মুক্তাদী ও মুনফারিদ (একাকী নামাযরত ব্যক্তি) 'রব্বানা লাকাল হামদ' বলবে, সাহিবাইনের মতে ইমাম ও আস্তে আস্তে রব্বানা ----- বলবে। বুখারী ও মুসলিমে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক উভয়টি বলার প্রমাণ রয়েছে। অবশ্য ইবনে মাজা ছাড়া ছিহাহ ছিত্তার বাকী গ্রন্থে ইরশাদ হয়েছে যে, ইমাম সামি আল্লাহু -- বললে তোমরা 'রব্বানা লাকাল হাম্দ' বলবে। এ হাদীসে যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন বন্টন বুঝায় এ কারণে ইমাম সাহেব (র.) উক্ত মতের প্রবক্তা হয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, মুনফারিদের ব্যাপারে তিন ধরনের উক্তি রয়েছে। যথা– (১) শুধু সামিআল্লাহু --- বলবে। আবু হানীফা (র.) এর এমতটি আবু ইউসূফ (র.) এর সূত্রে মূলী গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। (২) শুধু রব্বানা--- এটা কান্যের গ্রন্থকার কাফী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হালওয়ানী ও ত্বহাবী (র.) এ মতকে পসন্দ করেছেন। (৩) উভয়টি বলবে, এমতটি হেদায়া গ্রন্থকার সর্বাধিক বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। আল্লামা সদরুশ শহীদ (র.) বলেছেন– وعليه الْاِعْتِمَاد নির্ভরযোগ্য মত এটাই। সুতরাং একাকী নামাযরত ব্যক্তি রুকু হতে মাথা উঠানোর সময় মাফিক আল্লাহ--- ও দাঁড়ানোর পর রব্বানা---- বলবে।

قوله وَسَجَدَ عَلٰى اَنْفِهٖ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নাক ও কপাল উভয়টির ওপর সাজদা করার সার্বক্ষণিক আমল রয়েছে। অবশ্য ওযর বশতঃ একটির ওপর যথেষ্ট করা ও জায়েয। তবে শুধু নাকের নরম অংশ স্পর্শ করে সাজদা করলে নামায হবে না। সাহিবাইনের মতে বিনা ওযরে একটির ওপর যথেষ্ট করলে নামায হবে না। দূররে মুখতারের বর্ণনা মতে আবু হানীফা (র.) এটা মাকরূহ হওয়ার মত পরিত্যাগ করে সাহিবাইনের এ মত গ্রহণ করেছেন।

قوله وَإِذَا اِطْمَانَّ ঃ তরফাইনের মতে নামাযের সকল রোকনের মধ্যে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা ওয়াজিব আবু ইউসূফ (র.)-এর মতে ফরয।

<u>রফই' য়াদায়ন প্রসঙ্গ ঃ</u> قوله وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ الخ ঃ হানাফীগণের মতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া নামাযে অন্য কোথাও হাত উত্তোলন করবেনা। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবু বকর, উমর, আলী, ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা প্রমূখ রাদিয়াল্লাহু আনহুম হতে রফই' য়াদাইন না করা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত রয়েছে। ইমাম মালেক (র.) এর সর্বাধিক সহীহ মত ও রফই' য়াদাইন না করা।

অপরদিকে হযরত ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) রফই' য়াদাইন করার পক্ষে। তাঁদের স্বপক্ষে সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে হযরত জাবের, আনাস, ইবনে আব্বাস প্রমূখ সাহাবী (রা.) এর আমল বিদ্যমান। উপরন্ত হযরত আবু হুমায়দ ও জাবের (রা.) কর্তৃক রফই' য়াদাইন না করার হাদীস এ মতের প্রমাণ বহন করে।

হানাফীগণের দলীল উপরোক্ত সাহাবায়ে কেরাম এবং অধিকাংশ মদীনাবাসী ও কুফাবাসীর আমল। এর সাথে সাথে হযরত জাবের (রা.) এরই অপর এক হাদীস যে, নবীজী (সা.) আমাদিগকে রফই য়াদাইন করতে দেখে ইরশাদ করেছিলেন– "ব্যাপার কি? আমি তোমাদিগকে পাগলা উটের নড়াচড়ার ন্যায় নামাযের মধ্যে হাত উঠাতে দেখছি কেন? নামাযের মধ্যে স্থিরতা অবলম্বন কর।" অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–لَا تُرْفَعُ الْاَيْدِئ اِلَّا فِى سَبْعِ مَوَاطِنَ تَكْبِيْرَاتِ الْاِفْتِتَاحِ وَتَكْبِيْرَةِ الْقُنُوْتِ . الخ এতে সাত স্থানে হাত উঠানের কথা ব্যক্ত হয়েছে তন্মধ্যে একটি হল নামাযে কেবল তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠান। বাকী যে সব হাদীসে হাত উঠানোর কথা আছে হানাফীগণ তা অস্বীকার করেন না বরং বলেন– এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগের আমল ছিল পরবর্তীকালে তা মনসূখ তথা রহিত হয়ে গেছে। যেমন–নামাযে কথা বলা, হাঁটা-চলা করা রহিত হয়েছে।

<u>পুরুষ ও মহিলার নামাযের পার্থক্য ঃ</u> "খাযাইনুল আসরার" এর ভাষ্য মতে পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের মধ্যে ২৫টি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। (১) মহিলারা হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, (২) হাত বের করবেনা, (৩) হাতের পোছার উপর অপর হাত বাঁধবে, (৪) স্তনের নীচে হাত বাঁধবে, (৫) রুকুতে কম ঝুকবে, (৬) রুকুতে হাতে ভর করবে না, (৭) রুকুতে হাতের আঙ্গুল মিলিত রাখবে, (৮) রুকুতে হাত হাঁটুর উপর রাখবে (স্বজোরে ধরবেনা), (৯) রুকুতে হাঁটু সামান্য ঝুকায়ে রাখবে, (১০) রুকুতে শরীর ও হাত মিলিয়ে রাখবে, (১১) সাজদার মধ্যে বগল মিলিয়ে রাখবে, (১২) সাজদায় উভয় হাত বিছিয়ে রাখবে, (১৩) বসার সময় উভয় পা ডানদিকে বের করে দিয়ে পাছার ওপর বসবে, (১৪) বসার সময় হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে রাখবে, (১৫) নামাযে লোকমার প্রয়োজন হলে হাতে তালির মাধ্যমে শব্দ করবে, (১৬) পুরুষের নামাযের ইমামতি করবেনা, (১৭) একাকী মহিলাদের জামাতে নামায মাকরূহ, (১৮) মহিলাদের জামাতে ইমাম তাদের মাঝে দাঁড়াবেনা, (১৯) মহিলাদের জন্য জামাতে শরীক হওয়া মাকরূহ, (২০) জামাতে পুরুষের পিছনে দাঁড়াবে, (২১) মহিলাদের ওপর জুমআ ফরয নয়, (২২) ঈদের নামায ওয়াজিব নয়, (২৩) তাকবীরে তাশরীক (এর বর্ণনা মতে) ওয়াজিব নয়, (২৪), ফজরের নামায রাতের অন্ধকারে পড়া উত্তম ও (২৫) স্বরবে কেরাত পড়বে না।

ইমাম ত্বহতাবী (র.) আরো ২টি অতিরিক্ত যোগ করেছেন। যথা– আযান দিবে না, ও মসজিদে ই'তেকাফ করতে পারবে না। সুতরাং সর্বমোট ২৭ দিক দিয়ে পার্থক্য হল।

وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِنْ كَانَ إِمَامًا وَيُخْفِي الْقِرَاءَةَ فِيمَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ وَيُخْفِي الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْوِتْرُ ثَلٰثُ رَكَعَاتٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِّنَ الْوِتْرِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً مَعَهَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْنُتَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَنَتَ وَلَا يَقْنُتُ فِي صَلٰوةٍ غَيْرِهَا وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلٰوةِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا لَا يَجُوزُ غَيْرُهَا وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ قِرَاءَةَ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا لِلصَّلٰوةِ لَا يَقْرَأُ فِيهَا غَيْرَهَا وَأَدْنٰى مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلٰوةِ مَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْقُرْآنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَا يَجُوزُ أَقَلَّ مِنْ ثَلٰثِ آيَاتٍ قِصَارٍ أَوْ آيَةٍ طَوِيلَةٍ وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَمَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِي صَلٰوةِ غَيْرِهِ يَحْتَاجُ إِلٰى نِيَّتَيْنِ نِيَّةِ الصَّلٰوةِ وَنِيَّةِ الْمُتَابَعَةِ -

---

অনুবাদ।। ইমাম হলে ফজরের উভয় রাকাতে মাগরিব ও ইশার প্রথম দু'রাকাতে স্বরবে কিরাত পড়বে এবং প্রথম দু'রাকাতের পরে নীরবে কিরাত পড়বে। আর মুনফারিদ (তথা একাকী) হলে সে ইচ্ছাধীন। চাইলে জোরে পড়বে ও নিজেকে শুনাবে। আর চাইলে আস্তে ও পড়তে পারে। যুহর ও আসরে ইমাম হলে ও আস্তে কিরাত পড়বে। বিতির নামায তিন রাকাত এর মধ্যে সালামের দ্বারা প্রভেদ করবে না। তৃতীয় রাকাতে সারা বছর রুকুর পূর্বে দোয়ায়ে কুনূত পড়বে। বিতিরের প্রত্যেক রাকাতে সূরায়ে ফাতেহা ও এর সাথে অপর একটি সূরা পড়বে। কুনূত পড়ার ইচ্ছা করলে আগে তাকবীর বলে হাত উঠাবে। অতঃপর কুনূত পড়বে। বিতির ছাড়া অন্য কোন নামাযে কুনূত পড়বেনা। কোন নামাযে নির্দিষ্ট কোন সূরা পড়া (প্রমাণিত) নেই যে, উক্ত সূরা ছাড়া অন্য কোন সূরা পড়া জায়েয নেই। নামাযের জন্যে এমন কোন সূরা পাঠ নির্দিষ্ট করে নেয়া মাকরূহ যে, উক্ত নামাযে সে সূরা ছাড়া অন্যকোন সূরাই পড়বে না। ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে নামায সহীহ হওয়ার জন্যে কমপক্ষে এতটুকু কুরআন পড়তে হবে যাকে কুরআন বলে গণ্য করা যায়। সাহিবাইন (র.) বলেন কমপক্ষে ছোট তিন আয়াত বা বড় এক আয়াত ছাড়া নামায সহীহ হবে না। ইমামের পিছনে মুক্তাদী কিরাত পড়বেনা। যদি কেউ অন্যের নামাযে শরীক হতে চায় তাহলে সে দু'টি নিয়্যতের মুখাপেক্ষী হবে। নামাযের নিয়্যত ও ইমামের অনুকরণের নিয়ত (এক্তেদার) নিয়ত।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ يَقْنُتُ - দোয়ায়ে কুনূত পড়বে, قُنُوت - এর মূল অর্থ আকৃষ্ট হওয়া, ঝুকে পড়া, আনুগত্য করা, এ দোয়ার মধ্যে আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য বুঝায়। এ কারণে একে দোয়ায়ে কুনূত বলে। وِتْرٌ বেজোড়, مَا يَتَنَاوَلُهُ - যা শামিল করে, قِصَار - قَصِير - এর বহুঃ ছোট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ বিতির নামাযের রাকাত ও হুকুম ঃ قوله اَلْوِتْرُ ثَلٰثٌ الخ ঃ বিতির নামাযের ব্যাপারে অনেক ধরনের মত পার্থক্য রয়েছে, রাকাতের ব্যাপারে, হুকুমের ব্যাপারে, কুনূতের ব্যাপারে ইত্যাদি। বিতির নামায তিন রাকাত, হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক রাসূল (সা.) এর রাতের নামাযের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে– চার এবং তিন, ছয় এবং তিন, আট এবং তিন, দশ এবং তিন। সাতের কম ও তের এর অধিক পড়তেন না। এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিন রাকাত ছিল বিতির, বাকী রাকাত ছিল তাহাজ্জুদ।

হুকুম ঃ বিতির নামাযের ব্যাপারে আবু হানীফা (র.) হতে তিন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। (১) ফরয, এটা যুফর (র.) ও কতিপয় আলিমের অভিমত, (২) ওয়াজিব, এটা আবু হানীফা (র.) এর সর্বশেষ অভিমত, (৩) সুন্নতে মুয়াক্কাদা এটা সাহিবাইন (র.) এর অভিমত।

উপরোক্ত তিন প্রকার বর্ণনার মধ্যে এভাবে মিল দেওয়া যায় যে, আমলের দিক দিয়ে ফরয, এ'তেকাদ বা বিশ্বাসের দিক দিয়ে ওয়াজিব এবং প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে সুন্নত। অর্থাৎ সুন্নতে রাসূল দ্বারা প্রমাণিত।

কুনূত কখন পড়বে? ঃ قوله وَيَقْنُتُ فِى الثَّالِثَةِ হানাফী উলামায়ে কেরামের মতে তৃতীয় রাকাতে কুনূত পড়বে, ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে এ ব্যাপারে কোন উক্তি নেই। তবে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। রুকূর পরে পড়াই তাঁদের বিশুদ্ধতম মত। এ ব্যাপারে হানাফীগণের দলীল হল বুখারীর হাদীস– আসেম (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (সা.) কে কুনূত কখন পড়ব প্রশ্ন করলে উত্তরে বলেন– قَبْلَ الرُّكُوْعِ (রুকুর পূর্বে পড়বে)। আর রুকুর পরে কুনূত পড়ার যে, হাদীস রয়েছে তা দ্বারা কুনূতে নাযিলা উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, হানাফী মাযহাবে সারা বৎসর কুনূত পড়া ওয়াজিব। শাফেয়ী মায্হাবে কেবল রমযানের শেষার্ধে পড়া ওয়াজিব।

কিরাত খলফাল ইমাম ঃ قوله وَلَايَقْرَئُ الْمُؤْتَمُّ ঃ মুক্তাদীর জন্যে ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতেহা বা অন্যকোন সূরা না পড়া ওয়াজিব। চাই জাহরী নামায হোক বা সির্রী। বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং ইমাম মালেক, আওযায়ী, আহমদ ও ইমাম আবু হানীফা (র.) এর অভিমত এটাই। অপরদিকে হযরত ইমাম শাফেয়ী, আবু ছাওর, ছাওরী (র.)-এর মতে সকল নামাযেই মুক্তাদী সূরায়ে ফাতেহা পড়বে। তাদের দলীল– لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَئْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ যে সূরায়ে ফাতেহা পড়বে না তার নামায হবে না। হানাফীগণের দলীল وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ الخ ঃ আয়াত যে, যখন কোরান পড় তোমরা মনযোগ সহকারে শুন ও নীরব থাকো। এবং مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَائَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَائَةٌ যার ইমাম থাকে ইমামের কিরাতই তার কিরাত। সূরায়ে ফাতেহা পড়ার হাদীসের উত্তর এই যে, এটা ইমাম ও মুনফারিদের জন্য খাছ।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। নামাযের রোকন কয়টি ও কি কি? তাকবীরে তাহরীমা শর্ত না, রোকন?
২। নামাযে হাত বাঁধা ও আমীন বলার বিধান এবং এ ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ উল্লেখ কর।
৩। তাহ্মীদ তথা "রব্বানা লাকাল হাম্দ" ইমাম, মুক্তাদী ও মুনফারিদ কার জন্যে বলা সুন্নত?
৪। নামাযে رَفْعِ يَدَيْنِ এর ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ কি? বিস্তারিত লিখ।
৫। পুরুষ ও মহিলাদের নামাযে কি কি ক্ষেত্রে পার্থক্য? বর্ণনা কর।
৬। বিতির নামায কয় রাকাত ও এর হুকুম কি? মতান্তরসহ উল্লেখ কর।
৭। মুক্তাদির জন্যে কিরাত পড়ার বিধান কি? বিস্তারিত লিখ।

بَابُ الْجَمَاعَةِ

وَالْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَ أَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ تَسَاوَوْا فَأَقْرَأُهُمْ فَإِنْ تَسَاوَوْا فَأَوْرَعُهُمْ فَإِنْ تَسَاوَوْا فَأَسَنُّهُمْ وَيُكْرَهُ تَقْدِيمُ الْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِيِّ وَالْفَاسِقُ وَالْأَعْمٰى وَ وَلَدُ الزِّنَاءِ فَإِنْ تَقَدَّمُوا جَازَ وَيَنْبَغِى لِلْإِمَامِ أَنْ لَا يُطَوِّلَ بِهِمُ الصَّلٰوةَ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَآءِ أَنْ يُّصَلِّيْنَ وَحْدَهُنَّ بِجَمَاعَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ وَقَفَتِ الْإِمَامَةُ وَسْطَهُنَّ كَالْعُرَاةِ وَمَنْ صَلّٰى مَعَ وَاحِدٍ أَقَامَهُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَإِنْ كَانَا اِثْنَيْنِ تَقَدَّمَهُمَا وَلَا يَجُوْزُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَّقْتَدُوْا بِامْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ -

---

জামাআত ও ইমামতী প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ ১. জামাআতে নামায পড়া সুন্নতে মুয়াককাদা, ২. ইমামতীর জন্যে সর্বাধিক যোগ্য হল সুন্নতের ব্যাপারে সর্বাধিক আলিম ব্যক্তি। এক্ষেত্রে সবাই সমান হলে সর্বাধিক বিশুদ্ধ তেলাওয়াত কারী। এতে সমান হলে সর্বাধিক পরহেযগার ব্যক্তি, এতে ও সবাই সমপর্যায়ের হলে সর্বাধিক বয়স্ক ব্যক্তি, ৩. ক্রীতদাস, বেদুইন, ফাসেক, অন্ধ ও জারজ ব্যক্তির ইমামতী মাকরূহ। মুসল্লীগণ এমন কাউকে ইমাম বানালে জায়েয আছে। ৪. ইমামের জন্যে উচীত হল নামায দীর্ঘ না করা, ৫. শুধু মহিলাদের জন্যে জামাতবদ্ধ হয়ে নামায পড়া মাকরূহ। তথাপি জামাতে নামায পড়তে চাইলে ইমাম সাহেবা উলঙ্গদের মাসআলার ন্যায় তাদের মাঝে দাঁড়াবে। ৬. একজন মুক্তাদী নিয়ে নামায পড়লে তাকে ডান পার্শ্বে দাঁড় করাবে, মুক্তাদী দু'জন হলে তাদের সামনে দাঁড়াবে, ৭. পুরুষের জন্যে মহিলা ও নাবালেগের পিছনে এক্তেদা করা নাজায়েয।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ أَوْلَى النَّاسِ – সর্বাধিক যোগ্য, উত্তম, بِالسُّنَّةِ – নিয়ম পদ্ধতি তথা মাসায়েলের ব্যাপারে, تَسَاوَوْا – সমান হয়, أَوْرَعُهُمْ – সর্বাধিক পরহেযগার, أَسَنُّهُمْ – সর্বাধিক বয়স্ক, أَعْرَابِىُّ – বেদুঈন, গ্রাম্য, মূর্খ, فَاسِق – কবীরা গোনাহকারী বা ছগীরা গোনাহে অভ্যাস্থ, كَالْعُرَاةِ – উলঙ্গ-বস্ত্রহীনদের ন্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ জামাআতের হুকুম ঃ قوله اَلْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ঃ ইমাম আহমদ (র.) এর মতে জামাআতে নামায পড়া ফরযে আইন। ইমাম শাফেয়ী ও ত্বহাবী (র.) এর মতে ফরযে কেফায়া, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক (র.) এর মতে সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

قوله أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ الخ ঃ এখানে সুন্নত দ্বারা নামাযের মাসায়েল ও সুন্নত মুস্তাহাব ইত্যাদি উদ্দেশ্য।

মহিলাদের জামাআত ঃ قوله وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ ঃ শুধু মহিলাদের জামাআত মাকরূহে তাহরীমী, চাই ফরয নামায হোক বা নফল বা তারাবীহ। বর্তমান ফেতনা ফাসাদের আধিক্যতার দরুন যে কোন নামাযে মসজিদে জামাআতের সহিত নামায পড়া অধিকাংশ আলিমের মতে মাকরূহ। তবে বাড়ীতে মুহররম পুরুষের পিছনে এক্তেদা করা বিশেষত, খতমে তারাবীহতে শরীক হওয়াকে কোন কোন আলিম মাকরূহ বিহীনভাবে জায়েয বলেন।

উল্লেখ্য যে, হাদীসে মহিলাদের জামাআতে হাযির হওয়ার যে প্রমাণ রয়েছে তা ফেতনার কারণে সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে সর্বসম্মতিক্রমে নিষেধ হয়েছে। অবশ্য হজ্বের সময়ে ওযরবশতঃ অনুমতি রয়েছে।

وَيَصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخُنْثٰى ثُمَّ النِّسَاءُ فَإِنْ قَامَتْ اِمْرَأَةٌ اِلٰى جَنْبِ رَجُلٍ وَهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِىْ صَلٰوةٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَتْ صَلٰوتُهُ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ حُضُوْرُ الْجَمَاعَةِ وَلَابَأْسَ بِأَنْ تَخْرُجَ الْعَجُوْزُ فِى الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَجُوْزُ خُرُوْجُ الْعَجُوْزِ فِىْ سَائِرِ الصَّلٰوةِ وَلَايُصَلِّى الطَّاهِرُ خَلْفَ مَنْ بِهٖ سَلَسُ الْبَوْلِ وَلَا الطَّاهِرَاتُ خَلْفَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَلَا الْقَارِئُ خَلْفَ الْاُمِّىِّ وَلَا الْمُكْتَسِىْ خَلْفَ الْعُرْيَانِ -

কাতার ও এক্তেদা প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ ১. জামাআতে নামাযের জন্যে প্রথমে পুরুষে কাতার করবে। অতঃপর নাবালেগ ছেলেরা, অতঃপর হিজড়ারা, অতঃপর মহিলারা, ২. যদি কোন পুরুষের পাশে মহিলা দাঁড়ায় আর উভয়ে একই নামাযে শরীক থাকে তাহলে পুরুষের নামায নষ্ট হয়ে যাবে, ৩. মহিলাদের জন্যে জামাআতে হাজির হওয়া মাকরূহ। আবু হানীফা (র.)-এর মতে ফজর, মাগরিব ও ইশায় বৃদ্ধা মহিলার জন্য হাজির হওয়া দোষণীয় নয়। আর সাহিবাইনের মতে বৃদ্ধা মহিলার জন্যে সকল নামাযে হাজির হওয়া জায়েয। ৪. বহুমূত্র রোগীর পিছনে পাক ব্যক্তি নামায পড়বে না। তদরূপ মুস্তাহাযা মহিলাদের পিছনে ঋতুমুক্ত (পাক) মহিলা, কোরান পাঠে অক্ষম ব্যক্তি কোরান পাঠকারীর পিছনে, কাপড় পরিহিত ব্যক্তি উলঙ্গ ব্যক্তির পিছনে নামায পড়বে না।

শব্দ বিশ্লেষণ ঃ صِبْيَان - صَبِىٌّ – এর বহুঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, جُنُبٌ – পার্শ্বে, حُضُوْرٌ – উপস্থিত হওয়া, عَجُوْزٌ – বৃদ্ধা, سَائِر – সমস্ত, مُكْتَسِىْ – কাপড় পরিহিত, عُرْيَان – উলঙ্গ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ কাতারের নিয়ম ঃ قوله وَيَصُفُّ الرِّجَالُ الخ কাতার বাঁধার ব্যাপারে রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন– তোমাদের মধ্যে ইলম ও জ্ঞানের অধিকারীগণ আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী থাকবে। অতঃপর তারা যারা তাঁদের সাথে সংশ্রব রাখে। তাছাড়া নবীজী (সা.) নিজে ও কাতারবদ্ধ করার সময় আগে পুরুষ, অতঃপর বালক, অতঃপর মহিলাদিগকে সবার পিছনে দাঁড় করাতেন।

পুরুষ ও মহিলার একত্রে নামায প্রসঙ্গ ঃ قوله فَإِنْ قَامَتْ الخ মহিলারা পুরুষের পিছনে এক্তেদা করতে চাইলে সবার পিছনে দাঁড়াবে, যদি একজন মহিলা এবং মুহাররমা বা নিজ স্ত্রী ও হয় তথাপি পিছনের কাতারে দাঁড়াবে। উল্লেখ্য যে, যদি উভয়ে পাশাপাশি দাঁড়ায় তাহলে ১০টি শর্তে পুরুষের নামায বিনষ্ট হয়ে যাবে। যথা– (১) মহিলা বালেগা বা কামোদ্দীপক হলে, (২) উভয়ে একই নামাযে শরীক থাকলে, (৩) উভয়ের মাঝে এক অঙ্গুল পরিমাণ মোটা আবরণ না থাকলে, (৪) মহিলার নামায আদায়যোগ্য হলে (অর্থাৎ হায়েয, নেফাস মুক্ত হলে।) (৫) জানাযার নামায না হয়ে সাধারণ নামায হলে, (৬) উভয়ের পা এক বরাবর হলে, (৭) পূর্ণ এক রোকন পরিমাণ এক সঙ্গে থাকলে, (৮) পুরুষে উক্ত মহিলার ইমামতীর নিয়ত করলে, অন্যথায় মহিলার নামায বিনষ্ট হবে। (৯) মহিলা সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হলে, (১০) স্থান এক হলে, এ দশটি বিষয় পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে পুরুষের নামায নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু মহিলার নামায আদায় হয়ে যাবে।

وَيَجُوْزُ اَنْ يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِيْنَ وَالْمَاسِحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْغَاسِلِيْنَ وَيُصَلِّى الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ وَلَايُصَلِّى الَّذِى يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمُؤْمِى وَلَايُصَلِّى الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ وَلَا مَنْ يُّصَلِّى فَرْضًا خَلْفَ مَنْ يُّصَلِّى فَرْضًا اٰخَرَ وَيُصَلِّى الْمُتَنَفِّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ وَمَنِ اقْتَدٰى بِاِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ اَنَّهُ عَلٰى غَيْرِ طَهَارَةٍ اَعَادَ الصَّلٰوةَ وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّى اَنْ يَّعْبَثَ بِثَوْبِهِ اَوْ بِجَسَدِهِ وَلَا يُقَلِّبُ الْحَصٰى اِلَّا اَنْ لَّايُمْكِنُهُ السُّجُوْدُ عَلَيْهِ فَيُسَوِّيَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يُفَرْقِعُ اَصَابِعَهُ وَلَايُشَبِّكُ وَلَايَتَخَصَّرُ وَلَايَسْدُلُ ثَوْبَهُ وَلَايَكُفُّهُ وَلَا يَعْقِصُ شَعْرَهُ وَلَا يَلْتَفِتُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا –

<u>অনুবাদ</u> ॥ ৫. তায়াম্মুমকারীর জন্যে উযূকারীদের ইমামতী এবং মোজা মাস্‌হকারীর জন্যে পা ধৌতকারীদের ইমামতী করা জায়েয, ৬. দাঁড়ান ব্যক্তি বসা ব্যক্তির পিছনে নামায পড়তে পারে, ৭. রুকু সাজদাকারী ব্যক্তি ইশারায় নামায আদায়কারীর পিছনে নামায পড়বে না এবং ফরয নামায আদায়কারী নফল নামায আদায়কারীর পিছনে নামায পড়বে না। তদরূপ এক ফরয আদায়কারী অন্য ফরয নামায আদায়কারীর পিছনে নামায পড়বে না। নফল নাদায়কারী ফরয আদায়কারীর পিছনে নামায পড়তে পারে, ৮. কোন ব্যক্তি ইমামের পিছনে এক্তেদা করার পর যদি জানতে পারে যে, ইমাম অপবিত্র ছিল তাহলে সে নামায দোহরায়ে পড়বে।

<u>নামাযের মাকরূহ সমূহ</u> ঃ ১. নামাযী ব্যক্তির জন্যে মাকরূহ হল– শরীর বা কাপড় নিয়ে খেলা করা, ২. পাথর কণা সরানো, তবে তার ওপর সাজদা করা অসম্ভব হলে একবার সরাতে পারে, ৩. আঙ্গুল ফুটাবে না, ৪. আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করাবেনা, ৫. কোমরে হাত রাখবেনা, ৬. গলায় (না পেচিয়ে) কাপড় ঝুলিয়ে রাখবে না এবং কাপড় গুছাবে না, ৭. (পুরুষে) চুল বেঁধে রাখবে না, ৮. ডানে বায়ে তাকাবেনা।

<u>শাব্দিক বিশ্লেষণ</u> ঃ اَنْ يَؤُمَّ – ইমাম হওয়া, ইমামতী করা, مُؤمِى – ইশারাকারী, اَن يَّعْبَثَ – খেলা করা, অহেতু কাজ করা, لَايُقَلِّبُ – সরাবেনা, حَصٰى – কণা, لَايُفَرْقِعُ – ফুটাবেনা, لَايُشَبِّكُ – আঙ্গুলের ফাঁকে আঙ্গুল আঙ্গুল ঢুকাবে না, لَايَتَخَصَّرُ – কোমরে হাত রাখবে না।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা</u> ॥ قوله وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّى ঃ মাকরূহ অর্থ অপছন্দনীয়। উল্লেখ্য যে, ফেকাহ গ্রন্থে সাধারণভাবে মাকরূহ উল্লেখ থাকলে তাদ্বারা মাকরূহে তাহরীমী উদ্দেশ্য নেয়া হয়, মাকরূহ কাজের দ্বারা আমলের সওয়াবের ঘাটতি হয়।

قوله اَنْ يَّعْبَثَ الخ ـ عَبَثْ ঃ অর্থ অপ্রয়োজনীয় বা অহেতু কাজ, যে কাজে দুনিয়া বা আখিরাতে কোন উপকার সাধিত হয় না তাকে عَبَثْ বলে। যে সব খেলা-ধুলায় আনন্দ উপভোগ হয় বটে কিন্তু তা ফরয থেকে উদাসীন রাখে তাকে لَهْو বলে। নামাযী ব্যক্তি নামাযের মধ্যে তার মনিবের সম্মুখে উপস্থিত থাকে। এ জন্যে যথাসম্ভব ধীরস্থিরতা ও একাগ্রতা অবলম্বন করা জরুরী এবং এমন সব আচরণ ও অবস্থা পরিত্যাগ করা জরুরী যা ভদ্রতা ও শালীনতার পরিপন্থী। বস্তুতঃ গ্রন্থকার মাকরূহ প্রসঙ্গে যে সব বিষয় আলোকপাত করেছেন, সবগুলোর মধ্যেই এ মৌলিক বিষয়টি লক্ষ রয়েছে।

قوله اَن يَّسْدُلَ الخ ঃ গলায় না পেঁচিয়ে ঝুলিয়ে রাখা বা কারো মতে নিয়ম বহির্ভূত উপায়ে কাপড় পরিধান করাকে سَدْل বলে।

وَلَا يُقْعِيْ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ وَلَا بِيَدِهِ وَلَا يَتَرَبَّعُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ فَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ اِنْصَرَفَ وَتَوَضَّأَ وَبَنٰى عَلٰى صَلٰوتِهٖ اِنْ لَّمْ يَكُنْ اِمَامًا فَاِنْ كَانَ اِمَامًا اِسْتَخْلَفَ وَتَوَضَّأَ وَبَنٰى عَلٰى صَلٰوتِهٖ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ وَالْاِسْتِيْنَافُ اَفْضَلُ وَاِنْ نَامَ فَاحْتَلَمَ اَوْ جُنَّ اَوْ اُغْمِىَ عَلَيْهِ اَوْ قَهْقَهَ اِسْتَأْنَفَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلٰوةَ وَاِنْ تَكَلَّمَ فِىْ صَلٰوتِهٖ سَاهِيًا اَوْ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلٰوتُهٗ وَاِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ وَاِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِىْ هٰذِهِ الْحَالَةِ اَوْ تَكَلَّمَ اَوْ عَمِلَ عَمَلًا يُنَافِى الصَّلٰوةَ تَمَّتْ صَلٰوتُهٗ –

অনুবাদ ॥ ৯. কুকুরের বসার ন্যায় বসবেনা, ১০. মুখ বা হাত দ্বারা সালামের উত্তর দিবে না, ১১ ওযর ব্যতিত আসন পেতে (চার যানু হয়ে) বসবেনা, ১২. পানাহার করবেনা।

নামায ভঙ্গের কতিপয় কারণ ও সমাধান ঃ ১. নামাযরত ব্যক্তির যদি উযূ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ইমাম না হলে যেয়ে উযূ করে আসবে এবং উক্ত নামাযের ওপর ভিত্তি করে বাকী নামায আদায় করবে। আর ইমাম হলে অন্য কাউকে প্রতিনিধি (ইমাম) বানিয়ে উযূ করে আসবে এবং উক্ত নামাযের উপর ভিত্তি করে বাকী নামায পড়বে যতক্ষণ না সে কথাবার্তা বলবে। তবে নুতনভাবে নামায পড়া শ্রেয়। ২. যদি নামাযের মধ্যে ঘুমানের কারণে কারো স্বপ্নদোষ হয়, বা পাগল হয়ে যায়, বা বেহুস হয়ে যায় অথবা খিলখিল করে হাসে তাহলে উযূ ও নামায উভয় দোহরাতে হবে, ৩. যদি কেউ নামাযে ভুল বশতঃ বা ইচ্ছাকৃত কথা বলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে, ৪. যদি কারো তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর উযূ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে উযূ করে এসে সালাম ফিরাবে, ৫. যদি কেউ এ অবস্থায় স্বেচ্ছায় উযূ নষ্ট করে বা কথা বলে, অথবা নামাযের পরিপন্থী কোন কাজ করে তাহলে তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ لَا يُقْعِىْ – ইক্বআ অর্থ কুকুরের ন্যায় সামনের পা সোজা রেখে নিতম্বের উপর ভর করে বসা, جُنَّ – পাগল হয়ে যায়, اُغْمِىَ عَلَيْهِ – বেহুস হয়ে যায়, قَهْقَهَ – অট্ট হাসী দেয়া, سَاهِيًا – ভুলবশত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله لَا يُقْعِىْ كَاِقْعَاءِ الْكَلْبِ ঃ اِقْعَاء অর্থ কুকুরের ন্যায় বসা, অর্থাৎ দু'হাত মাটিতে এবং উভয় পা খাড়া করে বুকের সাথে মিলিয়ে উভয় নিতম্বের উপর বসা।

নামাযের বেনা প্রসঙ্গ ঃ قوله فَاِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ الخ ঃ নামাযে উযূ নষ্ট হয়ে গেলে নীরবে উযূ করে এসে বাকী নামায আদায় করে নেয়াকে বেনা করা বলা হয়। সে ইমাম হলে অন্যকে ইশারায় হাত ধরে সামনে অগ্রসর করে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত বানাবে। হানাফী ইমামগণ এ ব্যাপারে তবরানী ও দারকুৎনীতে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। অপর দিকে ইমাম শাফেয়ী বলেন– এক্ষেত্রে অযূ করে নুতনভাবে নামায আদায় করতে হবে, কেননা উযূ নষ্ট হওয়া, হাঁটা চলা করা, উযূ করা এ সবই নামাযের প্রতিবন্ধক। সুতরাং স্বেচ্ছায় উযূ নষ্ট করলে যেরূপ বেনা করা জায়েয হয় না, তদরূপ এ ক্ষেত্রে ও।

বেনা দুরস্ত হওয়ার শর্তাবলী ঃ উল্লেখ্য যে, বেনা করা দুরস্ত হওয়ার জন্য ১৩ টি শর্ত। যথা– (১) উযূ নষ্ট না করা, (২) গোসল ওয়াজিবকারী নাপাকী না হওয়া, (৩) নামাযীর শরীর হতে বর্হিগমনকারী হওয়া, (৪) অস্বাভাবিক না হওয়া, (৫) নাপাক অবস্থায় পূর্ণ এক রোকন আদায় না হওয়া, (৬) আসা-যাওয়া কালে কোন রোকন আদায় না করা, (৭) নামাযের পরিপন্থী অন্যকোন কাজ না করা, (৮) নিকটে পানি থাকতে দূরে না যাওয়া, (৯) বিনা ওজরে বিলম্ব না করা, (১০) নতুন কোন নাপাকী প্রকাশ না পাওয়া, (১১) صَاحِبِ تَرْتِيْبْ তথা যার উপর ধারাবাহিকভাবে নামায আদায় করা ওয়াজিব এমন নামাযের কথা স্মরণ না থাকা, (১২) মুক্তাদীর জন্যে নিজ জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও নামায আদায় না করা, তবে মুনফারিদ হলে উযূর স্থানের সন্নিকটই নামায আদায় করতে পারে, (১৩) ইমাম হলে অনুপযুক্ত কাউকে স্থলাভিষিক্ত (খলীফা) না বানান।

وَاِنْ رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ فِىْ صَلٰوتِهٖ بَطَلَتْ صَلٰوتُهٗ وَاِنْ رَاٰهُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ اَوْ كَانَ مَاسِحًا فَانْقَضَتْ مُدَّةُ مَسْحِهٖ اَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ بِعَمَلٍ قَلِيْلٍ اَوْ كَانَ اُمِّيًّا فَتَعَلَّمَ سُوْرَةً اَوْ عُرْيَانًا فَوَجَدَ ثَوْبًا اَوْ مُوْمِيًا فَقَدِرَ عَلَى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ اَوْ تَذَكَّرَ اَنَّ عَلَيْهِ صَلٰوةً قَبْلَ هٰذِهٖ اَوْ اَحْدَثَ الْاِمَامُ الْقَارِىْ فَاسْتَخْلَفَ اُمِّيًّا اَوْطَلَعَتِ الشَّمْسُ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ اَوْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فِى الْجُمُعَةِ اَوْ كَانَ مَاسِحًا عَلَى الْجَبِيْرَةِ فَسَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ اَوْ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً فَبَرِأَتْ بَطَلَتْ صَلٰوتُهُمْ فِىْ قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى تَمَّتْ صَلٰوتُهُمْ فِىْ هٰذِهِ الْمَسَائِلِ-

---

অনুবাদ ॥ তায়াম্মুমকারী নামাযের মধ্যে পানি দেখলে তার নামায বাতিল হয়ে যবে।

দ্বাদশ মাসায়েলঃ আর যদি তাশাহহুদ পরিমান বসার পরে দেখে বা সে মোজা মাস্হকারী হয়, আর তার মোজা মাস্হের সময় শেষ হয়ে যায়, অথবা মৃদুভাবে উভয় মোজা খুলে ফেলে বা কোন উম্মী ব্যক্তি সূরা শিখে ফেলে, বা কোন বিবস্ত্র ব্যক্তি বস্ত্র লাভ করে, বা ইশারায় নামায আদায়কারী রুকূ-সাজদায় সক্ষম হয়, অথবা যদি স্মরণ হয় যে তার পূর্বের নামায কাযা রয়েছে, বা ইমামের উযূ নষ্ট হওয়ার পর যদি উম্মীকে স্থলাভিষিক্ত বানায়, অথবা ফজরের নামায আদায় কালে সুর্যোদয় হয়ে যায়, জুমআর নামায আদায় করতে করতে আসরের সময় এসে যায়, অথবা ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ গ্রহণকারীর ক্ষত শুকিয়ে ব্যান্ডেজ পড়ে যায়, অথবা মুস্তাহাযা মহিলা ইস্তিহাযা মুক্ত হয় এসব ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে তাদের নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর সাহিবাইন (র.) বলেন– তাদের নামায পূর্ণ হয়ে যাবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ فَانْقَضَتْ – পূর্ণ হয়ে গেল, مُدَّةٌ – মেয়াদ, خَلَعَ – খুলে ফেলল, اُمِّىٌّ – নিরক্ষর, এ স্থলে-সূরা-কিরাত অজ্ঞ, عُرْيَان – বিবস্ত্র, جَبِيْرَة – পট্টি, ব্যান্ডেজ, بُرْء – সুস্থতা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله بَطَلَتْ صَلٰوٰتُهُمْ الخ ঃ গ্রন্থকার আল্লামা কুদূরী (র.) উপরে وَاِنْ رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الخ হতে প্রসিদ্ধ দ্বাদশ মাসআলার বর্ণনা করতঃ একত্রে সব গুলোর বিধান উল্লেখ করেছেন যে, আবু হানীফা (র.) এর মতে এ সকল ক্ষেত্রে নামায বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং নুতনভাবে নামায আদায় করতে হবে। কেননা এসব ক্ষেত্রে নামাযের সর্বশেষ ফরয তথা মুসল্লীর ইচ্ছায় নামাযের পরিপন্থী কোন কাজের মাধ্যমে নামায শেষ করার ফরযটি বাকী থেকে যায়। আর ফরয ছুটে গেলে নামায বাতিল হয়ে যায়। অপরদিকে সাহিবাইন (র.) এর মতে এটা ফরয নয়। সুতরাং শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের পরে এর কোন একটি প্রকাশ পেলে নামাযের ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে সালামের দ্বারা নামায শেষ করার ওয়াজিব তরক হওয়ায় পুনরায় নামায পড়া ওয়াজিব হবে। কোন কোন আলিম বলেন বস্তুত স্বেচ্ছায় নামায নষ্ট করা (خُرُوْج بِصُنْعِه) ইমাম সাহেবের নিকট ও ফরয নয়। তবে তাশাহহুদের আগে পরে নামাযের পরিপন্থী কিছু পাওয়া যাওয়ার প্রভেদ তাঁর নিকট নেই। বিধায় উভয় অবস্থায়ই নামায নষ্ট হয়ে যায়। আর সাহিবাইনের মতে পরে পাওয়ার দ্বারা নামায ফাসেদ হয় না।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। পুরুষ ও মহিলাদের জামাতে নামায আদায়ের হুকুম কি? জামাতের জন্যে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি কে?
২। নামাযের জামাতে কাতারের পদ্ধতি কি হবে বর্ণনা কর।
৩। পুরুষ ও মহিলা একত্রে নামায পড়তে চাইলে কিভাবে দাঁড়াতে হবে?
৪। নারী-পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়ালে কি কি শর্তে পুরুষের নামায নষ্ট হয়ে যায়? বর্ণনা কর।

بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةٌ قَضَاهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَقَدَّمَهَا عَلٰى صَلٰوةِ الْوَقْتِ إِلَّا أَنْ يَّخَافَ فَوْتَ صَلٰوةِ الْوَقْتِ فَيُقَدِّمُ صَلٰوةَ الْوَقْتِ عَلَى الْفَائِتَةِ ثُمَّ يَقْضِيْهَا وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوَاتٌ رَتَّبَهَا فِي الْقَضَاءِ كَمَا وَجَبَتْ فِي الْأَصْلِ إِلَّا أَنْ تَزِيْدَ الْفَوَائِتُ عَلٰى خَمْسِ صَلٰوةٍ فَيَسْقُطُ التَّرْتِيْبُ فِيْهَا -

---

কাযা নামাযের বিবরণ

অনুবাদ ॥ ১. কারো নামায কাযা হয়ে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র তা আদায় করে নিবে। (পরবর্তী) ওয়াক্তিয়া নামাযের আগে পড়ে নিবে। তবে যদি ওয়াক্তিয়া নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা করে তাহলে ওয়াক্তিয়া নামায আগে পড়ে নিবে। অতঃপর কাযা নামায পড়বে। ২. যার কয়েক ওয়াক্তের নামায ছুটে যায়, যেভাবে নামায ফরয হয়েছিল ধারাবাহিকভাবে তার কাযা আদায় করবে। তবে যদি কাযা নামায পাঁচ ওয়াক্তের অধিক হয়ে যায় তাহলে তা আদায়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার বিধান রহিত হয়ে যায়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ قَضَاء – পূর্ণ করা, পালন করা, فَوَائِت – فَائِتَةٌ এর বহুঃ ছুটে যাওয়া, কাযা অর্থে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ الخ ঃ যদি পাঁচ ওয়াক্তের অধিক নামায কাযা হয় তাহলে আগেরটা আগে ও পরেরটা পরে কাযা পড়তে হবে। আর এর অধিক হলে যে কোনটা ইচ্ছা আগে পরে আদায় করতে পারে। ইমাম আহমদ, মালেক, ইব্রাহীম নখয়ী (র.) প্রমুখের ও একই অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে ক্রমধারা (তারতীব) মুতাবেক পড়া মুস্তাহাব। উল্লেখ্য যে, এখানে নামাযের মাকরূহ ওয়াক্ত দ্বারা নিষিদ্ধ সময় উদ্দেশ্য, যা হারাম ও মাকরূহ উভয়কে শামিল করে।

উমরী কাযা প্রসঙ্গ ঃ কারো কয়েক মাস বা কয়েক বৎসরের নামায (রোযা) কাযা হয়ে থাকলে তাকে উমরী কাযা বলে। এরূপ নামাযের আদায় করা ওয়াজিব। সাথে সাথে স্বেচ্ছায় উদাসীনতায় এরূপ করে থাকলে তার জন্যে তাওবা এস্তেগফার করা জরুরী। উমরী কাযার সহজ পদ্ধতি এই যে, যত মাস বা বৎসর কাযা হয়েছে তার প্রথম বৎসরের প্রথম মাস অনুপাতে প্রতি ওয়াক্তের নামাযের সাথে ওয়াক্তের ফরযের কাযা পড়ে নিবে। এভাবে একেক মাস করে সামনে বাড়তে থাকবে। সম্ভব হলে আরো বেশী ওয়াক্তের পড়ে দ্রুত কাযা আদায় শেষ করা শ্রেয়। উল্লেখ্য যে বিতির নামাযের এ কাযা পড়তে হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। ফায়েতা বা কাযা নামায আদায়ের নিয়ম কি? বিস্তারিত লিখ।

২। উমরী কাযা কাকে বলে? ও তার সহজ নিয়ম কি? লিখ।

بَابُ الْاَوْقَاتِ الَّتِىْ تُكْرَهُ فِيْهَا الصَّلٰوةُ

لَايَجُوْزُ الصَّلٰوةُ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوْبِهَا اِلَّا عَصْرَ يَوْمِهٖ وَلَا عِنْدَ قِيَامِهَا فِى الظَّهِيْرَةِ وَلَا يُصَلِّىْ عَلٰى جَنَازَةٍ وَلَا يَسْجُدُ لِلتِّلَاوَةِ وَيُكْرَهُ اَنْ يَّتَنَفَّلَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَابَأْسَ بِاَنْ يُّصَلِّىَ فِىْ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ الْفَوَائِتَ وَيُكْرَهُ اَنْ يَّتَنَفَّلَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ بِاَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ الْمَغْرِبِ -

নামাযের মাকরূহ ওয়াক্ত প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ ১. (ক) সূর্যোদয়কালে নামায পড়া নাজায়েয, (খ) সূর্যাস্তকালে উক্ত দিনের আসরের নামায ছাড়া অন্যকোন নামায পড়া নাজায়েয এবং (গ) ঠিক দ্বি প্রহরে ও কোন নামায পড়া দুরস্ত নয়, এ সকল সময়ে জানাযার নামায পড়া এবং তেলাওয়াতের সাজদা করা ও দুরস্ত নয়। ২. (ক) ফজরের নামাযের পরে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং (খ) আসরের নামাযের পরে সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত নফল নামায পড়া মাকরূহ। ৩. এ দু' সময়ে কাযা নামায পড়া, তেলাওয়াতের সাজদা করা ও জানাযার নামায পড়া দোষণীয় নয়। তবে তওয়াফের পরবর্তী দু' রাকাত নামায পড়বে না। ৪. সুবহে সাদিকের পর ফজরের দু'রাকাত সুন্নত ছাড়া অন্যকোন নামায পড়া মাকরূহ, মাগরিবের পূর্বে ও কোন নামায পড়বে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ ظَهِيْرَة – দুপুর, بَأْسٌ - ক্ষতি, দোষ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَلَايَجُوْز الخ ঃ এ তিন ওয়াক্তে কাফেররা সূর্যের পূজা করে বিধায় রাসূল (সা.) নামায পড়তে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

قوله مِنْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ الخ ঃ এ দু সময়ে কোন নফল পড়া নবীজীর (সা.) থেকে প্রমাণিত নেই অথচ তিনি নামাযের অতিশয় আগ্রহী ছিলেন। অতএব প্রতীয়মান হয় যে, এ সময়ে নামায পড়া পছন্দনীয় নয় বা মাকরূহ।

اَلتَّمْرِيْنُ - (অনুশীলনী)

১। কোন্ কোন্ সময় নামায পড়া নাজায়েয ও কোন্ কোন্ সময় মাকরূহ? বর্ণনা কর।

بَابُ النَّوَافِلِ

اَلسُّنَّةُ فِى الصَّلٰوةِ اَن يُّصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ وَاَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَاَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ وَاِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَاَرْبَعًا قَبْلَ الْعِشَاءِ وَاَرْبَعًا بَعْدَهَا وَاِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَنَوَافِلُ النَّهَارِ اِنْ شَاءَ صَلّٰى بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ وَاِنْ شَاءَ اَرْبَعًا وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلٰى ذٰلِكَ فَاَمَّا نَوَافِلُ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ صَلّٰى ثَمَانِىَ رَكْعَاتٍ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ جَازَ وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلٰى ذٰلِكَ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَايَزِيْدُ بِاللَّيْلِ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ - وَالْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِى الْاُخْرَيَيْنِ اِنْ شَاءَ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَاِنْ شَاءَ سَكَتَ وَاِنْ شَاءَ سَبَّحَ وَالْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ فِى جَمِيْعِ رَكْعَاتِ النَّفْلِ وَجَمِيْعِ الْوِتْرِ وَمَنْ دَخَلَ فِىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ ثُمَّ اَفْسَدَهَا قَضَاهَا فَاِنْ صَلّٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ وَقَعَدَ فِى الْاُوْلَيَيْنِ ثُمَّ اَفْسَدَ الْاُخْرَيَيْنِ قَضٰى رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّى النَّافِلَةَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ وَاِنْ افْتَتَحَهَا قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ جَازَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَايَجُوْزُ اِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَمَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ يَتَنَفَّلُ عَلٰى دَابَّتِهٖ اِلٰى اَىِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ يُؤْمِىْ اِيْمَاءً -

সুন্নত-নফল প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ ১. নামাযের ক্ষেত্রে সুন্নত হল সুবহে সাদিকের পরে দু'রাকাত, যুহরের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দু'রাকাত, আসরের পূর্বে চার রাকাত ইচ্ছে করলে দু'রাকাত ও পড়তে পারে। মাগরিবের পরে দু'রাকাত। এবং ইশার পূর্বে চার রাকাত ও পরে চার রাকাত হচ্ছে করলে দু'রাকাত ও পড়তে পারে। ২. দিনের নফল নামায ইচ্ছে করলে দু'রাকাত এক সালামে পড়তে পারে অথবা চার রাকাত ও পড়তে পারে, এর অতিরিক্ত (এক সালামে) পড়া মাকরূহ। আর রাতের নফল নামায সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, এক সালামে আট রাকাত পড়লেও জায়েয। এর অতিরিক্ত মাকরূহ। সাহিবাইন (র.) বলেন- রাতে এক সালামে দু'রাকাতের অধিক পড়বেনা। ৩. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাতে কিরাত পড়া ওয়াজিব। শেষের দু'রাকাতের ব্যাপারে নামাযী ইচ্ছাধীন। চাইলে সূরায়ে ফাতেহা পড়তে পারে। চাইলে নীরব ও থাকতে পারে। আবার চাইলে তাসবীহ ও আদায় করতে পারে। ৪. নফল (ও সুন্নত) নামাযের প্রত্যেক রাকাতে এবং বিতিরের সকল রাকাতে কিরাত পড়া ওয়াজিব। ৫. কেউ নফল নামায শুরু করে

নষ্ট করে ফেললে সে উক্ত নামাযের কাযা আদায় করবে। যদি কেউ চার রাকাত নামায পড়ে। এর প্রথম দু'রাকাতের পরে বসে, অতঃপর শেষ দু'রাকাতের মধ্যে নষ্ট করে ফেলে তাহলে দু'রাকাত কাযা করবে। আবু ইউসূফ (র.) এর মতে চার রাকাত কাযা পড়বে। ৬. দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বে নফল নামায বসে পড়তে পারে। কেউ দাঁড়িয়ে নফল শুরু করবার পর (কিছু অংশ) বসে আদায় করলে আবু হানীফা (র.) এর মতে তা জায়েয। আর সাহিবাইন (র.) বলেন ওযর ছাড়া জায়েয নেই। কেউ শহরের বাইরে (সফররত) থাকলে নিজ বাহন যেদিকে যায় উক্ত দিকে ফিরে ইশারার মাধ্যমে নফল পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله اَلنَّوَافِلُ الخ ঃ نَافِلَةٌ এর বহুঃ اَلنَّوَافِلُ। অর্থ অতিরিক্ত, গনীমতের মাল মূল মাল হতে অতিরিক্ত হওয়ায় তাকে نَافِلَة বলে। ফরয ওয়াজিবের অতিরিক্ত সকল নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদা, গায়রে মুয়াক্কাদা বা নফল সবই এর অন্তর্ভূক্ত।

قوله بَعْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ الخ ঃ সার্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত নামায হল ফজরের দু'রাকাত সুন্নত। কারো ফজরের সুন্নত ছুটে গেলে শায়খাইন (র.) এর মতে কাযা আদায় করবেনা। কেননা ফরযের সাথে ছাড়া নফলের কাযা আদায় হয়না, তবে করলে ক্ষতি নেই। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সূর্য হেলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কাযা পড়তে পারে।

قوله اَرْبَعًا بَعْدَهٗ ঃ তিরমিযী শরীফে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন যে, ব্যক্তি যুহুরের আগে ৪রাকাত ও পরে চার রাকাত নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হবে আল্লাহ পাক তার জন্য দোযখের অগ্নি হারাম করে দিবেন। অন্য এক হাদীসে ফরযের পর দু'রাকাতের কথাও বর্নিত আছে এবং এটাই অধিক শক্তিশালী। একারণে দু'রাকাত করে ৪ রাকাত আদায় করলে উভয়ের ওপর আমল হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, যুহরের সুন্নত চার রাকাত কোন কারণে আগে পড়তে না পারলে শায়খাইনের মতে ফরযের পরে আগে দু'রাকাত পড়বে, অতঃপর উক্ত চার রাকাত পড়বে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে আগে চার রাকাত, পরে দু'রাকাত পড়বে।

قوله اَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ الخ ঃ আসরের চার রাকাত সুন্নাত সম্পর্কে রাসূল (সা.) ফরমায়েছেন– مَنْ صَلّٰى اَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِلَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ যে ব্যক্তি আসরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকাত নামায পড়বে দোযখের অগ্নি তাকে স্পর্শ করবেনা। অবশ্য কোন কোন হাদীসে দু'রাকাতের বর্ণনা থাকায় ইমাম মুহাম্মাদ (র.) মুসল্লীর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

قوله رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ঃ এ দু'রাকাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) দীর্ঘকিরাত যথা প্রথম রাকাতে الم تنزيل ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা মূলক পড়তেন।

قوله اَرْبَعًا قَبْلَ الْعِشَاءِ ঃ ইশার ফরযের পরেও চার রাকাত পড়ার বর্ণনা আছে যথা-

"مَنْ صَلّٰى بَعْدَالْعِشَاءِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ كَانَ لَهٗ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ যে ব্যক্তি ইশার পরে চার রাকাত নামায পড়বে সে লায়লাতুল কদরে উক্ত নামায পড়ার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে।" অন্য রেওয়াতে দু'রাকাত পড়ার যে বর্ণনা আছে তা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আর আগে-পরের চার চার রাকাত গায়রে মুয়াক্কাদা। উল্লেখ্য যে, সর্বমোট সুন্নতে মুয়াক্কাদা হল বার রাকাত। ফজরে দুই, যুহরে ছয়, মাগরিবে দুই ও ইশায় দুই রাকাত। এর ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) ফরমায়েছেন- مَنْ ثَابَتَ عَلٰى اِثْنَىْ عَشَرَ رَكْعَةً فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ "যে ব্যক্তি দিনে রাতে বার রাকাত নামায রীতিমত পড়বে, আল্লাহ পাক তার জন্যে বেহেশতে একটি ঘর নিমার্ণ করবেন।

قوله وَالْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ الخ ঃ নফলের প্রতি রাকাত স্বতন্ত্র নামায। একত্রে অধিক রাকাতের নিয়ত করলেও প্রথম দু'রাকাত সম্পন্ন হলে পরবর্তী দু'রাকাত করে ওয়াজিব হয়। এ কারণে নফলের প্রতি রাকাতে ক্বিরাত পড়া ফরয। তদরূপ চার রাকাতের নিয়ত করে তৃতীয় বা চতুর্থ রাকাতে নামায নষ্ট হয়ে গেলে কেবল পরবর্তী দু'রাকাতই কাযা করতে হয়।

قوله يَتَنَفَّلُ عَلٰى دَابَّتِهِ الخ ঃ যান বাহনে আরোহণ কালে অবতরণ করার সুযোগ না থাকলে বা অবতরণ করলে মাল-পত্র চুরি হবার আশংকা থাকলে উক্ত বাহনেই নামায পড়ে নিবে। ফরয নামায হলে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত কেবলা মূখী থাকা ফরয। আর নফল হলে কেবলা মুখী হওয়া ফরয নয়। শাফেয়ী (র.) এর মতে তাহরীমা কালে ফরয। পরে কেবলা ঘুরে গেলে অসুবিধা নেই। আর রুকু সাজদা সম্ভব না হলে ইশারায় আদায় করবে।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। نفل অর্থ কি ? নফল নামায এক তাহরীমায় কত রাকাত পড়া শ্রেয়? বিস্তারিত লিখ।

২। নফল নামাযে কিরাত স্বরবে ও নীরবে পড়ার ব্যাপারে বিধান কি? লিখ।

৩। আছর ও ইশার নামাযের পূর্বে নফল কয় রাকাত ও এর ফযীলত কি? লিখ।

৪। যানবাহনে নফল নামায পড়লে কেবলামুখী হওয়ার বিধান কি? লিখ।

بَابُ سُجُوْدِ السَّهْوِ

سُجُوْدُ السَّهْوِ وَاجِبٌ فِى الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ بَعْدَ السَّلَامِ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيَلْزَمُهُ سُجُوْدُ السَّهْوِ اِذَا زَادَ فِىْ صَلٰوتِهِ فِعْلًا مِنْ جِنْسِهَا لَيْسَ مِنْهَا اَوْتَرَكَ فِعْلًا مَسْنُوْنًا اَوْتَرَكَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ اَوِ الْقُنُوْتِ اَوِ التَّشَهُّدِ اَوْ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ اَوْ جَهَرَ الْاِمَامُ فِيْمَا يُخَافَتُ اَوْخَافَتَ فِيْمَا يُجْهَرُ وَسَهْوُ الْاِمَامِ يُوْجِبُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ السُّجُوْدَ فَاِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْاِمَامُ لَمْ يَسْجُدِ الْمُؤْتَمُّ فَاِنْ سَهٰى الْمُؤْتَمُّ لَمْ يَلْزَمِ الْاِمَامَ وَلَا الْمُؤْتَمَّ السُّجُوْدُ ـ

সহু সাজদা প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ ১. নামাযে কম বেশীর ক্ষেত্রে সহু সাজদা ওয়াজিব। (নিয়মঃ) প্রথমে সাজদা করবে, অতঃপর তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। ২. সহু সাজদা ঐক্ষেত্রে ওয়াজিব হয় যখন নামায জাতীয় কোন ক্রিয়া নামাযে (ভুলবশত) অতিরিক্ত হয়ে যায় যা নামাযের অঙ্গ নয়। অথবা কোন ওয়াজিব কাজ তরক করে বা সূরায়ে ফাতিহা, দোয়ায়ে কুনূত, তাশাহহুদ, বা ঈদের নামাযের তাকবীর ছেড়ে দেয়। অথবা আস্তে কিরাতের স্থলে ইমাম জোরে পড়ে, অথবা জোরের স্থলে আস্তে পড়ে, ৩. ইমামের ভুলে মুক্তাদীর ওপর ও সাজদা ওয়াজিব করে। ইমাম সাজদা না করলে মুক্তাদী ও সাজদা করবেনা। আর মুক্তাদী ভুল করলে ইমামের ওপর সাজদা ওয়াজিব নয় এবং মুক্তাদীর ওপরও ওয়াজিব নয়।

প্রসঙ্গিক আলোচনা ॥ قول سُجُوْدُ السَّهْوِ ঃ سَهْوٌ অর্থ ভুল। এখানে اِضَافَتٌ لِمَّىْ অর্থাৎ لِلسَّهْوِ (ভুলের কারণে)।

قوله بَعْدَ السَّلَامِ ঃ ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে সালামের পূর্বে সাজদা করবে। ইমাম মালেক (র.) এর মতে কোন কাজ ভুল হলে সালামের আগে ও বেশী হলে সালামের পরে করবে। আর আবূ হানীফা (র.) এর মতে উভয় ক্ষেত্রেই সালামের পরে সাজদা করবে। হুযূর (সাঃ) হতে আগে পরে উভয় প্রকারের আমল বিদ্যমান আছে। তবে قولى (উক্তিগত) হাদীসে সালামের পরে দু'সাজদার বর্ণনা আছে। অর্থাৎ প্রতি ভুলের জন্য সালামের পর দু'সাজদা, করতে হবে।

قوله ثُمَّ يَتَشَهَّدُ الخ ঃ সালাম ফেরানোর দ্বারা সাজদার পূর্বের তাশাহহুদ শেষ হয়ে যায়। এ কারণে নুতন ভাবে বৈঠকের মধ্যে তাশাহহুদ পড়ার জরুরত দেখা দেয়।

قوله فِعْلًامِنْ جِنْسِهَا এ কথার দ্বারা যে সব কাজ নামাযের অঙ্গ তাতে কম বেশী করার দ্বারা সাজদা ওয়াজিব নয় এটা বুঝান উদ্দেশ্য। যথা কিয়াম, বৈঠক ইত্যাদি লম্বা করা। এতে সহু সাজদা ওয়াজিব হয়না।

قوله اَوْتَرَكَ فِعْلًا مَسْنُوْنًا الخ ঃ এখানে مَسْنُوْنٌ দ্বারা مَاثَبَتَ بِالسُّنَّةِ তথা সুন্নতে রাসূল (সাঃ) দ্বারা প্রমাণিত থাকা উদ্দেশ্য।

قوله يُخَافَتُ ঃ উল্লেখ্য যে, একাকী ব্যক্তির জন্যে কোন ক্ষেত্রেই কিরাত জোরে বা আস্তে পড়া ওয়াজিব নয়। বরং সে ইচ্ছাধীন। এ কারণে তার জন্যে স্বরবের স্থলে নীরবে বা এর বিপরীত হলে সহু সাজদা ওয়াজিব নয়। আর ইমামের জন্যে এরূপ কতটুকু করলে সহু সাজদা ওয়াজিব এব্যাপারে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হল কমপক্ষে তিন আয়াত পরিমাণ এমন হলে সাজদা ওয়াজিব, নতুবা নয়।

وَمَنْ سَهٰى عَنِ الْقُعْدَةِ الْأُوْلٰى ثُمَّ تَذَكَّرَ وَهُوَ اِلٰى حَالِ الْقُعُوْدِ اَقْرَبُ عَادَ فَجَلَسَ وَتَشَهَّدَ وَاِنْ كَانَ اِلٰى حَالِ الْقِيَامِ اَقْرَبُ لَمْ يَعُدْ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَاِنْ سَهٰى عَنِ الْقُعْدَةِ الْاَخِيْرَةِ فَقَامَ اِلٰى الْخَامِسَةِ رَجَعَ اِلٰى الْقُعْدَةِ مَالَمْ يَسْجُدْ وَاَلْغٰى الْخَامِسَةَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَاِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ بَطَلَ فَرْضُهٗ وَتَحَوَّلَتْ صَلٰوتُهٗ نَفْلًا وَكَانَ عَلَيْهِ اِنْ يَضُمَّ اِلَيْهَا رَكْعَةً سَادِسَةً وَاِنْ قَعَدَ فِى الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يُسَلِّمْ يَظُنُّهَا الْقُعْدَةَ الْاُوْلٰى عَادَ اِلٰى الْقُعُوْدِ مَا لَمْ يَسْجُدْ لِلْخَامِسَةِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَاِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ ضَمَّ اِلَيْهَا رَكْعَةً اُخْرٰى وَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُهٗ وَالرَّكْعَتَانِ نَافِلَةٌ وَمَنْ شَكَّ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَلَمْ يَدْرِ اَثَلٰثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا وَذٰلِكَ اَوَّلُ مَا عَرَضَ لَهٗ اِسْتَانَفَ الصَّلٰوةَ فَاِنْ كَانَ يَعْرِضُ لَهٗ كَثِيْرًا بَنٰى عَلٰى غَالِبِ ظَنِّهٖ اِنْ كَانَ لَهٗ ظَنٌّ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ ظَنٌّ بَنٰى عَلٰى الْيَقِيْنِ –

অনুবাদ ॥ ৪. কেউ যদি প্রথম বৈঠকে না বসে ভুলে দাঁড়িয়ে যেতে থাকে। আর বসার নিকটবর্তী থাকতেই স্মরণ এসে যায় তাহলে সে বসে যাবে ও তাশাহহুদ পড়বে। আর যদি দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হয় তাহলে (বসার দিকে) ফিরবেনা। বরং শেষে সহু সাজদা করবে। ৫. যদি কেউ শেষ বৈঠক ভুলে যেয়ে পঞ্চম রাকাতের জন্যে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে সাজদা না করা পর্যন্ত বসে যাবে। তার পঞ্চম রাকাত বাদ হয়ে যাবে, এবং শেষে সহু সাজদা করবে। পঞ্চম রাকাতকে যদি সাজদা দ্বারা আবদ্ধ (মজবুত) করে ফেলে তাহলে তার ফরয বাতিল হয়ে উক্ত নামায নফলে পরিণত হবে। এ ক্ষেত্রে তার জন্যে ষষ্ঠ এক রাকাত মিলাতে হবে। ৬. যদি কেউ চতুর্থ রাকাতে বসে অতঃপর দাঁড়িয়ে যায়, আর এটাকে প্রথম বৈঠক ধারণা করে থাকে তাহলে পঞ্চম রাকাতের সাজদা না করা পর্যন্ত বসে যাবে এবং সালাম ফিরিয়ে সহু সাজদা করবে। আর যদি পঞ্চম রাকাতকে সালাম দ্বারা বেঁধে ফেলে তাহলে আরো এক রাকাত মিলাবে। এক্ষেত্রে তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে, শেষের দু'রাকাত নফল বিবেচিত হবে। যদি কেউ নামাযে সন্দিহান হয়, এবং তিন রাকাত পড়ল, না চার রাকাত জানেনা,আর এমন সন্দেহ তার এই প্রথম পেশ হয়, তাহলে সে নুতন ভাবে নামায পড়বে। আর যদি অনেকবার এমন হয়ে থাকে তাহলে প্রবল ধারণা যেদিকে হয় তার ওপরই নির্ভর করবে যদি ধারণা থাকে। আর ধারণা না থাকলে দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে নামায পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله عَادَ اِلٰى الْقُعُوْدِ الخ ঃ কেননা এক সাজদা না করা পর্যন্ত রাকাত পূর্ণ হয়না, একারণে পুনরায় বসে যাবে। আর সাজদা করে ফেললে উক্ত রাকাত নষ্ট করা ঠিক হবেনা। কেননা ইরশাদ হয়েছে– لَاتُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ "তোমরা তোমাদের আমল বিনষ্ট করোনা।" আর বেজোড় কোন নফল হয়না এ কারণে আরো একরাকাত মিলিয়ে দু'রাকাত পূর্ণ করতে হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। সহু সাজদা কাকে বলে? সহু সাজদা সালামের পূর্বে না পরে? এ ব্যাপারে মতান্তর কি? বর্ণনা কর।
২। সহু সাজদা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মূলনীতি কি? বর্ণনা দাও।
৩। মুনফারিদ ব্যক্তি যদি স্বরবের কেরাত নীরবে বা এর বিপরীত পড়ে তাহলে সহু সাজদা ওয়াজিব কিনা?
৪। وَيَلْزَمُهٗ سُجُوْدُ السَّهْوِ اِذَا زَادَ فِىْ صَلٰوتِهٖ فِعْلًا مِنْ جِنْسِهَا لَيْسَ مِنْهَا اَوْ تَرَكَ فِعْلًا مَسْنُوْنًا ـ ব্যাখ্যা কর।
৫। যদি কেউ সন্দিহান হয় যে, নামায ৩ রাকাত পড়ল? নাকি ৪ রাকাত, তার সমাধান কি? লিখ।

بَابُ صَلٰوةِ الْمَرِيْضِ

اِذَا تَعَذَّرَ عَلَى الْمَرِيْضِ الْقِيَامُ صَلّٰى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ اَوْمٰى اِيْمَاءً وَجَعَلَ السُّجُوْدَ اَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلَا يَرْفَعُ اِلٰى وَجْهِهٖ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعِ الْقُعُوْدَ اِسْتَلْقٰى عَلٰى قَفَاهُ وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْقِبْلَةِ وَاَوْمٰى بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَاِنِ اضْطَجَعَ عَلٰى جَنْبِهٖ وَوَجْهُهٗ اِلَى الْقِبْلَةِ وَ اَوْمٰى جَازَ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعِ الْاِيْمَاءَ بِرَأْسِهٖ اَخَّرَ الصَّلٰوةَ وَلَا يُوْمِىْ بِعَيْنَيْهِ وَلَا بِحَاجِبَيْهِ وَلَا بِقَلْبِهٖ فَاِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقِيَامُ وَجَازَ اَنْ يُّصَلِّىَ قَاعِدًا يُوْمِئُ اِيْمَاءً۔

রুগ্ন ব্যক্তির নামায

অনুবাদ ॥ ১. রুগ্ন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম হলে বসে রুকু সাজদার মাধ্যমে নামায পড়বে, আর রুকু সাজদা করতে সক্ষম না হলে ইশারার মাধ্যমে নামায আদায় করবে। সাজদার ক্ষেত্রে রুকু হতে বেশী নীচু হবে। (সাজদার জন্য) কোন বস্তু উঠিয়ে চেহারায় লাগাবেনা। যদি বসতেও স্বক্ষম নাহয় তাহলে চিত হয়ে শুবে। উভয় পা কেবলামূখী রাখবে। অতঃপর রুকু সাজদার জন্য ইশারা করবে। আর যদি কাৎ হয়ে শোয় আর মুখ কেবলার দিকে থাকে অতঃপর ইশারায় নামায আদায় করে তা জায়েয হয়ে যাবে। ২. আর যদি মাথা দ্বারা ইশারার ক্ষমতাও না রাখে তাহলে নামায বিলম্বিত করবে। কেবল চক্ষুদ্বয়, ভ্রূযুগল ও অন্তর দ্বারা ইশারা করবে না। ৩. কেউ যদি রোগাক্রান্ত হয়, আর রুকু সাজদার ক্ষমতনা রাখে তাহলে তার জন্যে দাঁড়ান জরূরী নয়। বসে ইশারায় নামায পড়া জায়েয।

প্রসাঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله تَعَذَّرَالْقِيَامُ الخ ঃ দাঁড়িয়ে নামায পড়া কোন্ সময় রহিত হবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে মাথা ঘুর্ণন বা দূর্বলতার দরুণ দাঁড়াতে নাপারে তখন বসে নামায পড়ার অনুমতি আছে। এ ব্যাপারে সর্বাধিক সহীহ মত এইযে, যে কোন ক্ষেত্রে দাঁড়াতে অপারগ হলে বা ক্ষতিকর হলে বসে নামায আদায় করবে, কিছু অংশ এমনকি যদি তাহরীমাটাও দাঁড়িয়ে আদায় করতে পারে তা হলে দাঁড়িয়ে আদায় করবে। বাকী নামায বসে আদায় করবে।

قوله وَلَا يَرْفَعُ اِلٰى وَجْهِهٖ الخ ঃ যতটুকু নত হয়ে সাজদা করতে পারে ততটুকু নত হতে হবে। বালিশ ইত্যাদি কিছু উঁচু করে কপালে লাগিয়ে সাজদা করবে না। তবে মাটির সাথে লাগানো শক্ত বস্তু হলে মাকরূহ হবেনা।

قوله اِسْتَلْقٰى عَلٰى قَفَاهُ ঃ সহজ পদ্ধতি এইযে, পা কেবলামুখী করে হাঁটু দুটি উঁচু রাখবে। আর মাথার নীচে দু'একটা বালিশ রেখে মাথা উঁচু করে ইশারায় রুকু সাজদা করবে।

قوله اَخَّرَالصَّلٰوةَ ঃ ইশারায় নামায আদায়ের ক্ষমতা না থাকলে তখন তার জন্যে নামায মাফ হয়ে যায়, তবে পরে সুস্থ হলে কাযা পড়তে হবে। আর সুস্থ নাহলে তার কাফফারা দিতে হবে। "বিলম্বিত করবে" এ শব্দের দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فَإِنْ صَلَّى الصَّحِيحُ بَعْضَ صَلٰوتِهِ قَائِمًا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ مَرَضٌ تَمَّهَا قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَيُؤْمِي إِيْمَاءً إِنْ لَّمْ يَسْتَطِعِ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ أَوْ مُسْتَلْقِيًا إِنْ لَّمْ يَسْتَطِعِ الْقُعُودَ ـ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لِمَرَضٍ ثُمَّ صَحَّ بَنٰى عَلٰى صَلٰوتِهِ قَائِمًا فَإِنْ صَلَّى بَعْضَ صَلٰوتِهِ بِإِيْمَاءٍ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ اِسْتَأْنَفَ الصَّلٰوةَ وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَمَادُوْنَهَا قَضَاهَا إِذَا صَحَّ وَإِنْ فَاتَتْهُ بِالْإِغْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ لَمْ يَقْضِ ـ

অনুবাদ ॥ ৪. কোন সুস্থ ব্যক্তি যদি নামাযের কিছু অংশ দাঁড়িয়ে পড়ে অতঃপর তার রোগ দেখা দেয় তাহলে বসে রুকু সাজদার মাধ্যমে তা পূর্ণ করবে। রুকু সাজদার ক্ষমতা না রাখলে ইশারায় আদায় করবে। আর বসার ক্ষমতা না রাখলে চিৎ হয়ে আদায় করবে। ৫. যে ব্যক্তি রোগের কারণে বসে রুকু সাজদার মাধ্যমে নামায আদায় করছিল যদি নামাযের ভেতরই সুস্থ হয়ে যায় তাহলে বাকী নামায দাঁড়িয়ে আদায় করবে। আর যদি নামাযের কিছু অংশ ইশারার মাধ্যমে আদায় করে অতঃপর রুকু সাজদা করতে স্বক্ষম হয়, তাহলে নুতন ভাবে নামায আদায় করবে। ৬. যদি কেউ পাঁচ বা এর কম নামাযের সময় পরিমাণ বেহুস থাকে সে সুস্থ হওয়ার পর উক্ত নামায কাযা পড়বে। আর বেহুসের কারণে এর অধিক নামায ছুটে গেলে তার কাযা পড়তে হবেনা।

প্রসাঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله بَنٰى عَلٰى صَلٰوتِهِ الخ ঃ কেননা এ ক্ষেত্রে রুকু সাজদা পাওয়া যাওয়ার কারণে كَامِل (পূর্ণাঙ্গ) এর বেনা বা ভিত্তি نَاقِص (অপূর্ণাঙ্গ) এর উপর হয়না। এজন্যে জায়েয।

قوله وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ـ الخ ঃ এ মাসআলাটির ভিত্তি মূলত ঃ ইস্তিহসানের ওপর। নতুবা কিয়াসের চাহিদা হল এক ওয়াক্ত ব্যাপী বেহুস থাকলেও তার কাযা ওয়াজিব নাহওয়া। কারণ তখন সে মুকাল্লাফ নয়। আর এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.) এর অভিমত। ইস্তিহসান (উত্তম জ্ঞানকরা) এর কারণ এইযে, মূলতঃ পাঁচ ওয়াক্তের বেশী ব্যাপী হলে তা প্রতি ওয়াক্ত مُكَرَّرٌ (একাধিক বার) হওয়ার কারণে আধিক্যে পরিণত হয়। ফলে তা কাযা আদায় কষ্টকর, আর কম হলে তা কষ্ট কর নয়। উপরন্ত সাহাবায়ে কেরামের আমলের দ্বারা ও এর দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন - হযরত আলী (রা.) একাধারে চার ওয়াক্ত পরিমাণ বেহুস ছিলেন পরে তিনি উক্ত নামাযের কাযা আদায় করেন। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির পাঁচ ওয়াক্ত পরিমাণ বেহুস থাকায় উক্ত নামাযের কাযা আদায় করেন। আর হযরত ইবনে উমর (রা.) এর সময় একদিন একরাতের বেশী সময় বেহুশ ছিলেন তিনি উক্ত নামাযের কাযা আদায় করেননি।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। রুগ্ন ব্যক্তির নামাযের আদায়ের হুকুম কি? বিস্তারিত লিখ।

২। রুগ্ন ব্যক্তির নামায কোন্ সময় রহিত হয়ে যায়? লিখ।

৩। বেহুস ব্যক্তির নামাযের হুকুম কি? বেহুস কালীন ব্যক্তি তো মুকাল্লাফ থাকেনা। তথাপি কি তার জন্যে নামাযের কাযা আদায় করতে হবে?

بَابُ سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ

فِى الْقُرْاٰنِ اَرْبَعَةَ عَشَرَ سَجْدَةً فِىْ اٰخِرِ الْاَعْرَافِ وَفِى الرَّعْدِ وَفِى النَّحْلِ وَفِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَمَرْيَمَ وَالْاُوْلٰى فِى الْحَجِّ وَالْفُرْقَانِ وَالنَّمْلِ وَالٓمّٓ تَنْزِيْلِ وَصٓ وَحٰمٓ السَّجْدَة وَالنَّجْمِ وَالْاِنْشِقَاقِ وَالْعَلَقِ - اَلسُّجُوْدُ وَاجِبٌ فِىْ هٰذِهِ الْمَوَاضِعِ عَلَى التَّالِىْ وَالسَّامِعِ سَوَاءٌ قَصَدَ سِمَاعَ الْقُرْاٰنِ اَوْلَمْ يَقْصُدْ فَاِذَا تَلَا الْاِمَامُ اٰيَةَ السَّجْدَةِ سَجَدَهَا وَسَجَدَ الْمَامُوْمُ مَعَهُ فَاِنْ تَلَا الْمَامُوْمُ لَمْ يَلْزَمِ الْاِمَامَ وَلَا الْمَامُوْمَ السُّجُوْدُ وَاِنْ سَمِعُوْا وَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ اٰيَةَ سَجْدَةٍ مِنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ لَمْ يَسْجُدُوْهَا فِى الصَّلٰوةِ وَسَجَدُوْهَا بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَاِنْ سَجَدُوْهَا فِى الصَّلٰوةِ لَمْ تُجْزِئْهُمْ وَلَمْ تَفْسُدْ صَلٰوتُهُمْ وَمَنْ تَلَا اٰيَةَ سَجْدَةٍ خَارِجَ الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَسْجُدْهَا حَتّٰى دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ فَتَلَاهَا وَسَجَدَ لَهُمَا اَجْزَأَتْهُ السَّجْدَةُ عَنِ التِّلَاوَتَيْنِ وَاِنْ تَلَاهَا فِىْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ فَسَجَدَهَا ثُمَّ دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ فَتَلَاهَا سَجَدَهَا ثَانِيًا وَلَمْ تُجْزِئْهُ السَّجْدَةُ الْاُوْلٰى وَمَنْ كَرَّرَ تِلَاوَةَ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ اَجْزَأَتْهُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ وَمَنْ اَرَادَ السُّجُوْدَ كَبَّرَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَلَا تَشَهُّدَ عَلَيْهِ وَلَا سَلَامَ -

---

তিলাওয়াতে সাজদা প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ তিলাওয়াতে সাজদার হুকুম ও মাসায়েল ঃ (সাজদার সংখ্যা) কুরআন মজীদে মোট ১৪টি সাজদা আছে। ১। সূরা আ'রাফের শেষে, ২। সূরা রা'দে ৩। নাহলে ৪। বনী ইসরাঈলে, ৫। মারয়ামে, ৬। সূরায়ে হ'জ্জের প্রথমটিতে, ৭। সূরায়ে ফুরকানে, ৮। নামলে, ৯। আলিফ লাম-মীম তানযীলে, ১০। সোয়াদে, ১১। হা-মী সা'জদাতে, ১২। নাজমে, ১৩। ইনশেকাকে ও ১৪। আলাক্বে।

মাসায়েল ঃ ১. তিলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের ওপর সাজদা ওয়াজিব। চাই শ্রবণের ইচ্ছে করুক বা না করুক। ২. ইমাম সাজদার আয়াত তিলায়াত করলে তিনি এবং মুক্তাদীগণ একই সাথে সাজদা করবে। মুক্তাদী তিলাওয়াত করলে ইমাম ও মুক্তাদী কারো জন্যে সাজদা ওয়াজিব হয়না। ৩. যদি তাদের সাথে নামাযরত নয় এমন ব্যক্তি হতে নামাযী ব্যক্তিগণ সাজদার আয়াত শোনে তাহলে নামাযের মধ্যে সাজদা করবেনা, বরং নামাযের পরে সাজদা করবে। নামাযের মধ্যে সাজদা করলে তা যথেষ্ট হবেনা। তবে এতে নামায নষ্ট হবেনা। ৪. কেউ যদি নামাযের বাহিরে সাজদার আয়াত পড়ে কিন্তু তখন

সাজদা না করে। অতঃপর নামায শুরু করে নামাযের মধ্যে পুনরায় উক্ত আয়াত পড়ে এবং তিলাওয়াতের সাজদা করে তাহলে তা উভয়ের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। ৫. আর যদি নামাযের বাইরে তিলাওয়াতের পর সাজদা করে অতঃপর নামায শুরু করে দ্বিতীয়বার উক্ত আয়াত পড়ে তাহলে প্রথম সাজদা যথেষ্ট হবেনা। ৬. কেউ একই মজলিসে সাজদার আয়াত বারবার পড়লে এক সাজদাই তার জন্যে যথেষ্ঠ হবে।

সাজদার নিয়ম ঃ কেউ তিলাওয়াতের সাজদা করতে ইচ্ছে করলে প্রথম 'আল্লাহু আকবর' বলবে। তবে হাত উঠাবেনা। অতঃপর সাজদা করবে। পূণরায় আল্লাহু আকবর বলে সাজদা হতে মাথা উত্তোলন করবে। তিলাওয়াতের সাজদাকারীর জন্য তাশাহহুদ পড়তে হয়না এবং সালাম ফিরাতে হয়না ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله أَرْبَعَةَ عَشَرَ الخ ইমাম শাফেয়ী ও আবু হানীফা (র.) এর মতে তিলাওয়াতের সাজদা ১৪টি। তবে শাফেয়ী (র.) এর মতে সূরা হজ্জে দু'টি সাজদা, আর সূরা সোয়াদে কোন সাজদা নেই। আর আবু হানীফা (র) এর মতে সুরা সোয়াদে একটি ও হজ্জে একটি। হযরত আহমদ ইবনে হম্বল র (র.) এর মতে ১৫টি। সুরায় হজ্জের ২টিও সোয়াদের ১টি।

قوله اَلسُّجُوْدُ وَاجِبٌ الخ ঃ হানফীগণের মতে তিলাওয়াতের সাজদা আমলের দিক দিয়ে ওয়াজিব। কেননা এ গুলোর প্রত্যেকটিই সাজদা জরুরী হওয়া বুঝায়। সাজদার আয়াত গুলো তিন ধরণের। (এক) কোনটির মধ্যে স্পষ্টাকারে সাজদার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ওয়াজিব হওয়া বুঝায়, (দুই) কোন কোন আয়াতে সাজদা আম্বিয়ায়ে কেরামের আমল বা অভ্যাস বর্ণিত হয়েছে। অতএব তাদের এক্তেদা বা অনুসরণ জরুরী, (তিন) কোন কোন আয়াতে সাজদা না করার কারণে তিরস্কার করা হয়েছে। আর ওয়াজিব তরকের কারণেই তিরস্কার করা হয়। সুতরাং এটাও ওয়াজিব প্রমাণ করে।

উল্লেখ্য যে, সাজদার আয়াত পাঠ বা শ্রবণের সাথে সাথেই সাজদা করা উচিৎ। কারণ বশতঃ পরে করলেও আদায় হয়ে যাবে। ঋতুবতী, নাবালেগ, বেহুস ও পাগল ব্যক্তি সাজদার আয়াত শ্রবণ করলে তাদের ওপর সাজদা ওয়াজিব হয়না।

قوله لَمْ تَفْسُدْ صَلٰوتُهُ الخ ঃ অর্থাৎ নামাযে থাকাকালে নামাযের বাইরের কারো থেকে সাজদার আয়াত শুনে নামযের মধ্যে সাজদা করলে সাজদা আদায় হয়না। তবে এতে নামায নষ্ট হবেনা। কেননা সাজদা নামাজের অঙ্গ। আর মাসবূক ব্যক্তি যেরূপ রুকুর পরে ইমানের সাথে শরীক হলে তার উক্ত সাজদা নামাযে গণ্য হয়না তদরূপ এক্ষেত্রে ও তিলাওয়াতের সাজদা গণ্য হবেনা।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। তিলাওয়াতের সাজদার সংখ্যার ব্যাপারে মতান্তর কি? এবং আদায়ের পদ্ধতি কি? বিস্তারিত লিখ।

২। তিলাওয়াতের সাজদার হুকুম কি এবং কেন সাজদা করতে হয়? বর্ণনা কর।

بَابُ صَلٰوةِ الْمُسَافِرِ

اَلسَّفَرُ الَّذِىْ يَتَغَيَّرُ بِهِ الْاَحْكَامُ هُوَ اَنْ يَقْصُدَ الْاِنْسَانُ مَوْضِعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقْصَدِ مَسِيْرَةُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ بِسَيْرِ الْاِبِلِ وَمَشْىِ الْاَقْدَامِ وَلَا مُعْتَبَرَ فِىْ ذٰلِكَ بِالسَّيْرِ فِى الْمَاءِ وَفَرْضُ الْمُسَافِرِ عِنْدَنَا فِىْ كُلِّ صَلٰوةٍ رُبَاعِيَّةٍ رَكْعَتَانِ وَلَا تَجُوْزُ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا۔

মুসাফিরের নামায প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ সফর দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ যে সফর দ্বারা শরীয়তের হুকুম পরিবর্তন হয়ে যায় তাহল এমন স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করা যে স্থান ও তার নিজের মধ্য উট চলার বা পায়ে হাঁটার পথে তিন দিনের দুরত্ব হয়। এ দুরুত্ব পানি পথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়।

মুসাফিরের করনীয়ও কতিপয় মাসায়েল ঃ ১. আমাদের (হানাফীগণের) মতে মুসাফিরের জন্য চার রাকাত ফরয নামাযের ক্ষেত্রে দু'রাকাত পড়া ফরয। দু'রাকাতের অধিক পড়া মুসাফিরের জন্যে জায়েয নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله اَلسَّفَرُ الَّذِىْ يَتَغَيَّرُ الخ ঃ سفر অর্থ প্রকাশ হওয়া, ভ্রমন করা। ভ্রমনের দ্বারা ভ্রমনকারী নিকট বিভিন্ন বিষয় যা তার চরিত্র প্রকাশিত হয়। এ জন্যে সফরকে সফর বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় সকল ভ্রমণ কে সফর বলা হয়না বরং যে সফর দ্বারা শরীয়তের নির্দিষ্ট বিধানের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে সফর বলে। তার জন্যে শর্ত হলো ১. নির্দিষ্ট স্থানে গমনের উদ্দেশ্য রাখা, কোন লক্ষ্যস্থল ঠিক না করে সমগ্র বিশ্ব ভ্রমন করলে ও তার উপর মুসাফিরের কোন বিধান বর্তাবেনা। ২. কমপক্ষে ৪৮ মাইল তথা ৯০ কিঃ মিঃ দুরত্বে যাওয়ার ইচ্ছো রাখা।

মুসাফিরের বিধান ঃ উল্লোখ্যে যে, সফরের দ্বারা মুসাফিরের ওপর ৫ প্রকার বিধান শিথিল হয়। (ক) চার রাকাত ফরয নামায মুসাফিরের জন্যে দু'রাকাত পড়তে হয়। (খ) সুন্নতে মুয়াক্কাদা নামায নফলের পর্যায়ে গণ্য হয়। (গ) রামাযানের রোযা সফর অবস্থায় আদায় করা জরুরী থাকেনা, পরে কাযা আদায় করতে পারে। (ঘ) মোজার ওপর মাসহ করার সময়সীমা ৩দিন ৩রাত বিলম্বিত হয়। (ঙ) ঈদ ও জুমআর নামাযের ওয়াজিব হওয়ার হুকুম রহিত হয়ে যায়।

قوله وَلَامُعْتَبَرَفِىْ ذٰلِكَ الخ ঃ বৎসরের সর্বাপেক্ষা ছোটদিনে, সমতল ভূমিতে তিন দিনে যতদূর যাওয়া যায় ঐ পরিমানই হল সফরের হুকুম বর্তানোর নিম্নতম সীমা। এতে জলযানে বা পাহাড়ী অসমতল ভূমি অতিক্রম করা ধর্তব্য নয়। বরং শান্ত আব-হাওয়ায় নৌকায় তিন দিনে যতটুকু পথ অতিক্রম করা যায় জলপথে এটাই ধর্তব্য। স্থলের হিসেব স্থলে এবং জলপথের হিসেব জলপথেই কার্যকর। তদরূপ পাহাড়ী এলাকার দূরত্বও ভিন্নভাবে ধর্তব্য। উল্লেখ্য যে, স্থলপথে ঐ টা ৪৮ মাইল বা ৯০ কিঃ মিঃ ধার্য করা হয়েছে। চাইতা দ্রুতযানে যতই কম সময়ে অতিক্রম করা যাক তা ধর্তব্য নয়।

فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا وَقَدْ قَعَدَ فِى الثَّانِيَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ أَجْزَأَتْهُ الرَّكْعَتَانِ عَنْ فَرْضِهِ وَكَانَتِ الْأُخْرَيَانِ لَهُ نَافِلَةً وَإِن لَّمْ يَقْعُدْ فِى الثَّانِيَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بَطَلَتْ صَلٰوتُهُ ـ وَمَنْ خَرَجَ مُسَافِرًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِذَا فَارَقَ بُيُوتَ الْمِصْرِ وَلَا يَزَالُ عَلٰى حُكْمِ الْمُسَافِرِ حَتّٰى يَنْوِى الْإِقَامَةَ فِىْ بَلْدَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَصَاعِدًا فَيَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ فَإِنْ نَوَى الْإِقَامَةَ أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ لَمْ يُتِمَّ وَمَنْ دَخَلَ بَلَدًا وَلَمْ يَنْوِ أَن يُّقِيْمَ فِيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَإِنَّمَا يَقُوْلُ غَدًا أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ أَخْرُجُ حَتّٰى بَقِىَ عَلٰى ذٰلِكَ سِنِيْنَ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ـ وَإِذَا دَخَلَ الْعَسَاكِرُ فِىْ أَرْضِ الْحَرْبِ فَنَوَوْا الْإِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يُتِمُّوا الصَّلٰوةَ ـ

অনুবাদ॥ যদি চার রাকাত পড়ে আর প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসে তাহলে ফরয আদায়ের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে। তবে শেষের দু'রাকাত নফল বিবেচিত হবে। আর যদি প্রথম দু'রাকাতের পরে তাশাহ্হুদ পরিমাণ না বসে তাহলে তার ফরয বাতিল হয়ে যাবে। ২. কোন ব্যক্তি সফরের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পর যখন সে নিজ জনপদ অতিক্রম করবে তখন থেকে দু'রাকাত নামায পড়বে। এবং ঐ সময় পর্যন্ত সে মুসাফিরের হুকুমভূক্ত থাকবে যতক্ষণ না পনের বা ততোধিক দিন কোন শহরে (স্থানে) থাকবার নিয়ত করবে। আর (এরূপ নিয়ত করলে) তখন তার জন্যে পূর্ণ নামায পড়া জরূরী হবে। যদি পনের দিনের কম থাকার নিয়ত করে তাহলে কছর করবে (দু'রাকাত পড়বে)। ৩. কোন ব্যক্তি যদি শহরে যেয়ে, পনের দিন অবস্থানের নিয়ত না করে বরং বলতে থাকে যে আগামীকাল বা পরশু বের হবো এভাবে সে কয়েক বৎসর কাটিয়ে দেয় তথাপি তার জন্যে দু'রাকাতই পড়তে হবে। ৪. কোন লোক যদি শত্রুভূমিতে গমন করে পনের দিন সেখানে অবস্থানের নিয়ত করে তথাপি পূর্ণ নামায পড়বেনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا الخ ঃ হানাফী মাযহাব মতে সফর হালতে এটা আযীমত তথা জরূরী। সুতরাং দু'রাকাতই ফরয। অতএব চার রাকাত পড়লে তা'ফরয গণ্য হবেনা। অপর দিকে ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) এর মতে এটা রোখসত তথা ইচ্ছাধীন। সুতরাং সময় থাকলে চার রাকাত ও পড়তে পারে।

قوله بُيُوْتَ الْمِصْرِ الخ ঃ অর্থাৎ নিজ জনপদের বসতী অতিক্রম করার পর তার ওপর মুসাফিরের বিধান বর্তাবে। উল্লেখ্য যে, নিজ জনপদ বলতে সাধারণতঃ যে স্থানে সচারাচর চলাফেরা করা হয় উক্ত এলাকা অতিক্রম করা উদ্দেশ্য।

قوله إِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ الخ ঃ দারুল হরব তথা অমুসলিম রাষ্ট্র মুসলিম সৈন্যদের জন্য নিরাপত্তাহীন এলাকা বিবেচিত। যে কোন মূহুর্তে প্রস্থানের জরূরত হতে পারে। এ জন্যে সেখানে থাকা কালীন সময়ে কছর পড়তে হবে।

وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِىْ صَلٰوةِ الْمُقِيْمِ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ أَتَمَّ الصَّلٰوةَ وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ فِىْ فَائِتَةٍ لَمْ تَجُزْ صَلٰوتُهُ خَلْفَهُ وَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيْمِيْنَ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَتَمَّ الْمُقِيْمُوْنَ صَلٰوتَهُمْ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَّقُوْلَ لَهُمْ أَتِمُّوا صَلٰوتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ - وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مِصْرَهُ أَتَمَّ الصَّلٰوةَ وَإِنْ لَّمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ فِيْهِ وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ فَانْتَقَلَ عَنْهُ وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ ثُمَّ سَافَرَ فَدَخَلَ وَطَنَهُ الْأَوَّلَ لَمْ يُتِمَّ الصَّلٰوةَ وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ أَنْ يُّقِيْمَ بِمَكَّةَ وَمِنٰى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يُتِمَّ الصَّلٰوةَ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ يَجُوْزُ فِعْلًا وَلَا يَجُوْزُ وَقْتًا وَتَجُوْزُ الصَّلٰوةُ فِىْ سَفِيْنَةٍ قَاعِدًا عَلٰى كُلِّ حَالٍ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَعِنْدَهُمَا لَا تَجُوْزُ إِلَّا بِعُذْرٍ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةٌ فِى السَّفَرِ قَضَاهَا فِى الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةٌ فِى الْحَضَرِ قَضَاهَا فِى السَّفَرِ أَرْبَعًا وَالْعَاصِىْ وَالْمُطِيْعُ فِى السَّفَرِ فِى الرُّخْصَةِ سَوَاءٌ -

---

অনুবাদ॥ ৫. কোন মুসাফির ব্যক্তি ওয়াক্ত বাকী থাকতে যদি মুকীমের পিছনে এক্তেদা করে তাহলে পূর্ণ নামাযই পড়তে হবে। আর যদি (ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর কাযা নামাযের এক্তেদা করে তাহলে মুকীমের পিছনে তার নামায আদায় হবেনা। ৬. কোন মুসাফির যদি মুকীমদের ইমাম হয় তাহলে সে দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবে। অতঃপর মুকীম মুক্তাদীরা বাকী নামায পূর্ণ করবে। আর ইমামের জন্য হল সালামের পরে এটা বলে দেয়া মুস্তাহাব যে, আপনারা নিজ নিজ নামায পূর্ণ করে নিন। কারণ আমরা মুসাফির। ৮. মুসাফির ব্যক্তি নিজ শহরে (এলাকায়) পৌছলে পূর্ণ নামায পড়বে। যদিও তথায় মুকীম হওয়ার (থাকার) নিয়ত নাকরে। যদি কারো পূর্বের স্থায়ী বাসস্থান থাকে। আর সেখান থেকে অন্যত্র স্থায়ী (বসবাসের জন্য) বাসস্থান গ্রহণ করে। অতঃপর সেখান থেকে সফর করে পূর্বের বাসস্থানে গমণ করে তাহলে সেখানে পূর্ণ নামায পড়বেনা বরং কছর পড়বে। ৯. কোন মুসাফির যদি মক্কায় মিনায় পনের দিন থাকার নিয়ত করে তাহলে সে পূর্ণ নামায পড়বেনা। ১০. মুসাফিরের জন্যে جمع بين الصلواتين (দু' নামায একত্রে পড়া) আদায়ের দিক দিয়ে জায়েয। ওয়াক্তের দিক দিয়ে জায়েয নয়। ১১. হযরত আবু হানীফা (র.) এর মতে নৌকায় সর্বাবস্থায় বসে নামায পড়া জায়েয। সাহিবাইনের মতে অক্ষমতা বশত ঃ জায়েয নতুবা নাজায়েয। ১২. সফর অবস্থায় কারো নামায কাযা হয়ে গেলে মুকীম অবস্থায় দু'রাকাতই কাযা পড়বে। তদরূপ মুকীম অবস্থায় কারো নামায কাযা হলে সফর অবস্থায় চার রাকাতই কাযা পড়বে। সফরের শিথিলতার ক্ষেত্রে সৎ উদ্দেশ্যে সফরকারী ও অন্যায় উদ্দেশ্যে সফরকারী একই পর্যায়ে গণ্য।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ مِصْر শহর, নগর। وَطَنٌ বাসস্থান, سَفِيْنَة নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার, জলযান, حَضَرٌ মুকীম অবস্থা। عَاصِى গোনাহগার, পাপী। এখানে পাপকার্যে সফররত, مُطِيْع অনুগত, এস্থলে সৎ উদ্দেশ্যে সফররত। رُخْصَة ছু'টি, শিথিলতা উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله اتم المقيمون الخ : মুসাফিরের পিছনে মুকীম ব্যক্তি এক্তেদা করলে ইমামের সালামের পর উঠে বাকী দু'রাকাত বিনা কিরাতে আদায় করবে। কেননা এ ক্ষেত্রে মুকীম মুক্তাদীরা لَاحِقٌ এর হুকুমে গণ্য। আর লাহিকের জন্য ক্বিরাত পড়তে হয়না।

قوله ويستحب له الخ : অর্থাৎ ইমাম মুসাফির ও মুক্তাদী মুকীম হলে নামাযের (শুরতে বা শেষে) তা জানিয়ে দেওয়া মুস্তাহাব।

قوله واذا دخل المسافر الخ : মুসাফির স্বীয় স্থায়ী বাসস্থান এলাকায় গমণ করা মাত্র মুকীম হয়ে যাবে। চাই যত অল্প সময়ের জন্যেই হোক ।

قوله من كان وطن الخ : বাসস্থান সাধারণতঃ তিন ধরণের হতে পারে যথা : (ক) وَطن اَصلِى বা স্থায়ী বাসস্থান। অর্থাৎ যে স্থানে স্বীয় পরিবার-পরিজন নিয়ে স্থায়ীরূপে বসবাস করা হয়। এরূপ বাসস্থান এলাকায় গমন মাত্র সফরের হুকুম বাতিল হয়ে যায়। (খ) وَطن اِقامت বা অস্থায়ী বাসস্থান। অর্থাৎ যেখানে চাকুরী ব্যবসা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে অস্থায়ীভাবে বাস করা হয়। এরূপ বাসস্থানে পনের দিনের কম থাকার নিয়ত থাকলে কছর পড়তে হবে। (গ) وَطن سُكنى সাময়িক বাসস্থান যেখানে সামান্য দু'চারদিন অবস্থানের নিয়ত করা হয়।

জ্ঞাতব্য : وَطن اِقامت তথা এমন সাময়িক বাসস্থান যেখানে বসবাসের জরুরী সামগ্রী নিয়ে বাস করা হয়। এর বিধানের ব্যাপারে দ্বিমুখী মত রয়েছে। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী পনের দিনের কম অবস্থানের নিয়ত থাকলে কছর পড়তে হবে। তবে পাকিস্তানের বিশিষ্ট মুফতী হযরত রশিদ আহমদ দামাত বারাকাতুহুম এর তাহকীক মতে যদি সেখানে বসবাসের সামগ্রী মজুদ থাকে তাহলে সেখানে পৌছান মাত্র মুকীম হয়ে যাবে। অতিরিক্ত জানার জন্য আহসানুল ফতোয়া দ্রষ্টব্য। (গ) বিবাহিতা মহিলারা স্বামী গৃহে অবস্থানের ব্যাপারে নিশ্চিত হলে এটাই তার মূল বাসস্থান ধর্তব্য।

قوله الجمع بين الصلوتين الخ : ওয়াক্তের দিকে দিয়ে একত্রে দুওয়াক্তের নামায আদায় করা জায়েয। অর্থাৎ যুহরের একেবারে শেষ মুহূর্তে যুহর এবং আছরের শুরু মূহূর্তে আছর। এটা জায়েয। আর একই ওয়াক্তে উভয় নামায আদায় করা দুরস্ত নয়। তবে হজ্জের সময় আরাফা ও মুযদালিফায় জায়েয বরং ওয়াজিব।

اَلتَّمرِين – (অনুশীলনী)

১। سفر এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ এবং শর্তাবলী কি?

২। মুসাফিরের বিধান কি? বিস্তারিত লিখ।

৩। মুসাফির ব্যক্তি মুকীমের পিছনে বা এর বিপরীত এক্তেদা করলে তার বিধান কি? বুঝিয়ে লিখ।

৪ চাকুরীরত বিদেশী মুসাফির ব্যক্তিগণ কর্মস্থলে (وَطن اِقامت) আসলে তার বিধান কি?

৫। وطن তথা আবাসস্থল মোট কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির বিধান লিখ।

بَابُ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ

لَاتَصِحُّ الْجُمُعَةُ اِلَّا فِىْ مِصْرٍ جَامِعٍ اَوْ فِىْ مُصَلَّى الْمِصْرِ وَلَا تَجُوْزُ فِى الْقُرٰى وَلَا تَجُوْزُ اِقَامَتُهَا اِلَّا لِلسُّلْطَانِ اَوْ لِمَنْ اَمَرَهُ السُّلْطَانُ وَمِنْ شَرَائِطِهَا اَلْوَقْتُ فَتَصِحُّ فِىْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَلَاتَصِحُّ بَعْدَهُ.

জুমআ'র নামায প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ জুমআ' কায়েমের শর্তাবলী ঃ ১. জনবহুল শহর অথবা শহরের ঈদগাহ ছাড়া জুমআ' সহীহ নয়। ২. গ্রামে জুমআ' সহীহ নয়। শাসক বা শাসকের নির্দেশিত (প্রতিনিধি) ছাড়া জুমআর জামাআ'ত কায়েম করা জায়েয নয়। ৩. জুমআ' সহীহ হওয়ার শর্তাবলীর মধ্য হতে আরেকটি হল সময় হওয়া। সুতরাং যুহরের ওয়াক্তে জুমআ' সহীহ হবে। এরপর সহীহ নয়।

প্রাসাঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله اَلْجُمُعَةُ জাহিলিয়্যাতের যুগে জুমআকে عَرُوْبَة বলা হত। কা'ব ইবনে লুওয়াই সর্বপ্রথম জুমআ'কে জুমাআ' নামকরণ করেন। এটা মূলত ঃ اِجْتِمَاع সমবেত হওয়া থেকে গৃহীত। এদিনে অসংখ্য কল্যাণ নিহিত থাকায় এ নামকরণ করা হয়েছে। কারো মতে এদিন আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ) কে সৃষ্টির উপাদান সমূহ একত্রিত করেন বিধায় এদিনকে জুমআ'র দিন বলে।

قوله لَاتَصِحُّ اَلْجُمُعَةِ الخ জুমআ সহীহ হওয়ার জন্য দু'ধরনের শর্ত রয়েছে। ওয়াজিব হওয়ার জন্যে ছয়টি ও আদায় হওয়ার জন্যে ছয়টি। নিম্নের শে'র দু'টিতে তা গ্রথীত হয়েছে। যথা–

حُرٌّ صَحِيْحٌ بِالْبُلُوْغِ مُذَكَّرٌ + مُقِيْمٌ وَذُوْعَقْلٍ لِشَرْطِ وُجُوْبِهَا–

وَمِصْرٌ وَسُلْطَانٌ وَوَقْتٌ وَخُطْبَةٌ + وَاِذْنٌ كَذَا جَمْعٌ لِشَرْطِ اَدَائِهَا–

قوله اِلَّافِيْ مِصْرٍجَامِعٍ الخ ঃ জনবহুল শহর ছাড়া জুমআ' সহীহ নয়। এমর্মে হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত لَايَصِحُّ جُمُعَةٌ وَلَاتَشْرِيْقٌ وَلَافِطْرَوَلَااَضْحٰى اِلَّافِىْ مِصْرٍجَامِعٍ অর্থাৎ জনবহুল শহর ছাড়া কোথাও জুমআ' তাকবীরে তাশরীক, ঈদুল ফিতির ও ঈদুল আযহা জায়েয নেই। একারণে ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে গ্রামে জুমআ' সহীহ নয়। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে গ্রামে ও জুমআ' ওয়াজিব।

শহর দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ (ক) ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে শহর দ্বারা এমন লোকালয় উদ্দেশ্য যেখানে শাসক, বিচারক বা তাদের প্রতিনিধি আছে। এবং নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু-সামগ্রী সহজলভ্য হয়। (খ) ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর অপর এক বর্ণনা মতে যে জনপদের অধিবাসী এ পরিমাণ হয় যে, তারা তথাকার বৃহৎ মসজিদে প্রবেশ করলে মসিজিদে স্থান সংকুলান হয়না। তা শহরের পর্যায়ে গণ্য। (গ) কারো মতে যেখানে শরয়ী সিদ্ধান্ত দেয়ার মত আলিম, শাসক, বিচারক ও বাজার থাকে তা শহর ধর্তব্য।

গ্রামে জুমআ আদায় ঃ قوله اَلْجُمُعَةُ فِى الْقُرٰى ঃ উপরোল্লিখিত শহরের সংখা বা ব্যাখ্যা অনুযায়ী বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল কে শহরের পর্যায়ে গণ্য করা হয়। কেননা এখানকার গ্রামগুলো অধিকাংশই পরস্পর সংযুক্ত অধিকবসতীপূর্ণ এবং সরকারী প্রতিনিধি যথা– মেম্বর বিচারক, ও দোকান পাট সমৃদ্ধ। এবং সামাজিক আচার-আচরণ ও নগর অধিবাসীগণের ন্যায়। উল্লেখ্য যে, এখানে গ্রাম দ্বারা এসকল সুযোগ-সুবিধাহীন যাযাবর, বেদুঈন জীবন যাপনকারী এলাকা উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে এর অস্তিত্ব বিরল।

وَمِنْ شَرَائِطِهَا اَلْخُطْبَةُ قَبْلَ الصَّلٰوةِ يَخْطُبُ الْاِمَامُ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِقُعْدَةٍ وَيَخْطُبُ قَائِمًا عَلَى الطَّهَارَةِ فَاِنِ اقْتَصَرَ عَلٰى ذِكْرِاللّٰهِ تَعَالٰى جَازَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تعالٰى وَقَالَا لَابُدَّ مِنْ ذِكْرٍ طَوِيْلٍ يُسَمّٰى خُطْبَةً فَاِنْ خَطَبَ قَاعِدًا اَوْ عَلٰى غَيْرِ طَهَارَةٍ جَازَ وَيُكْرَهُ ـ وَمِنْ شَرَائِطِهَا اَلْجَمَاعَةُ وَاَقَلُّهُمْ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلٰثَةٌ سِوَى الْاِمَامِ وَقَالَا اِثْنَانِ سِوَى الْاِمَامِ وَيَجْهَرُ الْاِمَامُ بِقِرَاءَتِهٖ فِى الرَّكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ فِيْهِمَا قِرَاءَةُ سُوْرَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَاتَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلٰى مُسَافِرٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مَرِيْضٍ وَلَا صَبِىٍّ وَلَا عَبْدٍ وَلَا اَعْمٰى فَاِنْ حَضَرُوْا وَصَلُّوْا مَعَ النَّاسِ اَجْزَأَهُمْ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ ـ وَيَجُوْزُ لِلْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ وَالْمَرِيْضِ اَنْ يَّؤُمُّوْا فِى الْجُمُعَةِ وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِىْ مَنْزِلِهٖ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْاِمَامِ وَلَاعُذْرَ لَهٗ كُرِهَ لَهٗ ذٰلِكَ وَجَازَتْ صَلٰوتُهٗ ـ

<u>অনুবাদ</u> ॥ ৪. আরেকটি শর্ত হল নামাযের পূর্বে খুৎবা প্রদান। ইমাম দু'খুৎবা দিবেন। এর মাঝে সামান্য বসার দ্বারা প্রভেদ করবেন। প্রবিত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে খুৎবা দান করবেন। ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে খুৎবাকে শুধু আল্লাহর যিকিরে সীমিত করা জায়েয। আর সাহেবাইন (র.) বলেন এমন দীর্ঘ আলোচনা হতে হবে যাকে খুৎবা (ভাষণ) অভিহিত করা যায়। বসে বা অপবিত্র অবস্থায় খুৎবা দিলে তা জায়েয তবে মাকরূহ হবে। ৫. জুমআ'র আরেক শর্ত হল জামাআ'ত হওয়া। আবু হানীফা (র.)-এর মতে এর সর্বনিম্ন সংখ্যা হল ইমাম ছাড়া তিন জন। সাহিবাইন (র.) বলেন ইমাম ছাড়া দু'জন। উভয় রাকাতে ইমাম উচ্চস্বরে ক্বিরাত পড়বেন। এর জন্য নির্দিষ্ট কোন সূরা নেই।

<u>যাদের ওপর জুমআ' ওয়াজিব নয় ঃ</u> মুসাফির, মহিলা, রুগ্নব্যক্তি নাবালেগ, ক্রীতদাস ও অন্ধের ওপর জুমআর নামায ওয়াজিব (ফরয) নয়। তবে তারা জুমআ'য় হাজির হয়ে নামায আদায় করলে যুহরের ফরয ওয়াক্তিয়ার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে।

<u>কতিপয় মাসায়েল ঃ</u> ১. ক্রীতদাস, মুসাফির ও রুগ্ন ব্যক্তির জন্যে জুমআর ইমামতী করা জায়েয। ২. জুমআ'র দিন কোন ব্যক্তি যদি ইমামের জুমআ' আদায়ের পূর্বে নিজ গৃহে যুহর আদায় করে নেয়। অথচ তার কোন ওযর নেই তাহলে তা মাকরূহ হবে। তবে নামায জায়েয হয়ে যাবে।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা</u> ॥ قوله عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ الخ ঃ অর্থাৎ জুমআ ফরয না হওয়া সত্বে কেউ আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে। যুহর পড়তে হবেনা। যেমন মুসাফির রমযানের রোযা রাখলে তার রোযা আদায় হয়ে যায়।

فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَحْضُرَ الْجُمُعَةَ فَتَوَجَّهَ إِلَيْهَا بَطَلَتْ صَلٰوةُ الظُّهْرِ عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِالسَّعْىِ إِلَيْهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَاتَبْطُلُ حَتّٰى يَدْخُلَ مَعَ الْإِمَامِ وَيُكْرَهُ أَنْ يُّصَلِّىَ الْمَعْذُورُ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَذَالِكَ أَهْلُ السِّجْنِ ـ وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلّٰى مَعَهُ مَاأَدْرَكَ وَبَنٰى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِى التَّشَهُّدِ أَوْ فِى سُجُوْدِ السَّهْوِ بَنٰى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ وَأَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى إِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَكْثَرَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَنٰى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَقَلَّهَا بَنٰى عَلَيْهَا الظُّهْرَ وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكَ النَّاسُ الصَّلٰوةَ وَالْكَلَامَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ وَقَالَا لَابَأْسَ بِأَنْ يَّتَكَلَّمَ مَالَمْ يَبْدَأْ بِالْخُطْبَةِ وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُوْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ تَرَكَ النَّاسُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَتَوَجَّهُوا إِلَى الْجُمُعَةِ فَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُوْنَ بَيْنَ يَدَىِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ يَخْطُبُ الْإِمَامُ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ ـ

অনুবাদ॥ অতঃপর যদি তার জুমআ'র নামাযে হাজির হওয়ার ইচ্ছে জাগে এবং মসজিদের দিকে যাত্রা শুরু করে তাহলে আবু হানীফা (র.) এর মতে কেবল এ যাত্রার দ্বারাই তার যুহর বাতিল হয়ে যাবে। আর সাহিবাইন (র.) বলেন ইমামের সাথে শরীক না হওয়া পর্যন্ত বাতিল হবেনা। ২. মাযুর ব্যক্তিদের জন্যে জুমআর দিনে যুহরের নামায জামাআতে পড়া মাকরূহ। তদরূপ কায়েদীদের জন্যেও। ৩. জুমআ'র দিন যে ব্যক্তি ইমামকে (জুমআ' আদায়রত) পেল সে যে পরিমাণই পাবে উক্ত পরিমাণই তার সাথে আদায় করবে। বাকী জুমআ'র ছুটে যাওয়া নামায উক্ত নামাযের ওপর ভিত্তি করে পড়ে নিবে। যদি তাশাহ্হুদ বা সাজদার মধ্যে পায় তাহলে শায়খাইনের মতে এর ওপরই জুমআর বেনা করবে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যদি দ্বিতীয় রাকাতের বেশীভাগে পায় তাহলে জুমআ'র বেনা করবে। অন্যথায় যুহরের বেনা করে যুহর আদায় করবে। ৪. জুমআ'র নামাযের জন্যে ইমাম বের হলে মুসল্লীরা তার খুৎবা হতে ফারেগ না হওয়া পর্যন্ত নামায ও কথাবার্তা পরিহার করবে। সাহিবাইন (র.) বলেন খুৎবা শুরু না করা পর্যন্ত (নামায) দোষণীয় নয়। ৫. মুয়াযযিন জুমআ'র প্রথম আযান দিশে মানুষেরা বেচা-কেনা পরিহার করবে। এবং জুমআ'র জন্য রাওনা করবে। ৬. অতঃপর ইমাম মিম্বরে আরোহণ করে বসবেন। আর মুয়াযযিনগণ মিম্বর বরাবর দাঁড়িয়ে আযান বলবে। এরপর ইমাম খুৎবা দিবেন এবং খুৎবা শেষ হলে নামায আদায় করবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ ঃ এটা শহরের ক্ষেত্রে মাকরূহে তাহরীমী। অবশ্য গ্রামে যাদের ওপর জুমআ' ফরয নয় তাদের জন্যে যুহরের নামায জামাআ'তে পড়া মাকরূহ নয়। জামাতে পড়া মাকরূহ হওয়ার কারণ এই যে, এতে জুমআ'র জামাআতের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অজানা মানুষ তাদের সাথে এক্তেদা করতে পারে, উপরন্ত দু' নামাযের মধ্যে বাহ্যিক সংঘর্ষ বা تَعَارُضْ সৃষ্টিহয়।

قوله إِذَاخَرَجَ الْإِمَامُ الخ ঃ আবু হানীফা (র.)-এর মতে ইমামের হুজরা মসজিদ সংলগ্ন হলে হুজরা হতে বের হওয়ার সাথে সাথে নামায, কথা-বার্তা, তাসবীহ আদায় সব পরিত্যাগ করবে। আর পূর্বেই নামায শুরু করে থাকলে তা শিঘ্র সম্পন্ন করে নিবে। এভাবে কারো তারতীব (ক্রমধারা) মোতাবেক কাযা নামায থাকলে তা আদায় করে নিবে। উল্লেখ্য যে, ইমামের খুৎবার সময় দানবাক্স চালু করা এবং তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায পড়াও মাকরূহ। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়তে হবে। কেননা হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত যে, খুৎবা দান কালে জনৈক ব্যক্তি মসজিদে হাজির হল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়েছে কিনা প্রশ্ন করলেন। সে উত্তরে "না" বললে তিনি তাকে দু'রাকাত নামায পড়ার নির্দেশ দেন। হানাফীগণের দলীল হুজুর (সা.) এর বাণী إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ "তুমি তোমার সাথীকে চুপ কর বললে ও তুমি অন্যায় করলে।" সুতরাং আমর বিল মা'রুফ যা নফল নামায হতে উত্তম যখন নিষিদ্ধ, সুতরাং নামায আরো আগেই নিষিদ্ধ হবে। আর উপরের হাদীসের উত্তর এইযে, সম্ভবত রাসূল (সা.) তখন নীরব ছিলেন। তাছাড়া ঐ ব্যক্তির জন্য পরে উপস্থিত সবার নিকট হতে আর্থিক সাহায্য কামনা করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যেই তাকে আগে দাঁড় করিয়ে তার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

قوله وَإِذَا أَذَّنَ الخ ঃ জুমআ'র আযানের সাথে সাথে নামাযের প্রস্তুতি নেয়া ওয়াজিব এবং দুনিয়াবী কার্য হারাম। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে– إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

যখন জুমআ'র আযান দেওয়া হয় তোমরা দ্রুত আল্লাহর যিকিরের প্রতি ছুটে এসো এবং বেচা-কেনা পরিহার কর। উল্লেখ্য যে, এ আযান দ্বারা খুৎবার পূর্বের আযান উদ্দেশ্য।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। جُمُعَةٌ অর্থ কি? জুমআর পূর্বের নাম কি ছিল? কে সর্ব প্রথম এ নামকরণ করে? এদিনকে জুমআ নামকরণের হেতু কি?

২। জুমআ ওয়াজিব ও আদায় সহীহ হওয়ার জন্যে শর্ত কয়টি? সংক্ষেপে লিখ।

৩। مِصْرِ جامع কাকে বলে? বিস্তারিত আলোকপাত কর।

৪। وَلَا تَجُوْزُ (الْجُمُعَةُ) فِي الْقُرٰى কথাটির বিশদ ব্যাখ্যা কর।

৫। কার কার ওপর জুমআ ওয়াজিব নয়? বর্ণনা কর।

৬। গোলাম ও মুসাফিরের জন্য জুমআর ইমামতী সহীহ কিনা? লিখ।

৭। কেউ জুমআর দিন যুহর আদায়ের পর জুমআর জন্যে গমন করলে তার যুহরের নামাযের ব্যাপারে হুকুম কি? মতান্তর সহ লিখ।

৮। জুমআর নামাযে কেউ তাশাহ্হুদ কালে এক্তেদা করলে তার হুকুম কি? বিস্তারিত লিখ।

بَابُ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ

يُسْتَحَبُّ يَوْمَ الْفِطْرِ اَنْ يَّطْعَمَ الْاِنْسَانُ شَيْئًا قَبْلَ الْخُرُوْجِ اِلَى الْمُصَلّٰى وَيَغْتَسِلَ وَيَتَطَيَّبَ وَيَلْبَسَ اَحْسَنَ ثِيَابِهٖ وَيَتَوَجَّهَ اِلَى الْمُصَلّٰى وَلَا يُكَبِّرُ فِيْ طَرِيْقِ الْمُصَلّٰى عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيُكَبِّرُ عِنْدَهُمَا وَلَا يَتَنَفَّلُ فِي الْمُصَلّٰى قَبْلَ صَلٰوةِ الْعِيْدِ فَاِذَا حَلَّتِ الصَّلٰوةُ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ دَخَلَ وَقْتُهَا اِلَى الزَّوَالِ فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ وَقْتُهَا وَيُصَلِّي الْاِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الْاُوْلٰى تَكْبِيْرَةَ الْاِحْرَامِ وَثَلٰثًا بَعْدَهَا ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً مَعَهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَةً يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَبْتَدِأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ فَاِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ ثَلٰثَ تَكْبِيْرَاتٍ وَكَبَّرَ تَكْبِيْرَةً رَابِعَةً يَرْكَعُ بِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ۔ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلٰوةِ خُطْبَتَيْنِ يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيْهَا صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاَحْكَامَهَا وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةُ الْعِيْدِ مَعَ الْاِمَامِ لَمْ يَقْضِهَا فَاِنْ غُمَّ الْهِلَالُ عَنِ النَّاسِ وَشَهِدُوْا عِنْدَ الْاِمَامِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّى الْعِيْدَ مِنَ الْغَدِ فَاِنْ حَدَثَ عُذْرٌ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلٰوةِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِيْ لَمْ يُصَلِّهَا بَعْدَهٗ۔

ঈদের নামায

অনুবাদ॥ ঈদুল ফিতরের দিন মুস্তাহাব ও মাকরূহ কার্যসমূহ ঃ ১. ঈদুল ফিতরের দিবসে মুস্তাহাব হল ঈদগায়ে যাওয়ার পূর্বে কিছু আহার করা, গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, নিজ উত্তম পোষাক পরিধান করে ঈদগায় রওনা হওয়া। ২. আবু হানীফা (র.) এর মতে পথিমধ্যে তাকবীর (উচ্চস্বরে) বলবেনা। সাহিবাইন (র.) এর মতে তাকবীর (উচ্চস্বরে) পড়বে। ৩. ঈদের নামাযের পূর্বে ঈদগায় কোন নফল নামায পড়বেনা। ৪. সূর্য কিছুটা উপরে উঠার পর যখন নামায পড়া জায়েয তখন হতে ঈদের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়ে সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওয়াক্ত থাকে। সূর্য হেলে গেলে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়।

ঈদের নামাজ পড়ার নিয়ম ঃ ইমাম মুসল্লীগণকে নিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করবেন। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমার পর আরো তিনবার তাকবীর বলবেন। অতঃপর সূরায়ে ফাতেহা ও এর সঙ্গে অপর একটি সূরা পড়বেন। এরপর তাকবীর বলে রুকু করবেন। দ্বিতীয় রাকাত কে ক্বিরাত (সূরায়ে

ফাতেহা ও অপর সূরা) দ্বারা শুরু করবেন। ক্বিরাত হতে ফারেগ হয়ে তিনবার তাকবীর বলবেন। চতুর্থবার তাকবীর বলে রুকু করবেন এবং উভয় ঈদের তাকবীরে হাত উঠাবেন। অতঃপর নামাযের পরে দু'খুৎবা দান করবেন। খুৎবার মধ্যে মানুষ কে সাদকায়ে ফিতর ও এর বিধান শিক্ষা দিবেন।

কতিপয় মাসায়েল ঃ ১. কারো ইমামের সাথে নামায ছুটে গেলে তার কাযা পড়বেনা। ২. যদি মানুষে ঈদের চাঁদ না দেখে পরদিন সূর্য হেলে যাওয়ার পর কিছু মানুষ ইমামের কাছে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় তাহলে পরদিন ঈদের নামায পড়বে। যদি এমন বিশেষ কোন ওযর দেখা দেয় যা দ্বিতীয় দিন নামায আদায়ের প্রতিবন্ধক তাহলে পরে আর ঈদের নামায পড়বেনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ ঈদের পটভূমি ঃ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজরত করে মদীনায় আগমনের পর যখন দেখলেন তাদের খেলা-ধুলা ও আনন্দ উৎসবের জন্যে বৎসরে দু'দিন বিশেষ ভাবে নির্ধারিত। তখন তিনি ইরশাদ করলেন- আল্লাহ তোমাদের জন্যে এর চেয়ে উত্তম দুটি দিন প্রতিদান স্বরূপ দান করেছেন-তা হল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। (আবূ দাউদ, নাসায়ী।) প্রতিবৎসর উভয় ঈদের দিনে আল্লাহর তরফ হতে তাঁর অনুগত বান্দাগণের প্রতি বিশেষ করুণা, ও পুরস্কার অবতীর্ণ হয়। প্রতি বৎসর ঘুরে ঘুরে সবার জন্যে আনন্দ ও খুশী বয়ে আনে ধরার বুকে। হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা ভুলে যেয়ে ধনী-নির্ধন নির্বিশিষে সকলে এক কাতারে সারিবদ্ধ হয়ে স্রষ্টার দরবারে প্রাণ উজাড় করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। মনের সকল আকুতী মিনতি পেশ করে। আর স্রষ্টার থেকে লাভ করে সমূহ পাপরাশি ক্ষমার প্রতিশ্রুতি। সুতরাং এমন দিনটি আনন্দের নয়তো কি? বৎসরান্তে দুবার এদিন প্রত্যাবর্তন করে বিধায় একে ঈদ বলা হয়। এটা মূলত ঃ عَوْدٌ (প্রত্যাবর্তন করা) শব্দ হতে গঠিত।

ঈদুল ফিতরের মুস্তাহাব সমূহ ঃ **قوله وَيُسْتَحَبُّ الخ** ঃ ঈদুল ফিতরের দিনে মোট ১২টি কার্য মুস্তাহাব। মুসান্নিফ (র.), তন্মধ্য হতে ৪টি উল্লেখ করেছেন। বাকী গুলো হল ৫. মেসওয়াক করা। ৬ সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা, ৭. পাগড়ী বাঁধা, ৮, সকাল সকাল উঠা, ৯, সকালেই ঈদগায় গমন করা। ১০, মহল্লার মসজিদে ফজরের নামায পড়া, ১১. পদব্রজে ঈদগায় যাওয়া. ও ১২. এক রাস্তায় যাওয়া ও অপর রাস্তায় আসা।

قوله وَلَا يُكَبِّرُ الخ ঃ ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে ঈদুল ফিতরে পথিমধ্যে তাকবীর বলবেনা। আর সাহিবাইনের মতে আস্তে আস্তে বলবে। অপর এক বর্ণনামতে ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে আস্তে তাকবীর বলবে। আর সাহিবাইনের মতে উচ্চস্বরে বলবে। বাদায়ে, সিরাজী, তাতারখানিয়া প্রভৃতিতে এ মতটি গৃহীত হয়েছে। এবং এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও ফতোয়া যোগ্য।

قوله وَلَا يَتَنَفَّلُ الخ ঃ উল্লেখ্য যে, ঈদের দিন সকালে নফল শুধু ঈদগাতেই নয় বরং ঘরে পড়াও মাকরূহ।

ঈদের তাকবীর ঃ **قوله وثلثا بعدها** ঃ ঈদের নামাযের তাকবীরের ব্যাপারে বারটি অভিমত রয়েছে। ইমাম মালেক ও আহমদ (র.) এর মতে প্রথম রাকাতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ তাকবীর। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে অতিরিক্ত তাকবীর বারটি। তাকবীরে তাহরীমা ও দ্বিতীয় রাকাতের রুকুর তাকবীর ছাড়া। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে প্রত্যেক রাকাতে অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর বর্ণিত হাদীসে এটাই উল্লিখিত হয়েছে। সনদের দিক দিয়ে এ হাদীসটিই সর্বাধিক শক্তিশালী।

قوله صَدَقَةَ الْفِطْرِ الخ ঃ অর্থাৎ সাদকায়ে ফিতর কি? কার ওপর ওয়াজিব? কখন ওয়াজিব? কতটুকু ওয়াজিব? কোন্ বস্তু ওয়াজিব ? এ পাঁচ বিষয় শিক্ষা দিবে। উল্লেখ্য যে, জুমআর খুৎবায় যা সুন্নত বা মাকরূহ ঈদের খুৎবায় ও সে সব বস্তু সুন্নাত বা মাকরূহ। কেবল দুদিক দিয়ে পার্থক্য (এক) জুমআ'র খুৎবা নামাযের পূর্বে আর ঈদের খুৎবা পরে,(দুই) জুমআ'র খুৎবার শুরুতে বসা সুন্নত। ঈদের খুৎবায় এটা সুন্নত নয়।

وَيُسْتَحَبُّ فِىْ يَوْمِ الْاَضْحٰى اَنْ يَّغْتَسِلَ وَيَتَطَيَّبَ وَيُؤَخِّرَ الْاَكْلَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلٰوةِ وَيَتَوَجَّهُ اِلَى الْمُصَلّٰى وَهُوَ يُكَبِّرُ وَيُصَلِّى الْاَضْحٰى رَكْعَتَيْنِ كَصَلٰوةِ الْفِطْرِ وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيْهَا الْاُضْحِيَّةَ وَتَكْبِيْرَاتِ التَّشْرِيْقِ فَاِنْ حَدَثَ عُذْرٌ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْاَضْحٰى صَلَّاهَا مِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَلَا يُصَلِّيْهَا بَعْدَ ذٰلِكَ وَتَكْبِيْرُ التَّشْرِيْقِ اَوَّلُهٗ عَقِيْبَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاٰخِرُهٗ عَقِيْبَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ مِنْ اٰخِرِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَالتَّكْبِيْرُ عَقِيْبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوْضَاتِ" اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ -

---

অনুবাদ ॥ ঈদুল আযহার মুস্তাহাব সমূহ ও অন্যান্য মাসায়েল ঃ ১. ঈদুল আযহার দিন মুস্তাহাব হল– (১) গোসল করা, (২) সুগন্ধি লাগান। (৩) ঈদের নামায হতে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত আহার বিলম্ব করা। (৪) তাকবীর পড়তে পড়তে ঈদগায় গমন করা। ২. ঈদুল ফিতরের ন্যায় ঈদুল আযহার নামাযও দু'রাকাত। নামাযের পরে দুখুৎবা প্রদান করবে। এর মধ্যে মানুষকে কুরবানী ও তাকবীর সংক্রান্ত মাসায়েল শিক্ষা দিবে ৩. যদি ঈদের দিন নামাযের প্রতিবন্ধক কোন ওযর দেখা দেয় তাহলে পরবর্তী দিন বা তার পরবর্তী দিন নামায আদায় করবে। এর পরে আর পড়বেনা। ৪. তাকবীরে তাশরীক পড়ার সময় শুরু হয় আরাফার দিন (৯ই জিলহাজ্জ) ফজর হতে। আর শেষ হয় আবূ হানীফার (র.) এর মতে কুরবানীর দিন। তথা ১ তারিখের আসরের নামায পর্যন্ত। আর সাহিবাইনের মতে আইয়ামে তাশরীক (১৩ তারিখ) এর আসর পর্যন্ত। তাকবীর সকল ফরয নামাযের পর এভাবে পড়তে হয়- "আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর, ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ।"

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله تَكْبِيْرُ التَّشْرِيْقِ ঃ সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব। তাহল ৯ তারীখের ফজর হতে ১৩ তারীখের আসর পর্যন্ত।

قوله عَقِيْبَ الصَّلَوَاتِ ঃ সাহিবাইনের মতে তাকবীরে তাশরীক ফরযের তাবে'বা অনুগত। সুতরাং যার ওপর নামায ফরয তার ওপর তাকবীর পড়া ওয়াজিব। চাই মুসাফির হোক বা মুকীম, পুরুষ হোক বা মহিলা। এ কথার ওপরই ফতোয়া।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। عيد অর্থ কি? ঈদের নামায সূচনা ও গুরুত্ব সম্পর্কে যা জান লিখ।

২। ঈদুল ফিতিরের দিন মুস্তাহাব আমল কি কি? সুন্দর করে লিখ।

৩। ঈদের নামাযের অতিরিক্ত মুস্তাহাব কয়টি ও কি কি?

৪। ঈদুল আযহার দিন মুস্তাহাব কয়টি ও কি কি?

৫। তাকবীরে তাশরীক কি? কার ওপর ওয়াজিব ও সময়সীমা কি? লিখ।

بَابُ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

اِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الْاِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ كَهَيْئَةِ النَّافِلَةِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوْعٌ وَاحِدٌ وَيُطَوِّلُ الْقِرَاءَةَ فِيْهِمَا وَيُخْفِىْ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَجْهَرُ ثُمَّ يَدْعُوْ بَعْدَهَا حَتّٰى تَنْجَلِىَ الشَّمْسُ وَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْاِمَامُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ بِهِمُ الْجُمُعَةَ فَاِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْاِمَامُ صَلَّهَا النَّاسُ فُرَادٰى وَلَيْسَ فِىْ خُسُوْفِ الْقَمَرِ جَمَاعَةٌ وَاِنَّمَا يُصَلِّىْ كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهٖ وَلَيْسَ فِى الْكُسُوْفِ خُطْبَةٌ -

সূর্য গ্রহণের নামায

অনুবাদ ॥ ১. সূর্য গ্রহণ হলে ইমাম মানুষগণ কে নিয়ে নফল নামাযের ন্যায় দু'রাকাত নামায পড়বেন। প্রতি রাকাতে একটি রুকু করবেন। উভয় রাকাতে লম্বা ক্বিরাত পড়বেন। আবু হানীফা (র.) এর মতে আস্তে ক্বিরাত পড়বেন। সাহিবাইন (র.) এর মতে উচ্চস্বরে পড়বেন। অতঃপর সূর্য প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত দোয়া করবেন। যে ইমাম জুমআ'র নামায পড়ান তিনিই লোকজন নিয়ে এ নামায পড়াবেন। ইমাম উপস্থিত না থাকলে নিজেরা একাকী নামায পড়বে। চন্দ্র গ্রহণের নামাজে জামাআ'ত নেই। রবং প্রত্যেকেই নিজে নিজে নামায পড়বে। সূর্য গ্রহণের নামাযে খুৎবা প্রমাণিত নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله اِذَا انْكَسَفَتْ الخ ঃ আল্লাহ পাকের মহাশক্তির দৃষ্টান্তের মধ্য হতে চন্দ্র গ্রহণ ও সুর্য গ্রহণ অপার শক্তির নিদর্শন বহন করে। আর এ কারণেই নবীজী (সা,) চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় সাথে সাথে ছুটে গেছেন নামাযের দিকে। অস্বাভাবিক ও মহা দূর্যোগপূর্ণ সকল ক্ষেত্রে এটাই করণীয় বিশ্ব মুসলিমের জন্যে।

قوله فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوْعٌ الخ ঃ রাসূল (সা.) জীবনে একবারই মাত্র এ নামায আদায় করেছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো একবারের এই নামাযে রুকুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাহাবী হতে বিভিন্নরূপ বর্ণনা এসেছে। প্রতি রাকাতে ১হতে ১০রুকু পর্যন্ত বর্ণিত আছে। মূলত ঃ নামাযে রুকু অতি দীর্ঘ হওয়ায় পিছনের নামাযীরা সম্ভবত সামনের অবস্থা দেখার জন্য মাথা উঁচু করেছেন। তাদের দেখাদেখি কেউ কেউ তাদের অনুসরণ করেছেন, আর সামনের নামাযীদিগকে রুকুর মধ্যে দেখে পূণরায় রুকুতে গেছেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় এরূপ করেছেন। এরূপ করার ফলে পিছনের বর্ণনা কারীগণ একাধিক রুকুর বর্ণনা করেছেন। আর সামনের মুসল্লীগণ একই রুকুর বর্ণনা করেছেন। হানাফীগণ এযুক্তির আলোকে এবং অন্যান্য সকল নামাযের উপর কিয়াস করে প্রতি রাকাতে একই রুকু করার বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক (র.) দু'রুকুর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

قوله وَيُخْفِىْ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ الخ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.) এর মতে উভয় রাকাতে আস্তে কিরাত পড়বে। সাহিবাইন (র.) এর মতে উচ্চস্বরে কিরাত পড়বে।

قوله كَهَيْئَةِ النَّافِلَةِ ঃ অর্থাৎ অন্যান্য নফলের ন্যায় আযান ইকামত ছাড়া পড়বে। তবে অন্য উপায়ে ডাকাডাকি বা প্রচার করার অনুমতি আছে।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। صَلٰوةُ الْكُسُوْفِ কাকে বলে? এর নিয়ম কি? বিশদভাবে আলোচনা কর।

بَابُ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَيْسَ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ صَلٰوةٌ مَسْنُوْنَةٌ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنْ صَلَّى النَّاسُ وُحْدَانًا جَازَ وَاِنَّمَا الْاِسْتِسْقَاءُ اَلدُّعَاءُ وَالْاِسْتِغْفَارُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يُصَلِّى الْاِمَامُ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالدُّعَاءِ وَيُقَلِّبُ الْاِمَامُ رِدَاءَهٗ وَلَا يُقَلِّبُ الْقَوْمُ اَرْدِيَتَهُمْ وَلَا يَحْضُرُ اَهْلُ الذِّمَّةِ لِلْاِسْتِسْقَاءِ ـ

এস্তেসক্বার নামায

অনুবাদ ॥ ১. আবু হানীফা (র.) বলেন– এস্তসক্বা তথা বৃষ্টি কামনার জন্যে জামাআতবদ্ধ হয়ে নামায আদায়ের বিধান নেই। তবে মানুষে একাকীভাবে পড়লে জায়েয আছে। এস্তেসক্বা মূলতঃ দোয়া ও এস্তেগফার। ২. ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন– ইমাম (জন সাধারণ কে নিয়ে) দু'রাকাত নামায পড়বেন। উভয় রাকাতে উচ্চস্বরে কিরাত পড়বেন। অতঃপর খুৎবা পড়বেন এবং কেবলামুখী হয়ে দোয়া করবেন। ইমাম স্বীয় চাদর উলটিয়ে পরবেন এবং কেবলামুখী হয়ে দোয়া করবেন। এস্তেসকার নামাযে জিম্মিরা উপস্থিত হবেনা।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اِسْتِسْقَاءِ বৃষ্টি কামনা। مَسْنُوْن সুন্নত। وُحْدَانًا পৃথক পৃথকভাবে। يُقَلِّبُ উল্টাবে। পরিবর্তন করবে। رِدَاءٌ চাদর। বহু ঃ اَرْدِيَةٌ- اَهْلُ الذِّمَّةِ জিম্মীগণ, যেসব বিধর্মীরা মুসলিম শাসককে কর দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله اَلْاِسْتِسْقَاءُ ঃ বৃষ্টি কামনার জন্য নামায পড়া এ উম্মতের বৈশিষ্ট। এ নামায মূলত ঃ ২য় হি ঃ সনে সূচিত হয়। রাসূল (সা.) এর পরে খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য উম্মৎ হতে এ নামাযের রীতি চলে আসছে।

قوله قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رح ঃ এস্তেসক্বার নামায সুন্নত কিনা? এব্যাপারে ইমাম আবু ইউসূফ (র.) ইমাম সাহেব (র.) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, জামাআতবদ্ধ হয়ে নামায নয়। এটা মূলতঃ দোয়া ও এস্তেগফার। তবে মানুষে একাকী এ ভাবে পড়লে তা জায়েয। এ ঘটনার দ্বারা এ নামায সুন্নত বা মুস্তাহাব হওয়া প্রমাণিত হয়না। তবে দুররে মুখতার রচয়িতা লিখেন এর দ্বারা জামাআতবদ্ধ হয়ে পড়া সুন্নত না হওয়া বুঝায় মাত্র।

قوله يُقَلِّبُ الْاِمَامُ الخ ঃ ইমাম আবু ইউসূফ, মুহাম্মদ, ইমাম শাফেয়ী, আহমদও মালেক (র.) এর মতে ইমামের জন্য স্বীয় চাদর বা রুমাল উলটিয়ে গায়ে দেয়া সুন্নত। রাসূল (সা.) হতে এর প্রমাণ রয়েছে। চাদর উল্টানোর পদ্ধতি হল– উভয় হাত পিছনে নিয়ে ডান হাত দ্বারা বাম পার্শ্বের ও বাম হাত দ্বারা ডান পার্শ্বের নীচের কোণা ধরে ঘুরিয়ে ডান পার্শ্ব বাম দিকে ও বাম পার্শ্ব ডান কাঁধে আনবে। এটা মূলত ঃ অবস্থার পরিবর্তন তথা কুলক্ষণ কে সুলক্ষনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত বুঝায়।

قوله وَلَا يَحْضُرُ اَهْلُ الذِّمَّةِ ঃ কাফের মুশরেকরা যেহেতু আল্লাহর নাফরমান। সুতরাং তাদিগকে সঙ্গে নিয়ে দোয়া কামনা করা কবুলিয়াতের পরিপন্থী হওয়ার আশংকা রাখে। তবে ইমাম মালেক (র.) এর মতে তারা উপস্থিত হলে তাড়িয়ে দেয়া উচিত হবেনা।

بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَّجْتَمِعَ النَّاسُ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَيُصَلِّىْ بِهِمْ إِمَامُهُمْ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ فِىْ كُلِّ تَرْوِيْحَةٍ تَسْلِيْمَتَانِ وَيَجْلِسُ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيْحَتَيْنِ مِقْدَارَ تَرْوِيْحَةٍ ثُمَّ يُوْتِرُ بِهِمْ وَلَا يُصَلِّى الْوِتْرَ بِجَمَاعَةٍ فِىْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ -

তারাবীহ নামায

অনুবাদ ॥ ১. রমাযান মাসে মুসল্লীগণের জন্য ইশার নামাযের পর সমবেত হওয়া মুস্তাহাব। ইমাম মুক্তাদিগকে নিয়ে পাঁচ তারবীহা নামায আদায় করবেন। প্রতি তারবীহাতে দু'বার সালাম ফিরাতে হয়। দু'তারবীহার মাঝে এক তারবীহা পরিমাণ বসবে। ২, অতঃপর জামাতের সহিত বিত্র আদায় করবে। রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসে জামাতে বিত্র পড়বেনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله قِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ঃ কিয়ামে রমাযান দ্বারা তারাবীহ নামায উদ্দেশ্য। এ মর্মে রাসূল (সা.) ফরমায়েছেন– إِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ "আল্লাহ তোমাদের ওপর রমাযানের রোযা ফরয করেছেন। আর আমি তোমাদের জন্যে তারাবীহ কে সুন্নত করলাম"।

তারাবীহ সম্পর্কে মতভেদ ঃ قوله خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ- تَرْوِيْحَةٌ এর বহুঃ অর্থ বিশ্রাম গ্রহণ, প্রতি দু'রাকাতে এক তারবীহা হয়। প্রতি চার রাকাতের পর দু'রাকাত পরিমাণ বসে বিশ্রাম নেয়া মুস্তাহাব। বিধায় এ নামায কে তারাবীহ নামায বলে। উল্লেখ্য যে, তারাবীহ নামাযের রাকাতের ব্যাপারে ৪১, ৪০, ৩৮, ৩৬, ৩৪, ২৮, ও ২০ রাকাতের বর্ণনা পাওয়া যায়। জমহুর তথা সংখ্যা গরিষ্ঠ আলিম যথা ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ প্রমূখ (র.) বিশ রাকাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বস্তুতঃ হযরত উমর (রা.) এর আমল হতে রীতিমত বিশ রাকাত জামাতবদ্ধ হয়ে খতমে কুরআন সহপড়া শুরু হয়। সকল সাহাবী বিনা বাক্য ব্যয়ে এতে শরীক হন। আর সাহাবীদের আমল ও যেহেতু উম্মতের জন্য সুন্নত। একারণে বিশ রাকাতই সুন্নতে মুয়াক্কাদারূপে স্থির পায়।

قوله وَلَا يُصَلِّى الْوِتْرَ الخ ঃ নাওয়াযিল কিতাবের ভাষ্য মতে রমাযান ছাড়াও বিতির নামায জামাতে পড়া জায়েয, তবে মুস্তাহাব নয়। সুতরাং এখানে لَا يُصَلِّىْ দ্বারা মাকরূহ না হওয়া উদ্দেশ্য।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। تَرَاوِيْح এর অর্থ কি এবং উহার হুকুম কি? বর্ণনা কর।

২। تَرَاوِيْح নামাযর কত রাকাত এবং কোন্ সময় হতে সূচনা হয়েছে ? বিস্তারিত লিখ।

بَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ

إِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ جَعَلَ الْإِمَامُ النَّاسَ طَائِفَتَيْنِ طَائِفَةً إِلٰى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَطَائِفَةً خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِهٰذِهِ الطَّائِفَةِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مَضَتْ هٰذِهِ الطَّائِفَةُ إِلٰى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ تِلْكَ الطَّائِفَةُ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُسَلِّمُوا وَذَهَبُوا إِلٰى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُوْلٰى فَصَلُّوا وُحْدَانًا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَتَشَهَّدُوا وَسَلَّمُوا وَمَضَوْا إِلٰى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرٰى وَصَلُّوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ بِقِرَاءَةٍ وَتَشَهَّدُوا وَسَلَّمُوا فَإِنْ كَانَ مُقِيْمًا صَلّٰى بِالطَّائِفَةِ الْأُوْلٰى رَكْعَتَيْنِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُوْلٰى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً وَلَا يُقَاتِلُوْنَ فِي حَالِ الصَّلٰوةِ فَإِنْ فَعَلُوا ذٰلِكَ بَطَلَتْ صَلٰوتُهُمْ وَإِنِ اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوا رُكْبَانًا وُحْدَانًا يُؤْمُوْنَ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ إِلٰى أَيِّ جِهَةٍ شَاءُوا إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى التَّوَجُّهِ إِلَى الْقِبْلَةِ -

---

ভয়কালীন নামায

অনুবাদ॥ ১. শত্রুর (আক্রমনের) প্রবল আশংকা থাকলে ইমাম লোকজনকে দু'ভাগে বিভক্ত করবেন। একভাগ শত্রুর মোকাবেলায় থাকবে, অপর দল থাকবে ইমামের পেছনে (নামাযে)। এদল নিয়ে তিনি দু'সাজদায় এক রাকাত নামায পড়বেন। দ্বিতীয় সাজদা হতে মাথা উত্তোলন করলে এ দলটি শত্রু সম্মুখে যাবে। আর ঐ দলটি আসলে ইমাম তাদিগকে নিয়ে দু' সাজদায় এক রাকাত নামায আদায় করবেন। এবং তাশাহ্হুদ পড়বেন ও সালাম ফিরাবেন। কিন্তু মুক্তাদিরা সালাম ফিরাবেনা। তারা শত্রুর মোকাবেলায় গমন করবে। আর প্রথম দল এসে এক রাকাত দু'সাজদার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন আদায় করে নিবে। ক্বিরাত পড়বেনা। শেষে তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। অতঃপর শত্রুর মোকাবেলায় যাবে। আর দ্বিতীয় দল এসে দু'সাজদার মাধ্যমে ক্বিরাত সহকারে এক রাকাত নামায পড়বে এবং তাশাহহুদ পড়বে ও সালাম ফিরাবে। ২. ইমাম যদি মুকীম হন, তাহলে প্রথম দলকে নিয়ে দু'রাকাত পড়বেন আর দ্বিতীয় দল নিয়ে দু'রাকাত পড়বেন। ৩. মাগরিবের নামাযে প্রথম দলকে নিয়ে পড়বেন দু'রাকাত আর দ্বিতীয় দলকে নিয়ে পড়বেন এক রাকাত। ৪. নামাযরত অবস্থায় যুদ্ধে লিপ্ত হবেনা। (বরং সামনে টহল দিবে।) যুদ্ধে লিপ্ত হলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। ৫. শত্রুর ভয় আরো তিব্র হলে সোয়ার অবস্থায় যার যার মত নামায আদায় করে নিবে। ক্বিবলামুখী হওয়া সম্ভব না হলে যে দিক ফিরেই হোক ইশারায় রুকু সাজদা করবে।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা</u> ॥ قوله صَلٰوةُ الْخَوْفِ ঃ নামায এমনি গুরুত্বপূর্ণ একটি রোকন যা হুস থাকা পর্যন্ত কোন ক্ষেত্রেই মাফ নেই। প্রবল ভয় ভীতির পরিস্থিতিতে ও তা আদায় করতে হবে, তবে ওযর বশতঃ নামায়ের পদ্ধতির শধ্যে শীথিলতা আছে। তাছাড়া জামাআতে নামায আদায় ও যে কত গুরুত্ব রাখে তাও এর দ্বারা কিছুটা অনুমান করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বহুবার (৪-২৪ বার) এবং পরবর্তীতে বহু সাহাবী হতে এ নামায বিভিন্ন পদ্ধতিতে পড়া প্রমাণিত রয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে খন্দক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) নামায কাযা করলেন কেন? এর উত্তর এইযে, এটা উক্ত ঘটনার পর হতে জায়েয হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এ নামায সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা এসেছে।

নবীজী (সা.) এর পরে এ নামায জায়েয রয়েছে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেননা এতে বহু আমলে কাছীর (যা নামায ভঙ্গের কারণ) রয়েছে। উপরন্তু রাসূল (সা.) এর বর্তমানে অন্য কেউ ইমামতী করতে পারত না। এসব কারণে ইমাম মালেক (র.) এর মতে এটা রাসূল (সা.)-এর জন্যে খাছ ছিল। হানাফীগণের মতে সর্বকালের জন্যে এ হুকুম বলবৎ। কারণ সাহাবায়ে কেরাম হতে এর উপর আমল বিদ্যমান রয়েছে।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। صَلٰوةُ الْخَوْفِ এর নিয়ম কি? বর্ণনা দাও।
২। বর্তমান صَلٰوةُ الْخَوْفِ এর এ পদ্ধতি বলবৎ আছে কি না? লিখ।

بَابُ الْجَنَائِزِ

إِذَا احْتُضِرَ الرَّجُلُ وُجِّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَلُقِّنَ الشَّهَادَتَيْنِ وَإِذَا مَاتَ شَدُّوا لِحْيَتَهُ وَغَمَضُوا عَيْنَيْهِ فَإِذَا أَرَادُوا غَسْلَهُ وَضَعُوهُ عَلَى سَرِيرٍ وَجَعَلُوا عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً وَنَزَعُوا ثِيَابَهُ وَ وَضَّأُوهُ وَلَا يُمَضْمَضُ وَلَا يُسْتَنْشَقُ ثُمَّ يُفِيضُونَ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَيُجَمِّرُ سَرِيرَهُ وِتْرًا وَيُغْلَى الْمَاءُ بِالسِّدْرِ وَبِالْحُرْضِ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ فَالْمَاءُ الْقُرَاحُ وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِطْمِيِّ ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَيُغْسَلُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ حَتَّى يُرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ وَصَلَ إِلَى مَا يَلِي التَّحْتَ مِنْهُ ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَيُغْسَلُ بِالْمَاءِ حَتَّى يُرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ وَصَلَ إِلَى مَا يَلِي التَّحْتَ مِنْهُ ۔

জানাযা প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ ১. মানুষের মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তাকে ডান পার্শ্বে কেবলামুখী করে শোয়াবে। এবং কালেমায়ে শাহাদাতের তালকীন করবে। মৃত্যুবরণের পর তার দাড়ি বেঁধে দিবে এবং চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দিবে। ২. মুর্দাকে গোসল করানোর ইচ্ছে করলে তাকে খাটিয়ার ওপর রাখবে এবং তার ছতরের ওপর কাপড় রেখে পোশাক খুলে নিবে। অতঃপর উযূ করাবে তবে কুলি করাতে হবেনা এবং নাকে পানি দিতে হবেনা। এরপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালবে। বেজোড় সংখ্যক বার (চারিপার্শ্বে) সুগন্ধীর ধোয়া দিবে। গোসলের পানি বরই পাতা বা উশনান মিশিয়ে গরম করবে। না পাওয়া গেলে স্বচ্ছ পানিই যথেষ্ট। অতঃপর খিতমী (ভিজান পানি) দ্বারা মুর্দার মাথা ও দাড়ি ধুয়ে দিবে। এরপর বাম পার্শ্বে শোয়াবে, বরই পাতা সিদ্ধ পানি দ্বারা এমন ভাবে ধোয়াবে যাতে নিচের অংশে পানি পৌঁছে। অতঃপর মুর্দাকে ডান কাতে শোয়ায়ে পানি দ্বারা এমন ভাবে গোসল করাবে যাতে নিম্নের অংশে পানি পৌঁছে বলে মনে হয়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ جَنَازَةٌ - جَنَائِزُ এর বহু ঃ জীমে যবর হলে মুর্দার বা মৃতব্যক্তি, আর যের হলে লাশবাহী খাট অর্থ হবে। شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ডান কাত। لُقِّنَ তালকীন করবে। স্মরণ করিয়ে দিবে شَدُّوا বাঁধবে। غَمَضُوا বন্ধ করে দিবে। سَرِيرٌ খাটিয়া, খাট, তখতা, عَوْرَةٌ ছতর يُفِيضُونَ প্রবাহিত করবে। يُجَمِّرُوْ ধুনী দিবে। وِتْرٌ বে জোড়, يُغْلَى সিদ্ধ করবে। سِدْرٌ বরই, কুল। حُرُضٌ উশনান, সুগন্ধি ঘাস। اَلْقُرَاحُ স্বচ্ছ (খালেস) পানি। خِطْمِيٌّ সুগন্ধী উদ্ভিদ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله لُقِّنَ ঃ মুমূর্ষ ব্যক্তির শিয়রে মৃদু স্বরে বার বার কালেমায়ে শাহাদাত পড়বে যাতে শুনে সেও পড়তে থাকে। এটা মুস্তাহাব। এসময় সূরায়ে ইয়াসীন পাঠেরও নির্দেশ এসেছে।

মৃত্যুর পর করণীয় ঃ উল্লেখ্য যে, (ক) মৃত্যুর পর পার্শ্বে আগরবাতি জ্বালান মুস্তাহাব। (খ) নাপাক নারী-পুরুষ মৃত্যের নিকট আসবে না। (গ) মৃতকে গোসল না দেয়া পর্যন্ত তার নিকটে বসে কুরআন তেলাওয়াত করা নিষেধ। তবে অন্য ঘরে বসে পড়া যায়। (ঘ) মৃত্যুর পর যথা শিঘ্র কাফন দাফন সম্পন্ন করা মুস্তাহাব। (ঙ) স্ত্রী স্বামী কে গোসল করাতে পারে কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে স্পর্শ করতে ও গোসল করাতে পারবেনা, তবে দেখার অনুমতি আছে।

ثُمَّ يُجْلِسُهُ وَيُسْنِدُهُ إِلَيْهِ وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ مَسْحًا رَقِيقًا فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ وَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ ثُمَّ يُنَشِّفُهُ فِي ثَوْبٍ وَيُدْرَجُ فِي أَكْفَانِهِ وَيَجْعَلُ الْحَنُوطَ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَالْكَافُورَ عَلَى مَسَاجِدِهِ . وَالسُّنَّةُ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ وَقَمِيصٍ وَلِفَافَةٍ فَإِنِ اقْتَصَرُوا عَلَى ثَوْبَيْنِ جَازَ وَإِذَا أَرَادُوا لَفَّ اللِّفَافَةِ عَلَيْهِ ابْتَدَأُوا بِالْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَأَلْقَوْهُ عَلَيْهِ ثُمَّ بِالْأَيْمَنِ فَإِنْ خَافُوا أَنْ يَنْتَشِرَ الْكَفَنُ عَنْهُ عَقَدُوهُ وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ وَقَمِيصٍ وَخِمَارٍ وَخِرْقَةٍ تُرْبَطُ بِهَا ثَدْيَاهَا وَلِفَافَةٍ فَإِنِ اقْتَصَرُوا عَلَى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ جَازَ وَيَكُونُ الْخِمَارُ فَوْقَ الْقَمِيصِ تَحْتَ اللِّفَافَةِ وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا عَلَى صَدْرِهَا وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُ الْمَيِّتِ وَلَا لِحْيَتُهُ وَلَا يُقَصُّ ظُفْرُهُ وَلَا يُقَصُّ شَعْرُهُ وَتُجَمَّرُ الْأَكْفَانُ قَبْلَ أَنْ يُدْرَجَ فِيهَا وِتْرًا فَإِذَا فَرَغُوا مِنْهُ صَلَّوْا عَلَيْهِ .

অনুবাদ ॥ তারপর বসিয়ে কিছুতে ঠেস দিয়ে রাখবে এবং হালকা ভাবে পেটের উপর হাত ফিরাবে। কোন কিছু (নাপাক) বের হলে তা ধুয়ে ফেলবে। এতে গোসল দোহরাতে হবেনা। অবশেষে কাপড় দ্বারা শরীর মুছবে এবং কাফন পরাবে। মৃতের মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধি এবং সাজদার স্থান সমূহে কর্পূর লাগাবে।

কাফনের সুন্নত তরীকা ঃ ১. পুরুষের ক্ষেত্রে ইযার, কোর্তা, ও লেফাফা এ তিন কাপড়ে কাফন দেওয়া সুন্নত। এর যে কোন দু'টি কাপড়ে সীমিত রাখা ও জায়েয। লেফাফা (ও ইযার) জড়ানোর সময় প্রথম মৃতের বাম দিক হতে শুরু করবে। তারপর ডান দিকের কাপড় জড়াবে। লেফাফা খুলে যাওয়ার আশংকা থাকলে তা বেঁধে দিবে। ২. মহিলাদের পাঁচ কাপড়ে কাফন দিতে হয়। ইযার, কোর্তা, উড়না, সীনাবন্দ, এর দ্বারা স্তনদ্বয় বাঁধা হয়, এবং চাদর। অবশ্য (ইযার, লেফাফা ও কোর্তা) তিন কাপড়ে সীমিত করা ও জায়েয। ওড়না থাকবে কোর্তার ওপরে ও লেফাফার তলে। ৩. মহিলাদের চুল (কোর্তা পরানোর পর) বুকের ওপর রাখবে। ৪. মৃতের চুল-দাড়ি আচড়াবেনা এবং নখ ও চুল কাটবেনা। ৫. কাফন পরানোর পূর্বে বেজোড় সংখ্যক বার সুগন্ধীর ধুনী দিবে। গোসল ও কাফন হতে ফারেগ হওয়ার পর জানাযার নামায পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَالسُّنَّةُ أَنْ يُكَفَّنَ الخ ঃ এখানে সুন্নত দ্বারা কাফন পরানোর সুন্নত তরীকা উদ্দেশ্য। মূলত ঃ কাফন পরান ওয়াজিব।

কাফন কাটার নিয়ম ঃ লেফাফা (চাদর) ও ইযার (তাহবন্দ) লাশের দীর্ঘতার চেয়ে একহাত লম্বা ও প্রস্থে (উভয় হাত সহ) চাদর এক হাত অতিরিক্ত চওড়া কাটতে হবে। আর কোর্তা প্রস্থে চাদরের সমান ও দৈর্ঘে পা সমান হবে। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের কাফনে সাধারণত ৭-৮ গজ ও মহিলাদের কাফনে ৯-১০ গজ কাপড় লাগে।

وَاَوْلَى النَّاسِ بِالْاِمَامَةِ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ اِنْ حَضَرَ فَاِنْ لَّمْ يَحْضُرْ فَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيْمُ اِمَامِ الْحَيِّ ثُمَّ الْوَلِيُّ فَاِنْ صَلّٰى عَلَيْهِ غَيْرُ الْوَلِيِّ وَالسُّلْطَانِ اَعَادَ الْوَلِيُّ وَاِنْ صَلّٰى عَلَيْهِ الْوَلِيُّ لَمْ يَجُزْ اَنْ يُّصَلِّيَ اَحَدٌ بَعْدَهٗ ـ فَاِنْ دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ صُلِّيَ عَلٰى قَبْرِهٖ اِلٰى ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَلَا يُصَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ وَيَقُوْمُ الْاِمَامُ بِحِذَاءِ صَدْرِ الْمَيِّتِ وَالصَّلٰوةُ اَنْ يُّكَبِّرَ تَكْبِيْرَةً يَحْمَدُ اللّٰهَ تَعَالٰى عَقِيْبَهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَةً وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَةً ثَالِثَةً يَدْعُوْ فِيْهَا لِنَفْسِهٖ وَلِلْمَيِّتِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَةً رَابِعَةً وَيُسَلِّمُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا فِي التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى وَلَا يُصَلّٰى عَلٰى مَيِّتٍ فِيْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ فَاِذَا حَمَلُوْهُ عَلٰى سَرِيْرِهٖ اَخَذُوْا بِقَوَائِمِهِ الْاَرْبَعِ وَيَمْشُوْنَ بِهٖ مُسْرِعِيْنَ دُوْنَ الْخَبَبِ –

অনুবাদ॥ জানাযার নামাযের নিয়ম ঃ ১. জানাযার ইমামতীর জন্য অগ্রগণ্য হলেন শাসক যদি তিনি উপস্থিত থাকেন। তিনি উপস্থিত না থাকলে মহল্লার ইমাম কে অগ্রসর করা মুস্তাহাব। তা না হলে মৃতের ওলী (বা তার মনোনীত কেউ) নামায পড়াবে। ২. যদি ওলী বা শাসক ছাড়া অন্য কেউ নামায পড়ায় তাহলে ওলী বা শাসক নামায দোহরাতে পারে। কিন্তু ওলী (বা তার মনোনীত) কেউ নামায পড়িয়ে থাকলে অন্য কারো জন্যে দ্বিতীয়বার নামায পড়ান জায়েয নয়। ৩. যদি জানাযার নামায বিহীন কাউকে দাফন করা হয় তাহলে তিন দিন পর্যন্ত কবরের ওপর জানাযার নামায পড়া জায়েয। এর পরে আর জায়েয নেই। ৪. জানাযার পড়ার সময় ইমাম লাশের সীনা বরাবর দাড়াবে।

জানাযা নামাযের নিয়ম ঃ প্রথমে তাকবীর বলে (হাত বেঁধে) ছানা পড়বে। অতঃপর তাকবীর বলে নবীজী (সা.) এর ওপর দরূদ পড়বে। এরপর তৃতীয় তাকবীর বলে নিজের জন্যে এবং মৃত ব্যক্তি ও সমগ্র মুসলমানদের জন্যে দোয়া করবে। অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরাবে। প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্য কোন তাকবীরে হাত উত্তোলন করবেনা। ৬. জামে মসজিদের অভ্যন্তরে জানাযার নামায পড়বেনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله فَاِنْ دُفِنَ الخ ঃ তিন দিন পর্যন্ত কবরের পার্শে জানাযা পড়ার এমতটি ইমাম আবু ইউসূফ (র.)-এর হেদায়া প্রণেতা (র.) এর বর্ণনামতে তিন দিনের সাথে খাছ নয়। বরং লাশ পঁচে গলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জায়েয। আর এটা অনেকটা মাটি ও আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। অন্য এলাকার তুলনায় মরু এলাকা বিলম্বে পঁচে। মোট কথা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এটা পর্যবেক্ষক মহলের ধারণার ওপর নির্ভরশীল।

قوله يَحْمَدُ اللّٰهَ ঃ এখানে হামদ দ্বারা ছানা উদ্দেশ্য। হানফী মাযহাবের ফতোয়া মতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোন তাকবীরে হাত উঠাবেনা। উলামায়ে বলখ ও আইম্মায়ে ছালাছার মতে প্রতি তাকবীরে হাত উঠাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে প্রথম তাকবীরের পরে সূরায়ে ফাতেহা পড়া ওয়াজিব। আমাদের মতে ছানার পরিবর্তে দোয়া হিসাবে পড়া জায়েয। আর ক্বিরাত হিসাবে পড়া মাকরূহে তাহরীমা।

ফায়েদা ঃ জানাযার রোকন শর্ত ও সুন্নত সমূহ ঃ জানাযার নামায ফরযে কেফায়া। এর রোকন (ফরয) দু'টি, দাঁড়ান ও চার তাকবীর বলা। শর্ত চারটি– ১। মুর্দা মুসলমান হওয়া, ২। পাক হওয়া, ৩। সামনে থাকা, ৪। ও লাশ যমীনের ওপর রাখা। সুন্নত তিনটি– ১। হামদ ২। ছানা ও ৩। দোয়া। উল্লেখ্য যে, গায়েবী জানাযা ছহীহ শর্তানুযায়ী মাকরূহে তাহরীমী।

قوله فِيْ مَسْجِدِ الخ ঃ মসজিদের অভ্যন্তরে লাশ রেখে জানাযা পড়া মাকরূহে তাহরীমি। তবে লাশ বাইরে রেখে সবাই থাকবে ভিতরে বা কিছু বাইরে ও কিছু ভিতরে উভয় ক্ষেত্রে কারো কারো মতে মাকরূহে তানযীহি।

فَإِذَا بَلَغُوا إِلَى قَبْرِهِ كُرِهَ لِلنَّاسِ أَنْ يَجْلِسُوا قَبْلَ أَنْ يُوضَعَ مِنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ وَيُلْحَدُ وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةِ فَإِذَا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ قَالَ الَّذِي يَضَعُهُ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ وَيُوَجِّهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَيَحِلُّ الْعُقْدَةَ وَيُسَوِّى اللَّبِنُ عَلَى اللَّحْدِ وَيُكْرَهُ الْآجُرُّ وَالْخَشَبُ وَلَا بَأْسَ بِالْقَصَبِ ثُمَّ يُهَالُ التُّرَابُ عَلَيْهِ وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ وَلَا يُسَطَّحُ وَمَنِ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْوِلَادَةِ سُمِّيَ وَغُسِلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ أُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ وَدُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ -

---

<u>অনুবাদ ॥ লাশ বহন ও দাফনের নিয়ম ঃ</u> ১। খাটিয়ায় লাশ উঠানোর পর তার চারো পায়া ধরবে ও উঠাবে এবং না দৌড়ে দ্রুত হাঁটবে। ২। কবরস্তানে পৌছার পর ঘাড় হতে লাশ নামানোর পূর্বে অন্যান্যদের জন্যে বসা মাকরূহ। ২, বগলী কবর বানাবে। মুর্দাকে কেবলা দিক হতে কবরে নামাবে। কবরে রাখার সময় যারা রাখবে তারা "বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ" বলবে। মুর্দাকে কেবলামূখী করে (কাৎকরে) শোয়াবে। অতঃপর গিরাগুলি খুলে দিবে। ৩। কবরের ওপর কাঁচা ইট সমান করে বসিয়ে দিবে। কবরের ওপর পাকা ইট ও কাঠ দেওয়া মাকরূহ। তবে বাঁশ ব্যবহারে ক্ষতি নেই। অতঃপর তার ওপর মাটি দিয়ে দিবে। এবং কবর কে উটের কুঁজের ন্যায় উঁচু করে দিবে। চার কোণ করবেনা। ৩. জন্মের পরে কেউ চিৎকার (বা শব্দ করলে এবং তৎক্ষনাত মৃত্যুবরণ করলে) তার নাম রাখতে হবে, গোসল দিতে হবে এবং জানাযা পড়তে হবে। আর ভূমিষ্ঠের পর কোন শব্দ না করলে তাকে কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করবে, জানাযা পড়তে হবেনা।

<u>শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ</u> سَرِيْر খাটিয়া, قَائِمَةٌ -قَوَائِمُ এর বহুঃ পায়া। خَبَبٌ দৌড়। لَحْدٌ বগলী কবর। عُنُقٌ-أَعْنَاقٌ এব বহু ঃ ঘাড়, কাঁধ। عِقْدٌ গিরা, বন্ধন। لَبِنٌ কাঁচা ইট। آجُرٌّ পোড়া ইট। خَشَبٌ কাঠ। قَصَبٌ বাঁশ। خِرْقَةٌ কাপড়ের টুকরা। إِسْتَهَلَّ কান্নাকাটি করে।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥</u> قوله وَيُلْحَدُ الخ ঃ لَحْدٌ অর্থ বগলী কবর। অর্থাৎ কবর সোজা খনন করে পরে পশ্চিম দিকে বাক্সের ন্যায় করা। হুযূর (সা.) কে বগলী কবরে সমাহিত করা হয়েছিল। তবে এর জন্যে এটেল বা শক্ত মাটি হওয়া আবশ্যক। নতুবা ওপর থেকে ভেঙ্গে পড়ার আশংকা থাকে। বেলে বা নরম যমীন হলে شِقٌّ তথা চাপা (সোজা খাড়া) কবর করা উত্তম। মাটি নরম হলে বাক্সের মধ্যে লাশ রেখে দাফন করা দোষণীয় হয়।

قوله يُسَوِّي اللَّبِنُ الخ ঃ কবরের ওপর দুপাশ হতে কাঁচা ইট বসিয়ে দেওয়া দোষণীয় নয়। তবে পোড়া ইট মাকরূহ। কবর পাকা করা, গম্বুজ নির্মাণ করা ইত্যাদি মাকরূহে তাহরীমি। অবশ্য মানুষের পদচারণা বা জীব জন্তুর উৎপাত হতে রক্ষার জন্য দূর হতে দেয়াল নিমার্ণ করা দোষণীয় নয়।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। جَنَازَه অর্থ কি? তালকীন কাকে বলে? এবং কারো মৃত্যুর পর করণীয় কি? বর্ণনা কর।
২। জানাযা নামাযের রোকন, শর্ত ও সুন্নত আলোচনা কর।
৩। কাফনের সুন্নত তরীকা কি?
৪। জানাযা নামাযের ইমামতির ব্যাপারে অগ্রগণ্য কে? জানাযা বিহীন দাফন করলে করণীয় কি?

بَابُ الشَّهِيْدِ

اَلشَّهِيْدُ مَنْ قَتَلَهُ الْمُشْرِكُوْنَ اَوْ وُجِدَ فِى الْمَعْرِكَةِ وَبِهِ اَثَرُ الْجِرَاحَةِ اَوْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُوْنَ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهِ دِيَةٌ فَيُكَفَّنُ وَيُصَلّٰى عَلَيْهِ وَلَايُغَسَّلُ وَاِذَا اُسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ غُسِلَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَكَذٰلِكَ الصَّبِىُّ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَايُغْسَلَانِ وَلَايُغْسَلُ عَنِ الشَّهِيْدِ دَمُهٗ وَلَايُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهٗ وَيُنْزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ وَالْحَشْوُ وَالْخُفُّ وَالسِّلَاحُ وَمَنِ ارْتُثَّ غُسِلَ وَالْاِرْتِثَاثُ اَنْ يَاْكُلَ اَوْ يَشْرَبَ اَوْ يُدَاوِىْ اَوْ يَبْقٰى حَيًّا حَتّٰى يَمْضِىْ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلٰوةٍ وَهُوَ يَعْقِلُ اَوْ يُنْقَلُ مِنَ الْمَعْرِكَةِ حَيًّا وَمَنْ قُتِلَ فِىْ حَدٍّ اَوْ قِصَاصٍ غُسِلَ وَصُلِّىَ عَلَيْهِ وَمَنْ قُتِلَ مِنَ الْبُغَاةِ اَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيْقِ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ـ

শহীদ প্রসঙ্গ

শহীদের সংজ্ঞা ও অনুবাদ॥ ঐ ব্যক্তিকে শহীদ বলে যাকে মুশরেকরা হত্যা করে, অথবা যুদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষত যখম অবস্থায় মৃত পাওয়া যায়, অথবা যাকে মুসালমানরা জুলুম বশতঃ হত্যা করে, আর তার হত্যার দ্বারা কারো ওপর দিয়ত (রক্তপণ) ওয়াজিব হয়না।

বিধান ঃ ১. শহীদ ব্যক্তিকে কাফন পরাতে হবে এবং তার জানাযার নামায পড়তে হবে। তাকে গোসল দেওয়া যাবেনা। তবে কোন জুনূবী (যার ওপর গোসল ফরয) ব্যক্তি শহীদ হলে আবু হানীফা (র.) এর মতে তাকে গোসল দিতে হবে। এভাবে নাবালেগ কেউ শহীদ হলেও (তাকে গোসল দিতে হবে।) আর আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে এদু'জনের কাউকে গোসল দিতে হবে না। ২. শহীদের রক্ত ধোয়া যাবেনা এবং তার পোশাক খোলা যাবেনা। তবে চামড়ার পোশাক, তুলা ভরা পোশাক, মোজা, যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদি সঙ্গে থাকলে তা খুলতে হবে।

মাসয়েল ঃ ১. মুরতাছ ব্যক্তির গোসল দিতে হবে। মুরতাছ ঐ ব্যক্তিকে বলে যে আহত হওয়ার পর পানাহার করে বা চিকিৎসা গ্রহণ করে, বা আহত হওয়ার পর পূর্ণ এক ওয়াক্ত নামাযের সময় পেরিয়ে যাওয়া পরিমাণ সময় বেহুস অবস্থায় জীবিত থাকে, বা যুদ্ধক্ষেত্র হতে জীবিত স্থানান্তরিত হয়। ২. যাকে শরিয়তের দন্ডবিধি মোতাবেক প্রাণদন্ড দেয়া হয় খুনের শাস্তি স্বরূপ হত্যা করা হয়। তাকে গোসল দিয়ে জানাযা পড়তে হবে। (সে শহীদ নয়।) ৩. কোন ইসলামী রাষ্ট্রদ্রোহী বা ডাকাত নিহত হলে তার জানাযা পড়া যাবেনা।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ شَهِيْد সাক্ষী, প্রতক্ষকারী, সাক্ষ্য প্রদত্ব। مَعْرِكَة যুদ্ধক্ষেত্র, جِرَاحَة ক্ষত, যখম। دِيَةٌ রক্ত পণ। فَرْو চর্ম নির্মিত পোশাক حَشْو অতিরিক্ত (পোশাক), خُفٌّ মোজা। سِلَاح হাতিয়ার, যুদ্ধাস্ত্র। اِرْتِثَاث উপকার গ্রহণ করা। بُغَاة - بَاغِى র বহু ঃ রাষ্ট্রদ্রোহী। قُطَّاعٌ- قَاطِعٌ এর বহুঃ ডাকাত।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা</u> ॥ قوله اَلشَّهِيْدُ الخ ঃ অপরাপর মৃতদের থেকে শহীদের আলোচনা কে পৃথক শিরোনামে উল্লেখ করার কারণ এই যে, অন্যান্য মৃতদের তুলনায় শহীদী মৃতের সম্মান ও মর্যাদা ভিন্নতর। এমর্মে স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন- وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ (আল্লাহর রাহে যারা নিহত হয় তাদিগকে মৃত বলোনা, তারা জীবিত। তবে তোমরা অনুভব করতে পারোনা। (বাক্বারা) সাধারণ শ্রেণীর আলোচনার পর বিশেষ ব্যক্তির নাম যেরূপ পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয় এখানেও তদরূপ অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়ার কারণে শহীদকে ভিন্ন ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

شَهِيْد শব্দটি اَلشَّهَادَةُ বা اَلشُّهُوْدُ মর্যাদার হতে উদ্‌গত। অর্থ-সাক্ষ্য দেয়া, উপস্থিত হওয়া। এটা فَعِيْل এর ওযনে شُهُوْدٌ অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ شُهُوْدٌ بِالْجَنَّةِ তথা জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদত্ব। অথবা মৃত্যুকালে তাদের নিকট ফেরেশতার আগমন ঘটায় شَهِيْد কে শহীদ কে বলে। অথবা এটা فَاعِل অর্থাৎ সাক্ষী অর্থে। কেননা শহীদের রক্ত ও ক্ষত তাদের জন্য সাক্ষী হবে।

قوله ظُلْمًا ঃ অর্থাৎ ন্যায় সঙ্গত কারণে কাউকে হত্যা করা হলে সে শহীদ গণ্য হবেনা।

<u>শহীদের জানাযা ঃ</u> قوله يُصَلّٰى عَلَيْهِ ঃ ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে শহীদের জানাযাও পড়া যাবেনা। কেননা হযরত জাবের (রা.) এর বর্ণিত হাদীসে আছে উহুদ যুদ্ধে যারা শহীদ হন রাসূল (সা.) তাদিগকে না গোসল দিয়েছেন না জানাযা পড়েছেন। বরং তাদের তরবারী তাদের পাপ মার্জনাকারী। আমাদের দলীল হল হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস যে, উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের উপর রাসূল (সা.) জানাযার ন্যায় নামায আদায় করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস ও যুবাইর (রা.) হতে এরূপ বর্ণনা রয়েছে। আর পূর্বের হাদীসের উত্তর এই যে, সম্ভবতঃ নামায পড়াকালে উক্ত সাহাবী উপস্থিত ছিলেন না। আর পাপ মার্জিত হওয়া জানাযা পড়ার প্রতিবন্ধক নয়। বরং মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যেও জানাযা পড়া যেতে পারে।

قوله وَاِذَا اسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ ঃ আবু হানীফা (র.) এর মতে শহীদ হওয়ার জন্যে প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ও জানাবাত হতে পাক হওয়া শর্ত। সাহিবাইন (র.) এর মতে শাহাদত গোসলের স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং তাকে গোসল দিতে হবে না। আবু হানীফা (র.) এ মর্মে হযরত হানযালা (রা.) এর ঘটনা দ্বারা দলীল পেশ করেন। কেননা তাঁকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছিলেন। সুতরাং এটাই প্রাধান্য যোগ্য।

قوله وَمَنْ اِرْتَثَّ الخ ঃ اِرْتِثَاثٌ অর্থ উপকার লাভ করা, এখানে জীবন ধারনের উপায়– উপকরণের মধ্য হতে কোন উপায়-উপকরণ লাভ করা উদ্দেশ্য। যেমন পানাহার করা, চিকিৎসা গ্রহণ করা প্রভৃতি।

قوله وَمَنْ قُتِلَ فِىْ حَدٍّ الخ ঃ কিসাস বা হদ্দ স্বরূপ কেউ নিহত হলে সে শহীদ গণ্য হবে না। কেননা শাহাদাতের জন্য ظلما (অন্যায় ভাবে) নিহত হওয়া শর্ত।

قوله مِنَ الْبُغَاةِ الخ ঃ ইসলামী রাষ্ট্রদ্রোহী, ডাকাত সন্ত্রাসী ইত্যাদি নিহত হলে তার জানাযা পড়া যাবেনা। কেননা হযরত আলী (রা.) নেহরাওয়ানবাসী কতিপয় খারেজী (হযরত আবূ বকর (রা.) এর বিদ্রোহ ঘোষণাকারী) নিহত হলে তাদের জানাযা পড়েননি। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন- اِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا এতে তিনি রাষ্ট্র দ্রোহীতার প্রতি ইশারা করেন।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। شهيد এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? এবং এ নামকরণের কারণ কি? বর্ণনা কর।

২। শহীদের জানাযা পড়ার হুকুম কি? মতান্তরসহ বিস্তারিত লিখ।

৩। اِرْتِثَاث বলতে কি বুঝায়? রাষ্ট্রদ্রোহী ও সন্ত্রাসী ব্যক্তির জানাযার বিধান কি?

بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الْكَعْبَةِ

اَلصَّلٰوةُ فِى الْكَعْبَةِ جَائِزَةٌ فَرْضُهَا وَنَفْلُهَا فَاِنْ صَلَّى الْاِمَامُ فِيهَا بِجَمَاعَةٍ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ ظَهْرَهُ اِلٰى ظَهْرِ الْاِمَامِ جَازَ وَمَنْ جَعَلَ مِنْهُمْ وَجْهَهُ اِلٰى وَجْهِ الْاِمَامِ جَازَ وَيُكْرَهُ وَمَنْ جَعَلَ مِنْهُمْ ظَهْرَهُ اِلٰى وَجْهِ الْاِمَامِ لَمْ تَجُزْ صَلٰوتُهُ وَاِذَا صَلَّى الْاِمَامُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَحَلَّقَ النَّاسُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَصَلَّوْا بِصَلٰوةِ الْاِمَامِ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ اَقْرَبُ اِلٰى الْكَعْبَةِ مِنَ الْاِمَامِ جَازَتْ صَلٰوتُهُ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِى جَانِبِ الْاِمَامِ وَمَنْ صَلّٰى عَلٰى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ جَازَتْ صَلَاتُهُ -

---

কা'বার অভ্যন্তরে নামায

অনুবাদ ॥ ১. কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে ফরয, নফল সর্ব প্রকারের নামায পড়া জায়েয। ২. যদি ইমাম সাহেব জামাতে নামায পড়ান আর কতক মুক্তাদী ইমামের পিঠের দিকে তাদের পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ায় তথাপি নামায হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ইমামের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াবে তার নামায ও জায়েয হয়ে যাবে। তবে এরূপ দাঁড়ান মাকরূহ। যদি কারো পিঠ ইমামের মুখেরদিকে হয় (অর্থাৎ ইমামের সামনে দাড়ায়) তাহলে তার নামায সহীহ হবেনা। ৩. ইমাম মসজিদে হারামে নামায পড়লে মুক্তাদীগণ কা'বার চতুষ্পার্শ্বে গোলাকৃতি হয়ে দাঁড়াবে এবং ইমামের সাথে নামায আদায় করবে। তন্মধ্য হতে যদি কেউ ইমামের তুলনায় কা'বার বেশী নিকটবর্তী হয় তথাপি তার নামায জায়েয হয়ে যাবে যদিনা সে ইমামের পার্শ্বে থাকে। কেউ কা'বার ছাদের ওপর নামায পড়লে তার নামায সহীহ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله جَائِزَةٌ فَرْضُهَا الخ : কা'বার অভ্যন্তরে নামায জায়েয কিনা এ ব্যাপারে ইমাম গনের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে জায়েয। আর শাফেয়ী (র.) এর মতে নাজায়েয। ইমাম মালেক (র.) এর মতে ফরয জায়েয, নফল না জায়েয।

ইমাম সাহেব (র.) এর দলীল : হযরত আব্দুল্লাই ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন– মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.) হযরত উসামা, বেলাল ও উসামা ইবনে তালহা (রা.) কা'বা গৃহে প্রবেশ করে দরজা বন্দ করে দেন। দীর্ঘক্ষণ তিনি (সা.) তাঁর মধ্যে অবস্থান করেন। হযরত বেলাল (রা.) বাইরে আসলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম নবীজী (সা.) কি আমল করলেন ? বললেন-নামায পড়েছেন। আর তা এভাবে যে, দু'খুটি তাঁর বাম পার্শ্বে ছিল, একটি ছিল ডান পার্শ্বে। আর তিনটি ছিল পেছনের দিকে।

قوله اِلٰى وَجْهِ الْاِمَامِ : কেননা এক্ষেত্রে মুক্তাদী ইমাম হতে অগ্রসর হয়ে যায়। আর এতে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। কা'বার অভ্যন্তরে নামায আদায়ের পদ্ধতি কি? বিস্তারিত লিখ।

كِتَابُ الزَّكٰوةِ

اَلزَّكٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ اِذَا مَلَكَ نِصَابًا كَامِلًا مِلْكًا تَامًّا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلَيْسَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَامَجْنُوْنٍ وَلَامُكَاتِبٍ زَكٰوةٌ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيْطٌ بِمَالِهٖ فَلَا زَكٰوةَ عَلَيْهِ وَاِنْ كَانَ مَالُهٗ اَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ زَكَّى الْفَاضِلَ اِذَا بَلَغَ نِصَابًا وَلَيْسَ فِىْ دُوْرِ السُّكْنٰى وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَاَثَاثِ الْمَنْزِلِ وَدَوَابِّ الرُّكُوْبِ وَعَبِيْدِ الْخِدْمَةِ وَسِلَاحِ الْاِسْتِعْمَالِ زَكٰوةٌ وَلَايَجُوْزُ اَدَاءُ الزَّكٰوةِ اِلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلْاَدَاءِ اَوْ مُقَارِنَةٍ لِعَزْلِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَالِهٖ وَلَايَنْوِى الزَّكٰوةَ سَقَطَ فَرْضُهَا عَنْهُ -

যাকাত অধ্যায়

অনুবাদ ॥ যাকাত ফরয প্রসঙ্গ ঃ ১. স্বাধীন, প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন মুসলমান ব্যক্তি যখন পূর্ণ নিসাবের পরিপূর্ণ মালিক হয়, আর উক্ত মালের ওপর পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হয় তার ওপর যাকাত ফরয। ২. নাবালেগ, পাগল ও মুকাতাব গোলামের ওপর যাকাত ফরয নয়, ৩. যার ওপর তার সম্পদ গ্রাসকারী ঋণ থাকে তার ওপর যাকাত ফরয নয়। যদি ঋণের অধিক সম্পদ থাকে তাহলে বর্ধিত অংশ নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত দিতে হবে। ৪. বসবাসের গৃহ, ব্যবহারের পোশাক, গৃহস্থলি সরঞ্জাম, আরোহণের পশু, খিদমতের গোলাম ও ব্যবহারের জরুরী হাতিয়ারের ওপর যাকাত ফরয নয়।

নিয়ত প্রসঙ্গ ঃ ১. যাকাত আদায়কালে বা যাকাতের মাল পৃথক করাকালে যাকাতের নিয়ত থাকা অপরিহার্য। নতুবা যাকাত আদায় হবেনা। ২. কেউ যাকাতের নিয়ত ছাড়া সমস্ত মাল দান করে দিলে তার থেকে যাকাত রহিত হয়ে যাবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ زَكٰوة পবিত্র, উত্তম অংশ, بَاب تَفْعِيْل হতে زَكّٰى تَزْكِيَةً অর্থ পবিত্র করা, বৃদ্ধি পাওয়া حَالَ অতিক্রান্ত হয়, ঘূর্ণন করে। حَوْلٌ বৎসর। مُكَاتَبٌ মৃত্যুর পর স্বাধীন এমন চুক্তিকৃত গোলাম। دَيْنٌ ঋণ اَلْفَاضِل অতিরিক্ত, বর্ধিত। دُوْرٌ - دار এর বহুঃ ঘর, سُكْنٰى বসবাস مُحِيْط বেষ্টন কারী, সমস্ত সম্পদ গ্রাসকারী ঋণ অর্থে, اَثَاثٌ আসবাব, সরঞ্জাম دَابَّةٌ- دَوَابٌّ এর বহুঃ পশু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ যাকাতের সংজ্ঞা ঃ قوله الزكوة - শরীআতের পরিভাষায়-নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষে নির্দিষ্ট ব্যক্তি কে দান করাকে যাকাত বলে।

২য় হিজরী সনে যাকাত ফরয হয়। ইসলামে নামায-রোযার মতই যাকাতের গুরুত্ব। তবে ব্যতিক্রম এই যে, (ক) নামায-রোযা হল بَدَنِىْ তথা শারীরিক ইবাদত। আর যাকাত হল مَالِىْ বা সম্পদ বিষয়ক ইবাদত। (২) নামায রোযা সবার জন্যে ফরয, আর যাকাত নিসাব পরিমাণ মালের মালিকের ওপর ফরয। (৩) নামায রোযা নিছক আল্লাহর হক, আর যাকাত হল বান্দার হক।

<u>যাকাত কার উপর ফরয ?</u> قوله اَلْحُرُّ الْمُسْلِمُ الخ ঃ যাকাত ফরয হওয়ার সর্ব মোট শর্ত হল ৮টি। তন্মধ্য হতে ৫টি যাকাতদাতার জন্য প্রযোজ্য। যথা- (১) মুসলমান হওয়া, (২) স্বাধীন হওয়া, (৩) সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া, (৪) বালেগ হওয়া, (৫) ঋণের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণের মালিক হওয়া। বাকী ৩টি সম্পদের ক্ষেত্রে- (১) নিসাব পরিমাণ সম্পদ হওয়া, (২) উক্ত সম্পদের ওপর পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হওয়া, (৩) সায়েমা বা ব্যবসার মাল হওয়া।

قوله مِلْكًا تَامًّا الخ ঃ অর্থাৎ মালিকানা ভোগ ব্যবহারের ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া। সুতরাং ক্রয়ের পর মাল হস্তগত না হওয়া পযর্ন্ত উক্ত মালের ওপর যাকাত ফরয নয়।

قوله وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ الخ ঃ হানাফী মাযহাব মতে নাবালেগের ওপর যাকাত ফরয নয়। তবে অন্য তিন ইমামের মতে ফরয। তার অভিভাবক তার মাল হতে যাকাত আদায় করবে।

<u>যাকাতের গুরুত্ব ও উপকারীতা ঃ</u> যাকাত ইসলামের অন্যতম বুনিয়াদ জান-মাল ইত্যাদি সব কিছুর একমাত্র মালিক আল্লাহ। সুতরাং তাঁর নির্দেশ মতই এর ব্যবহার হওয়া বাঞ্ছণীয়। এর উপকারীতা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ ইরশাদ করেন خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ ধনীদের সম্পদ হতে যাকাত গ্রহণ করুন। এটা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ تُرْبِىْ الْاَمْوَالَ নিশ্চয়ই যাকাত সম্পদ বৃদ্ধি করে ইত্যাদি। যাকাতের উপকারীতাগুলো নিম্নরূপ -

১। মনও সম্পদ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হওয়া, ২। সম্পদ বৃদ্ধি হওয়া, ৩। গরীব-দুঃখীর হক আদায় হওয়া, ৪। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় ও দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হওয়া, ৫। সম্পদ স্থায়ী হওয়া, ৬। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা, ৭। জাহান্নামের আযাব হতে মুক্তি লাভ ইত্যাদি।

<u>ফায়েদা ঃ</u> পাঁচ ধরণের মালের যাকাত দেয়া ফরয। (ক) সোনা-রুপা, (খ) ব্যবসার মাল, (গ) নগদ মুদ্রা টাকা বা তার মূল্যের চেক, (খ) উৎপাদিত ফসল, (ঙ) গৃহপালিত পশু, সামনে এসবের বিস্তারিত বিবরণ আসছে।

اَلتَّمْرِيْنُ - (অনুশীলনী)

১। زكوة এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? যাকাত কার ওপর ফরয বিস্তারিত লিখ।

২। যাকাতের গুরুত্ব ও উপকারীতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ।

لَيْسَ فِى اَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا شَاةٌ اِلَى تِسْعٍ فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلَى اَرْبَعَ عَشَرَةَ فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشَرَةَ فَفِيْهَا ثَلٰثُ شِيَاهٍ اِلَى تِسْعَ عَشَرَةَ فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِيْنَ فَفِيْهَا اَرْبَعُ شِيَاهٍ اِلَى اَرْبَعٍ وَّعِشْرِيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اِلَى خَمْسٍ وَّثَلٰثِيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّثَلٰثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اِلَى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ اِلَى سِتِّيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ اِحْدٰى وَّسِتِّيْنَ فَفِيْهَا جَذْعَةٌ اِلَى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ -

---

উটের যাকাত

অনুবাদ ॥ ১. পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই। উটের সংখ্যা পাঁচে উপনীত হলে আর তা সায়েমা হলে (তথা মাঠে বিচরণ করে খাদ্য গ্রহণ করে) এবং তার ওপর পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হলে তখন নয় পর্যন্ত একটি ছাগল (বা সমপরিমাণ অর্থ যাকাত দেয়া) ওয়াজিব। ১০ টি হলে ২টি ছাগল, ১৪টি পর্যন্ত এ বিধান। ১৫ হতে ১৯ পর্যন্ত ৩টি ছাগল এবং ২০ হতে ২৪ পর্যন্ত ৪টি ছাগল ওয়াজিব। অতঃপর ২৫টিতে উপনীত হলে বিনতে মাখায (এক বছর বয়সী উট), ৩৫ পর্যন্ত এ বিধান। অতঃপর ৩৬ টিতে পৌছলে বিনতে লাবুন (তিন বছর বয়সী উট) এটা ৪৫ পর্যন্ত। যখন তা ৪৬ এ উপনীত হবে একটি হিক্কা (চার বছর বয়সী) ওয়াজিব ৬০ পর্যন্ত এ বিধান। আর ৬১ হতে ৭৫ পর্যন্ত হলে জাযআ (৫ বছর বয়সী) ওয়াজিব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله سَائِمَةً ঃ যে গৃহ পালিত পশু বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে চলে ফিরে জীবন ধারণ করে, অর্থ ব্যয় করে সংরক্ষিত আহার খাওয়াতে হয়না তাকে سَائِمَةٌ বলে। এর বহুবচন হল سَوَائِم এ- ধরনের পশু যদি বংশ বৃদ্ধি ও গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে পালিত হয় তথাপি তার যাকাত দিতে হবে। তবে আরোহণ বা বোঝা বহনের জন্যে প্রতিপালন করলে তার যাকাত দিতে হবেনা। আর ব্যবসার উদ্দেশ্য হলে অন্যান্য ব্যবসায়িক দ্রব্যের ন্যায় মূল্য হিসাব করে নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত দিতে হবে। চাই সংখ্যা যা-ই হোক না কেন

قوله بِنْتُ مَخَاضٍ : مَخَاضٌ অর্থ প্রসব বেদনা, গর্ভবতী উটের বাচ্চার বয়স এক বছরে উপনীত হলে তার মা পুনরায় গর্ভ সম্ভবা হয় একারণে তার মাকে بِنْتُ مَخَاضٍ (গর্ভবতীর কন্যা) বলে। لَبُوْنٌ - لَبَنٌ হতে উদ্‌গত। অর্থ দুগ্ধ সমপন্না, বাচ্চা ২বছরে উপনীত হলে তার মা ২য় বাচ্চার জন্যে দুগ্ধ সম্পন্না হয় একারণে ৩ বছরী বাচ্চাকে بِنْتُ لَبُوْنٍ (দুগ্ধবতীর কন্যা) বলে। حِقَّةٌ অর্থ বাশা উট. ৩ব ছর বয়সী হলে সাধারণত বোঝা বহনের যোগ্য হয় একারণে ৩ বছর বয়সী বাচ্চাকে حقة বলে। جَذْعَةٌ অর্থ যুবতী। উট ৪ বৎসর বয়সী হলে যৌবন লাভ করে। তাই ৪ বছর বয়সী উটনীকে جَذْعَةٌ বলে।

زَكٰوةُ الْإِبِلِ ঃ রাসূল (সা.) কর্তৃক যাকাত আদায়কারীদের নিকট যে হুকুমনামা প্রেরিত হত তাতে উটের যাকাতের আলোচনা সর্বাগ্রে থাকত। এ কারণে গ্রন্থকার سَوَائِم (তথা পালিত পশু) এর আলোচনা শুরুতে এনেছেন। আর বস্তুত ঃ উটই আরবদের প্রধান সম্পদ বটে।

فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ اِلٰى تِسْعِيْنَ وَاِذَا كَانَتْ اِحْدٰى وَّتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ اِلٰى مِائَةٍ وَّعِشْرِيْنَ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيْضَةُ فَيَكُوْنُ فِى الْخَمْسِ شَاةٌ مَعَ الْحِقَّتَيْنِ وَفِى الْعَشْرِ شَاتَانِ وَفِىْ خَمْسَ عَشَرَ ثَلٰثُ شِيَاهٍ وَفِى عِشْرِيْنَ اَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِىْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ اِلٰى مِائَةٍ وَّخَمْسِيْنَ فَيَكُوْنُ فِيْهَا ثَلٰثُ حِقَاقٍ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيْضَةُ فَفِى الْخَمْسِ شَاةٌ وَفِى الْعَشْرِ شَاتَانِ وَفِىْ خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلٰثُ شِيَاهٍ وَفِىْ عِشْرِيْنَ اَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِىْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَفِىْ سِتٍّ وَّثَلٰثِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَاِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَّسِتًّا وَّتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا اَرْبَعُ حِقَاقٍ اِلٰى مِائَتَيْنِ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيْضَةُ اَبَدًا كَمَا تُسْتَأْنَفُ فِى الْخَمْسِيْنَ الَّتِىْ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِيْنَ وَالْبُخْتُ وَالْعِرَابُ سَوَاءٌ -

<u>অনুবাদ</u> ॥ অতঃপর উট ৭৬ এ উপনীত হলে ৭৬-৯০ পর্যন্ত ২টি বিনতে লাবূন দিতে হবে। আর ৯১ টিতে পৌঁছলে ৯১-হতে ১২০ পর্যন্ত সংখ্যায় ২টি হিক্কা দিতে হবে। তারপর নুতন ভাবে হিসেব শুরু হবে। সুতরাং (১২০ এর পরে) ৫টি হলে ১টি ছাগল ও ২টি হিক্কা, ১০টি হলে ২টি ছাগল ও ২টি হিক্কা। ১৫টি হলে ৩টি ছাগল (ও ২টি হিক্কা) ২০টি হলে ৪টি ছাগল (ও ২টি হিক্কা) ২৫টি হলে ৫০টি পর্যন্ত ৩টি হিক্কা। এরপর নুতন ভাবে হিসেব শুরু হবে। পরবর্তী ৫টিতে ১টি ছাগল, ১০টিতে ২টি ছাগল. ১৫টিতে ৩টি ছাগল, ২০টিতে ৪টি ছাগল। এখানে ২৫টিতে ১টি বিনতে মাখায, ৩৬টিতে ১টি বিনতে লাবূন, এরপর যখন ১৯৬ টিতে পৌঁছবে তখন ৪টি হিক্কা দিতে হবে। এভাবে ২০০ পর্যন্ত। পুনরায় সম্পুর্ণ নুতন ভাবে হিসেব শুরু হবে। যেমনটি হয়েছিল ১৫০ এর পরবর্তী ৫০এর মধ্যে। উটের ব্যাপারে বুখতী উটও আরবী উট সমপর্যায়ে গণ্য।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা</u> ॥ قوله وَالْبُخْتُ الخ ঃ আরবী ও অনারবীর সংঙ্গমে যে উটের জন্ম হয় তাকে বুখতী উট বলে। বাদশাহ বুখতে নাসার এ পদ্ধতিতে উটের নতুন প্রজন্ম ঘটেয়েছিল। বিধায় এ প্রজন্মের উটকে বুখতী উট বলে। عِرَاب হল খালেস আরব দেশীয় উট।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। উটের যাকাতের নিয়ম কি? লিখ।

২। سَائِمَه কাকে বলে? বয়সভেদে উটের নাম কি কি? بُخْت কাকে বলে? লিখ।

لَيْسَ فِي اَقَلَّ مِنْ ثَلٰثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ فَاِذَا كَانَتْ ثَلٰثِيْنَ سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا تَبِيْعٌ اَوْتَبِيْعَةٌ وَفِي اَرْبَعِيْنَ مُسِنٌّ اَوْ مُسِنَّةٌ فَاِذَا زَادَتْ عَلَى الْاَرْبَعِيْنَ وَجَبَ فِي الزِّيَادَةِ بِقَدْرِ ذٰلِكَ اِلٰى سِتِّيْنَ عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَفِي الْوَاحِدَةِ رُبُعُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ وَفِي الْعِشْرِيْنَ نِصْفُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ وَفِي الثَّلٰثِ ثَلٰثَةُ اَرْبَاعِ عَشَرَةِ مُسِنَّةٍ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَاشَيْئَ فِي الزِّيَادَةِ حَتّٰى تَبْلُغَ سِتِّيْنَ فَيَكُوْنُ فِيْهَا تَبِيْعَانِ اَوْتَبِيْعَتَانِ وَفِي سَبْعِيْنَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيْعٌ وَفِي ثَمَانِيْنَ مُسِنَّتَانِ وَفِي تِسْعِيْنَ ثَلٰثَةُ اَتْبِعَةٍ وَفِي مِائَةٍ تَبِيْعَتَانِ وَمُسِنَّةٌ وَعَلٰى هٰذَا يَتَغَيَّرُ الْفَرْضُ فِي كُلِّ عَشْرٍ مِنْ تَبِيْعٍ اِلٰى مُسِنَّةٍ وَالْجَوَامِيْسُ وَالْبَقَرُ سَوَاءٌ -

---

গরুর যাকাত

অনুবাদ ॥ ৩০টির কম গরুতে যাকাত ফরয নয়। যখন গরুর সংখ্যা ৩০টিতে উপনীত হবে, এবং তা সায়েমা (তথা বছরের বেশী ভাগ মাঠে বিচরণশীল) হবে এবং পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হবে তখন তাতে ১টি তাবীআ' (১ বছরে বাছুর) ওয়াজিব হবে। এবং ৪০টিতে ১টি মুসিন্না (২বছরে বাছুর) দিতে হবে। অতঃপর ৪০ এর বেশী হলে আবূ হানীফা (র.) এর মতে ৬০ পর্যন্ত পূর্বের হিসেবে যাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ একটি বেশী হলে মুসিন্নার ৪০ ভাগের এক ভাগ, দুটি হলে ২০ ভাগের এক ভাগ, তিনটি হলে মুসিন্নার ৪০ ভাগের তিন ভাগ ওয়াজিব। আর আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে ৬০ পর্যন্ত অংশের কোন যাকাত নেই। ৬০ টি হলে তাতে ২টি তাবীআ'। অতঃপর ৭০ টিতে এটি মুসিন্না ও ১টি তাবীআ', ৮০ টিতে ২টি মুসিন্না, ৯০ টিতে ৩টি তাবীআ' ১০০ টিতে ২টি তাবীআ' ও ১টি মুসিন্না ওয়াজিব। এরূপে প্রতি দশে তাবীআ' ও মুসিন্না ফরয হওয়ার বিধান পরিবর্তন হবে। উল্লেখ্য যে, গরু ও মহিষের বিধান একই ধরনের।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله تَبِيْعٌ ঃ এক বছর বয়সী বাছুর-গরুকে تَبِيْعٌ ও দু'বছর বয়সী বাছুরকে مُسِنَّةٌ বলে। উল্লেখ্য যে, যাকাতের ক্ষেত্রে নর ও মাদী সম পর্যায়ে গণ্য।

قوله اَلْبَقَرُ ঃ بَقَرٌ অর্থ ফাড়া, বিদীর্ণ করা, সাধারণত গরু দ্বারা হাল চাষ করে যমীন ফাড়া হয়। এ কারণে গরু কে بقر নামে নাম করণ করা হয়েছে। تَبِيْع অর্থ تَابِع, অনুগত। একবছর বয়সী বাছুর সাধারণত তার মায়ের পিছনে পিছনে গমন করে একারণে একে تَبِيْع বলে। এ ভাবে مُسِنَّة - سَنَة হতে উদ্‌গত। অর্থ বয়স প্রাপ্ত। جَوَامِيْسُ - جَامُوْسُ এর বহুঃ মহিষ।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। গরুর যাকাতের নিয়ম কি এবং এর জন্যে শর্ত কি? বিস্তারিত লিখ।

২। টীকা লিখ تَبِيْع - مُسِنَّة - بَقَر

بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ

لَيْسَ فِىْ اَقَلَّ مِنْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً صَدَقَةٌ فَاِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا شَاةٌ اِلٰى مِائَةٍ وَّعِشْرِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلٰى مِائَتَيْنِ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا ثَلٰثُ شِيَاهٍ فَاِذَا بَلَغَتْ اَرْبَعَ مِائَةٍ فَفِيْهَا اَرْبَعُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِىْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَالضَّاْنُ وَالْمَعْزُ سَوَاءٌ -

ছাগলের যাকাত

অনুবাদ ॥ ৪০ এর কম ছাগলে যাকাত ওয়াজিব নয়। যখন ছাগল ৪০ টি হয়ে তা মাঠে বিচরণশীল ও পূর্ণ এক বছর তার ওপর অতিক্রান্ত হবে তখন ১টি ছাগল ওয়াজিব হবে। এটা ১২০ পর্যন্ত চলবে। এরপর ১টা বেশী হলে ২টি ছাগল ওয়াজিব হবে। এ ভাবে ২০০ পর্যন্ত। অতঃপর ১টি বেশী হলে ৩টি ছাগল ওয়াজিব। এরপর ৪০০ পর্যন্ত উন্নীত হলে ৪টি ছাগল ওয়াজিব। অতঃপর প্রতি শতে ১টি ছাগল ওয়াজিব। যাকাতের ক্ষেত্রে ভেড়াও দুম্বা সমপর্যায়ে গণ্য।

উটের যাকাত চিত্রে গৃহপালিত পশুর যাকাত

সংখ্যা	যাকাতের পরিমাণ	সংখ্যা	যাকাত	সংখ্যা	যাকাত	সংখ্যা	পরিমাণ
৫	১ ছাগল	১০	২ ছাগল	১৫	৩ ছাগল	২০	৪ ছাগল
২৫	১ বছরী বাছুর ১টি (১ বিনতে মাখায)	৩৬	২ বছরী ১ বাছুর (১ বিনতে লাবুন)	৪৬	৩ বছরী ১ বাছুর (১ হিক্কা)	৬১	৪ বছরী ১ বাছুর (১ জাযআ')
৭৬	২ বিনতে লাবুন	১২০	২ হিক্কা	১২৫	১ ছাগল ও ২ হিক্কা	১৩০	২ ছাগল ও ২ হিক্কা
১৩৫	৩ ছাগল ও ৫২ হিক্কা	১৪০	৪ ছাগল ও ২ হিক্কা	১৪৫	১ বিনতে মাখায ২ হিক্কা	১৫০	৩ হিক্কা
১৫৫	১ ছাগল ও ৩ হিক্কা	১৬০	২ ছাগল ও ৩ হিক্কা	১৬৫	৩ ছাগল ও ৩ হিক্কা	১৭০	৪ ছাগল ও ৩ হিক্কা
১৭৫	৩ হিক্কা, ১ বিনতে মাখায	১৮৬	৩ হিক্কা, ১ বিনতে লাবূন	১৯৬	৩ হিক্কা	২০০	৪ হিক্কা

গরুর যাকাত

৩০	১ তাবী' (১ বছরী বাছুর)	৪০	১ মুসিন্ন (২ বছরী বাছুর)	৬০	২ তাবী'	৭০	১ তাবী' ১ মুসিন্ন
৮০	২ মুসিন্ন	৯০	৩ তাবী'	১০০	১ মুসিন্ন ও ২ তাবী'		

ছাগল/ভেড়ার যাকাত

بَابُ زَكٰوةِ الْخَيْلِ

اِذَا كَانَتِ الْخَيْلُ سَائِمَةً ذُكُوْرًا وَّاُنَاثًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَعْطٰى مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِيْنَارًا وَاِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا فَاَعْطٰى عَنْ كُلِّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ فِىْ ذُكُوْرِهَا مُنْفَرِدَةً زَكٰوةٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَازَكٰوةَ فِى الْخَيْلِ وَلَاشَىْءَ فِى الْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ لِلتِّجَارَةِ وَلَيْسَ فِى الْفُصْلَانِ وَالْحُمْلَانِ وَالْعَجَاجِيْلِ زَكٰوةٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَعَهَا كِبَارٌ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى تَجِبُ فِيْهَا وَاحِدَةٌ مِنْهَا وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ مُسِنٌّ فَلَمْ يُوْجَدْ اَخَذَ الْمُصَدِّقُ اَعْلٰى مِنْهَا وَرَدَّ الْفَضْلَ اَوْ اَخَذَ دُوْنَهَا وَاَخَذَ الْفَضْلَ -

---

ঘোড়ার যাকাত

অনুবাদ ॥ ১. যদি ঘোড়া নর মাদী মিশ্রিত ও সায়েমা হয় এবং তার ওপর এক বছর অতিক্রান্ত হয় তাহলে তার যাকাতের ব্যাপারে মালিক ইচ্ছাধীন। চাইলে প্রতি ঘোড়ার বিনিময়ে একটি দীনার যাকাত দিবে। চাইলে ঘোড়ার মূল্য নির্ধারণ করে প্রতি ২০০ দিরহামে ৫দিরহাম যাকাত দিবে। ২. আবু হানীফা (র.) এর মতে শুধু মাদী ঘোড়া থাকলে তার যাকাত দিতে হবেনা। আর আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে ঘোড়ার কোন যাকাতই নেই। ৩. গাধা ও খচ্চরে ও যাকাত নেই। তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে হলে (ব্যবসার সম্পদ হিসেবে মূল্য নির্ধারণ করে তার যাকাত দিতে হবে। ৪. ইমাম আবু হানীফাও মুহাম্মদ (র.) এর মতে উট ও ছাগলের বাচ্চা এবং বাছুর গরুর কোন যাকাত নেই। (তবে সাথে বয়স্ক থাকলে তার যাকাত ওয়াজিব।) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে শুধু বাচ্চা থাকলেও তন্মধ্য হতে (নিসাব পরিমাণ হলে) ১টি যাকাত দেয়া ওয়াজিব। ৫. কারো ওপর যদি ১টি মুসিন্না (দু'বছর বয়সী বাছুর) ওয়াজিব হয় অথচ তার নিকট তা না থাকে তবে যাকাত আদায় কারী মুসিন্নার ওপরের গরু নিয়ে তার অতিরিক্ত মূল্য মালিক কে ফেরত দিবে। অথবা নিম্নস্তরের বাছুর নিয়ে অতিরিক্ত মূল্য আদায় করে নিবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ خَيْلٌ ঘোড়া, বহু ঃ خُيُوْل - ذُكُوْرٌ - ذَكَرٌ এর বহু ঃ নর, اُنَاثٌ- اُنْثٰى এর বহুঃ মাদী, قَوَّمَ মূল্য নির্ধারণ করবে। فُصْلَان - فَصِيْل এর বহু ঃ উটের বাচ্চা, حُمْلَان - حِمْل এর বহুঃ ছাগলে ছানা, عَجَاجِيْل عِجُوْلٌ- এর বহু ঃ গরুর বাছুর, بِغَال - بَغْل এর বহুঃ খচ্চর, حَمِيْرٌ - حِمَارٌ এর বহুঃ পালিত গাধা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله زَكٰوةُ الْخَيْلِ الخ ঃ আয়েম্মায়ে ছালাছাও সাহিবাঈনের মতে ঘোড়া সায়েমা ও নর মাদী মিশ্রিত হলেও তার যাকাত ফরয নয়। আবু হানীফা (র.) এর মতে সায়েমা হলে ঘোড়া প্রতি ১ দীনার বা মূল্য হিসেবে ৪০ টাকায় এক টাকা ওয়াজিব। আর কেবল এক শ্রেণী থাকলে প্রজনন মুনাফা না থাকায় ওয়াজিব নয়।

وَيَجُوْزُ دَفْعُ الْقِيْمَةِ فِى الزَّكٰوةِ وَلَيْسَ فِى الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُوْفَةِ زَكٰوةٌ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ خِيَارَ الْمَالِ وَلَا رُذَالَتَهُ وَيَأْخُذُ الْوَسَطَ وَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ فَاسْتَفَادَ فِىْ اَثْنَاءِ الْحَوْلِ مِنْ جِنْسِهٖ ضَمَّهُ اِلٰى مَالِهٖ وَزَكَّاهُ بِهٖ وَالسَّائِمَةُ هِىَ الَّتِىْ تَكْتَفِىْ بِالرَّعْىِ فِىْ اَكْثَرِ الْحَوْلِ فَاِنْ عَلَفَهَا نِصْفَ الْحَوْلِ اَوْ اَكْثَرَ فَلَا زَكٰوةَ فِيْهَا وَالزَّكٰوةُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تعالٰى فِى النِّصَابِ دُوْنَ الْعَفْوِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَ زُفَرُ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى تَجِبُ فِيْهِمَا وَاِذَا هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوْبِ الزَّكٰوةِ سَقَطَتْ وَاِنْ قَدَّمَ الزَّكٰوةَ عَلَى الْحَوْلِ هُوَ مَالِكٌ لِلنِّصَابِ جَازَ -

অনুবাদ॥ ৬. যাকাতের ক্ষেত্রে মূল্য আদায় করা ও জায়েয। ৭. কাজে ব্যবহৃত পশু, পরিবহনের জন্তু ও সংগৃহীত খাদ্যে প্রতিপালিত পশুর যাকাত ওয়াজিব নয়। ৮. যাকাত উসূলকারী সেরা মাল বা নিম্নতম মাল গ্রহণ করবেনা, বরং মধ্যম ধরনের মাল গ্রহণ করবে। ৯. যার নিসাব পরিমাণ মাল আছে বছরের মাঝে ঐ জাতীয় আরো কিছু মাল লাভ হল তাহলে বর্ধিত মাল কে উক্ত মালের সাথে মিলিয়ে তার যাকাত দিবে। ১০ সায়েমা ঐ পশু কে বলে যা বছরের বেশীর ভাগ (চারণ ভূমিতে) চরার ওপর নির্ভর করে। সুতরাং কোন পশু কে বছরের অর্ধেক বা ততোধিক মাস সংগৃহীত খাদ্য খাওয়ায় তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব নয়। ১০. ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র.) এর মতে নিসাবের ওপর যাকাত আরোপিত হয়। বাড়তি অংশে নয়। আর ইমাম মুহাম্মদ ও যুফর (র.) বলেন- উভয়ের ওপর যাকাত আরোপিত হয়। ১১. যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর সম্পদ বিনষ্ট হলে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। ১২. বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত দিলে যদি সে নিসাবের মালিক হয় তাহলে তা সহীহ হয়ে যাবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ قِيَمٌ- قِيْمَةٌ এর বহুঃ মূল্য عَوَامِلُ - عَامِلَةٌ এর বহুঃ কৃষি কাজে ব্যবহৃত পশু, حَوَامِلُ - حَامِلَةٌ এর বহু ঃ বোঝা বহন কারী, যা পরিবহনের কার্যে ব্যবহৃত, পশু عَلُوْفَةٌ সংগৃহীত খাদ্য গ্রহণ কারী পশু, رُذَالَةٌ নিম্নমাণের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله دَفْعُ الْقِيَمِ الخ ঃ যাকাতের ক্ষেত্রে বস্তুর মূল্য দেওয়াও জায়েয। কেনন যাকাতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল গরীব-মিসকীনের আহারের সংস্থান করা। আর এর জন্যে মূল্য বা নগদ অর্থ হলে তার বিভিন্ন প্রয়োজনে ইচ্ছেমত ব্যয় করতে সক্ষম হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে মূল্য দেওয়া জায়েয নেই কারণ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً الخ আয়াতে مِنْ اَمْوَالِهِمْ দ্বারা উক্ত মালেরই কিছু অংশ গ্রহণের নির্দেশ দেওয় হয়েছে। (অর্থাৎ خُذْ بَعْضَ اَمْوَالِهِمْ)

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। ঘোড়ার যাকাত সম্পর্কে যা জান লিখ।

بَابُ زَكٰوةِ الْفِضَّةِ

لَيْسَ فِىْ مَا دُوْنَ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ فَاِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَاشَىْءَ فِى الزِّيَادَةِ حَتّٰى تَبْلُغَ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا فَيَكُوْنُ فِيْهَا دِرْهَمٌ ثُمَّ فِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى مَازَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَزَكٰوتُهٗ بِحِسَابِهٖ وَاِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرَقِ الْفِضَّةَ فَهُوَ فِىْ حُكْمِ الْفِضَّةِ وَاِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْغِشُّ فَهُوَ فِىْ حُكْمِ الْعُرُوْضِ وَيُعْتَبَرُ اَنْ تَبْلُغَ قِيْمَتُهَا نِصَابًا -

---

রূপার যাকাত

অনুবাদ ॥ ১. দু'শ দিরহামের কমে যাকাত ওয়াজিব নয়। যখন (রূপার পরিমাণ) দু'শ দেরহাম হবে এবং পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হবে তাতে পাঁচ দেরহাম ওয়াজিব হবে। ৩. ২০০ হতে ২৪০ এর আগ পর্যন্ত বর্ধিত অংশে যাকাত নেই। যখন তা চল্লিশে উপনীত হবে তখন তাতে ১ দেরহাম ওয়াজিব হবে। অতঃপর আবু হানীফা (র.)-এর মতে প্রতি ৪০ দেরহামে ১ দেরহাম। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে ২০০ দেরহামের ওপর যা বর্ধিত হবে উক্ত হিসেবে তার যাকাত দিতে হবে। ৪. রূপার পাত বা রূপা নির্মিত কোন বস্তুতে রূপার অংশ বেশী হলে তা রূপার বিধানেই গণ্য হবে। আর খাদের অংশ বেশী হলে তা আসবাব পত্রের বিধানে গণ্য হবে। তখন তাতে যাকাত ওয়াজিব ধর্তব্য হওয়ার জন্যে তার মূল্য নিসাব পরিমাণ পৌছতে হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ فِضَّةٌ রূপা, دُوْنَ কমে, নীচে, غَالِب বেশী, প্রাধান্য, وَرَق রূপার পাত, এখানে রূপার জিনিষ পত্র উদ্দেশ্য। غَشّ খাদ, عُرُوْض আসবাব পত্র।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله مِائَتَىْ دِرْهَم الخ ঃ রূপার মূল নিসাব হল ২০০ দেরহাম। রৌপ্য মুদ্রাকে দেরহাম বলা হয়। তৎকালীন যুগের সাড়ে ৩ মাশায় এক দেরহাম হতো। আর ১২ মাশায় হয় এক তোলা। এ হিসেবে ২০০ দেরহাম = ৮৫০ মাশা বা ৫২ তোলা ৪ মাশা হয়। অর্থাৎ ২ মাশা কম সাড়ে বায়ান্ন তোলা। বর্তমান মেট্রিক পদ্ধতি হিসেবে হয় ৬১২. ৩৫ গ্রাম।

قوله وَاِنْ كَانَ الْغَالِبُ الخ ঃ সোনা -রূপার জিনিষে যদি খাদের ভাগ বেশী হয় তাহলে তা সোনা-রূপার নিসাবে গণ্য হবেনা। বরং তার মূল্য ধরে নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত ওয়াজিব, নতুবা নয়। আর খাদের পরিমাণ অর্ধেকের কম হলে খাদ ধর্তব্য হবেনা, সোনা-রূপার সাথেই খাদের ওযন ধরতে হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ - (অনুশীলনী)

১। রূপার যাকাতের নিসাব ও হুকুম কি? মতান্তরসহ লিখ

بَابُ زَكٰوةِ الذَّهَبِ

لَيْسَ فِيْ مَا دُوْنَ عِشْرِيْنَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِيْنَ مِثْقَالًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ ثُمَّ فِيْ كُلِّ أَرْبَعَةِ مَثَاقِيْلَ قِيْرَاطَانِ وَلَيْسَ فِيْ مَادُوْنَ أَرْبَعَةِ مَثَاقِيْلَ صَدَقَةٌ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى وَقَالَا مَازَادَ عَلَى الْعِشْرِيْنَ فَزَكٰوتُهُ بِحِسَابِهِ وَفِيْ تِبْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَحُلِيِّهِمَا وَالْاٰنِيَةِ مِنْهُمَا زَكٰوةٌ –

স্বর্ণের যাকাত

অনুবাদ ॥ ১. বিশ মেসকালের কম স্বর্ণে যাকাত ওয়াজিব নয়। ২০ মেসকাল হলে এবং তার ওপর এক বৎসর পেরিয়ে গেলে তাতে অর্ধ মেসকাল যাকাত ওয়াজিব হবে। অতঃপর প্রতি ৪ মেসকালে ২কীরাত। আবূ হানীফা (র.) এর মতে ৪ মেসকালের কমের অংশে যাকাত নেই। আর সাহিবাইন (র.) বলেন ২০ মেসকালের ওপর যতটুকুই বর্ধিত হবে পূর্বের হিসেবে তার যাকাত হবে। সোনা-রূপার (অশোধিত) খন্ড, অলংকার, পাত্র এ সবের ওপর ও যাকাত ওয়াজিব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ ذَهَبٌ স্বর্ণ, مِثْقَال ৮ রতিতে ১ মাশা, ৪ মাশা ৪ রতিতে ১ মেসকাল। এহিসেবে ২০ মিসকালে হয় ৯০ মাশা বা সাড়ে ৭ তোলা। বর্তমান প্রচলিত মেট্রিক পদ্ধতির ওজনে এক মেসকাল পরিমাণ হল ৪.৭৮৭৪ গ্রাম। সুতরাং ২০ মেসকাল (৪. ৮৭৭৪×২০= ৯৫. ৭৪৮০) বা সাড়ে পঁচানব্বই গ্রাম হয়। সুতরাং কারো নিকট এ পরিমাণ স্বর্ণ বা স্বর্ণের অলংকার চাই ব্যবহৃত হোক বা না হোক তার জন্যে প্রতি বছর এর ৪০ ভাগের ১ ভাগ বা সমপরিমাণ অর্থ যাকাত দিতে হবে। এমর্মে হযরত মুআয (র.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন- وَمِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ نِصْفُ مِثْقَالٍ

قوله وَحُلِيِّهِمَا الخ ঃ ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকারের ওপর ও যাকাত ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে ব্যবহার বৈধ অলংকারের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। আমাদের দলীল এই যে, একদা রাসূলুল্লাহ দু'জন মহিলাকে স্বর্ণের চুড়ি পরতে দেখে বললেন- তোমরা কি এর যাকাত দাও ? তারা বলল– না। অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন- তোমরা কি পসন্দ করতে যে, তোমাদিগকে আল্লাহ তাআলা আগুনের চুড়ি পরান ? তারা বলল- না! অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন– তাহলে এর যাকাত দাও। উল্লেখ্য যে, মহিলাদের সোনা-রুপার অলংকার থাকলে নিসাব পরিমাণ হলে তাদের ওপর এর যাকাত দেওয়া ওয়াজিব।

اَلتَّمْرِيْنْ – (অনুশীলনী)

১। স্বর্ণের যাকাতের নিসাব কি? মেট্রিক পদ্ধতিতে এর ওজন কতটুকু?

২। স্বর্ণের অলংকারের ওপর যাকাত ফরয কিনা? বিস্তারিত লিখ।

بَابُ زَكٰوةِ الْعُرُوْضِ

اَلزَّكٰوةُ وَاجِبَةٌ فِىْ عُرُوْضِ التِّجَارَةِ كَائِنَةً مَاكَانَتْ اِذَا بَلَغَتْ قِيْمَتُهَا نِصَابًا مِنَ الْوَرِقِ اَوِ الذَّهَبِ يُقَوِّمُهَا بِمَا هُوَ اَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ مِنْهُمَا وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُقَوِّمُ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ فَاِنِ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ الثَّمَنِ يُقَوِّمُ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ فِى الْمِصْرِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِغَالِبِ النَّقْدِ فِى الْمِصْرِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَاِذَا كَانَ النِّصَابُ كَامِلًا فِىْ طَرَفَيِ الْحَوْلِ فَنُقْصَانُهُ فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ لَايُسْقِطُ الزَّكٰوةَ وَيُضَمُّ قِيْمَةُ الْعُرُوْضِ اِلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذٰلِكَ يُضَمُّ الذَّهَبُ اِلَى الْفِضَّةِ بِالْقِيْمَةِ حَتّٰى يَتِمَّ النِّصَابُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَايُضَمُّ الذَّهَبُ اِلَى الْفِضَّةِ بِالْقِيْمَةِ وَيُضَمُّ بِالْاَجْزَاءِ -

---

পণ্য সামগ্রীর যাকাত

অনুবাদ ॥ ১. ব্যবসার পণ্য-দ্রব্য তা যে ধরণেরই হোক যদি মূল্য সোনা-রূপার কোন একটির নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার যাকাত ওয়াজিব। ২. মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে যেটা গরীব মিসকীনের জন্যে অধিক উপকারী হবে তার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। আর আবূ ইউসুফ (র.) বলেন- (সোনা-রূপার) যেটা দ্বারা পণ্য খরীদ করে তাদ্বারা মূল্য হিসেব করবে। সূতরাং সোনা-রূপা ছাড়া যদি অন্য কোন বস্তু দ্বারা খরীদ করে থাকে তাহলে শহরে বহুল প্রচলিত মুদ্রার হিসেবে মূল্য স্থির করবে। আর মুহাম্মদ (র.) বলেন সর্বাবস্থায় শহরের বহুল প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা হিসেব করতে হবে। ৩. বছরের দু'প্রান্তে নিসাব পূর্ণ থাকলে মধ্যবর্তী ঘাটতি দ্বারা যাকাত রহিত হবেনা। ৪. পণ্যের মূল্য সোনা-রূপার সাথে মিলাতে হবে। এভাবে আবু হানীফা (র.) এর মতে সোনা থাকলে মূল্যের দিক দিয়ে রূপার সাথে মিলাতে হবে। যাতে নিসাব পূর্ণ হয়। আর সাহিবাইন (র.) বলেন- মূল্যের দিক দিয়ে সোনা-রূপার সাথে মিলাতে হবেনা। বরং অংশের দিক দিয়ে মিলাতে হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ عُرُوْضٌ - عَرَضٌ এর বহু ঃ পণ্য-দ্রব্য, আসবাব-সামগ্রী। ثَمَنٌ মুদ্রা, সোনা-রূপা। مِصْرٌ শহর, নগর। اَلنَّقْدُ الْغَالِبُ বেশী প্রচলিত মুদ্রা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله عُرُوْضُ التِّجَارَةِ الخ ঃ ব্যবসারী পণ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্যে দুটি শর্ত– (ক) পণ্যের মূল্য নিসাব পরিমাণ হওয়া (খ) পূর্ণ বৎসর বা বসরের দু'প্রান্তে মজুদ থাকা।

ফায়েদা ঃ (ক) আয়ের উৎস বা উপকরণের ওপর যাকাত ফরয নয়। সুতরাং মেশিনারী বা ভাড়া প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্মিত গৃহ ইত্যাদির মূল্যের ওপর যাকাত ফরয নয়। বরং এ গুলো দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বা প্রাপ্ত অর্থের ওপর যাকাত আরোপিত হবে। তদরূপ নগদ অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদিতে যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে মৌলিক প্রয়োজনাদি, ঋণ ইত্যাদি হতে অতিরিক্ত হওয়া শর্ত।

(খ) প্রয়োজন দু'প্রকার (১) মৌলিক প্রয়োজন বলতে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উদ্দেশ্য। এ সকল উদ্দেশ্যে ব্যয় করার জন্যে টাকা মজুদ থাকলে তাতে যাকাত ওয়াজিব নয়। যেমন এক ব্যক্তির বসবাসের ঘরের প্রকট অভাব, এলক্ষে সে ৫০ হাজার টাকা যোগাড় করল, এবং বৎসর পূর্ণ হয়ে গেল। এক্ষেত্রে উক্ত টাকার যাকাত ওয়াজিব হবে না। (২) অমৌলিক প্রয়োজন তথা জীবন ধারণের জন্যে যা বিশেষ প্রয়োজনীয় নয় বরং ভোগ-বিলাসিতা ও আনন্দ-উৎসব মূলক প্রয়োজন যেমন, বিবাহ-শাদী, আকীকা, সন্তানের লেখাপড়া ইত্যাদি, বাসার ফ্রিজ, খাট-পালঙ্গ তৈরী, জাক জমক পূর্ণ ভবণ নির্মাণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত টাকা নিসাব পরিমাণ ও বৎসর অতিক্রান্ত হলে তার যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব। তবে কার্যে ব্যবহারের পর উক্ত সামগ্রীর যাকাত ওয়াজিব নয়।

اَلتَّمْرِيْنُ - (অনুশীলনী)

১। ব্যবসার পণ্যে যাকাত ফরযের শর্ত কি কি? প্রয়োজন কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত লিখ।

২। وَقَالَا لَا يُضَمُّ الذَّهَبُ اِلَى الْفِضَّةِ بِالْقِيْمَةِ وَيُضَمُّ بِالْاَجْزَاءِ ইবারতটির ব্যাখ্যা কি? বুঝিয়ে দাও।

بَابُ زَكٰوةِ الزُّرُوْعِ وَالثِّمَارِ

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ قَلِيْلِ مَا اَخْرَجَتْهُ الْاَرْضُ وَكَثِيْرِهِ الْعُشْرُ وَاجِبٌ سَوَاءٌ سُقِىَ سَيْحًا اَوْ سَقَتْهُ السَّمَاءُ اِلَّا الْحَطَبُ وَالْقَصَبُ وَالْحَشِيْشُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَايَجِبُ الْعُشْرُ اِلَّا فِيْمَا لَهٗ ثَمَرَةٌ بَاقِيَةٌ اِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ وَالْوَسَقُ سِتُّوْنَ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَيْسَ فِى الْخَضْرَوَاتِ عِنْدَهُمَا عُشْرٌ وَمَا سُقِىَ بِغَرْبٍ اَوْ دَالِيَةٍ اَوْ سَانِيَةٍ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْمَا يُوْسَقُ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْقُطْنِ يَجِبُ فِيْهِ الْعُشْرُ اِذَا بَلَغَتْ قِيْمَتُهٗ قِيْمَةَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ مِنْ اَدْنٰى مَايَدْخُلُ تَحْتَ الْوَسَقِ – وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَجِبُ الْعُشْرُ اِذَا بَلَغَ الْخَارِجُ خَمْسَةَ اَمْثَالٍ مِنْ اَعْلٰى مَايُقَدَّرُ بِهٖ نَوْعُهٗ فَاعْتُبِرَ فِى الْقُطْنِ خَمْسَةُ اَحْمَالٍ وَفِى الزَّعْفَرَانِ خَمْسَةُ اَمْنَاءٍ وَفِى الْعَسَلِ الْعُشْرُ اِذَا اُخِذَ مِنْ اَرْضِ الْعُشْرِ قَلَّ اَوْ كَثُرَ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَاشَىْءَ فِيْهِ حَتّٰى تَبْلُغَ عَشَرَةَ اَزْقَاقٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى خَمْسَةَ اَفْرَاقٍ وَالْفَرَقُ سِتَّةٌ وَّثَلٰثُوْنَ رَطْلًا بِالْعِرَاقِىِّ وَلَيْسَ فِى الْخَارِجِ مِنْ اَرْضِ الْخَرَاجِ عُشْرٌ –

শস্য-পণ্য ও ফলের যাকাত

অনুবাদ॥ ১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন- জমিতে উৎপাদিত ফসল কম হোক বা বেশী। তাতে উশর (এক দশমাংশ) ওয়াজিব। চাই তা খাল-নদী বা সেঞ্চনের পানি যা দ্বারাই সেঞ্চিত হোক। তবে কাঠ, বাঁশ ও ঘাস এর অন্তর্ভূক্ত নয়। আর সাহিবাইন (র.) বলেন– ঐ সকল ফল শস্য ছাড়া উশর ওয়াজিব নয় যা দীর্ঘস্থায়ী হয় (সংরক্ষণ করা যায়) এবং তা পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হয়। আর নবীজী (সা.) এর ৬০ ছা'তে হল এক ওয়াসাক। সাহিবাইনের মতে শাক সব্জিতে কোন উশর নেই। ২. বালতি, চর্কি, উট বা গরু মহিষ বাহিত পানি দ্বারা যে জমি সেঞ্চিত হয় উভয় মতানুযায়ী তাতে অর্ধ উশর ওয়াজিব। ৩. আবূ ইউসুফ (র.) বলেন- যে সব বস্তু ওয়াসাক দ্বারা পরিমাপ করা হয়না যেমন– জাফরান, তূলা প্রভৃতি তাতে উশর ঐ সময় ওয়াজিব হবে যখন তার মূল্যে ওয়াসাক দ্বারা পরিমাপকৃত নিম্নতম বস্তুর মূল্যের সমপরিমাণ হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন– এ জাতীয় উৎপাদিত দ্রব্যে ঐ সময় উশর ওয়াজিব

হবে যখন উৎপাদিত দ্রব্য পরিমাপের সর্বোচ্চ স্তরের ৫ গুণ হবে। সুতরাং তুলার ক্ষেত্রে পাঁচ বান্ডেল (গাইট) ও জাফরানের ক্ষেত্রে ৫ সের পরিমাণ হলে উশর ওয়াজিব হবে। উশরী ভূমিতে মধূ আহরিত হলে তাতে উশর ওয়াজিব চাই কম হোক বা বেশী। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন- দশ মশক (চর্ম নির্মিত পাত্র) না হওয়া পর্যন্ত উশর ওয়াজিব হবেনা। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন পাঁচ ফারাক না হওয়া পর্যন্ত উশর ওয়াজিব হবেনা। আর ফারাক হল ইরাকী রতলের ৩৬ রতল সমপরিমাণ-খেরাজী ভূমিতে উৎপাদিত দ্রব্যে উশর ওয়াজিব নয়।

<u>শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ</u> زُرُوعٌ - زَرْعٌ এর বহু ঃ শস্য, ফসল, ثِمَارٌ - ثَمَرٌ এর বহু ঃ ফল, عُشْرٌ (দশ ভাগের ১ ভাগ) $\frac{১}{১০}$ سقى সেঞ্চিত হয় পানি পরিমাপ পাত্র, سيحا সেঞ্চন করে, حطب কাঠ, قصب বাঁশ, حشيش ঘাস وَسْقٌ , ৬০ ছা'তে এক ওয়াসাক হয়, خَضْرَوَاتٌ শাক-সব্জী, غَرْب বড় বালতি, دَالِيَة চর্কি, سَانِيَة পানি বহণ কারী উটনী, قُطْنٌ তুলা। اَلْخَارِجُ বহির্গমনকারী, উৎপাদিত অর্থে। خَمْسَةُ اَمْثَالٍ পাঁচ গুণ, اَحْمَال - حِمْل এর বহু ঃ বোঝা, বান্ডেল, গাইট, اَمْنَاء - مَنٌّ এর বহু ঃ সের اَزْقَاقٌ - زِقٌّ এর বহু ঃ ৫০ সের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন চর্মনির্মিত পাত্র اَفْرَاقٌ - فَرَقٌ এর বহুঃ ১৮ সের সম পরিমাণ ওযন।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥</u> قوله لَايَجِبُ الْعُشْرُالخ ঃ সাহিবাইনের মতে যে সব বস্তু পচনশীল নয় তথা রোদে শুকান ব্যতিত দীর্ঘ দিন সংরক্ষণ করা যায় তাতে উশর ওয়াজিব। যেমন– ধান, গম, যব, সোলা, মুশুরী, খেজুর, কিসমিস, তিল, শরিষা ও রকমারী ফল প্রভৃতি। তবে তা কমপক্ষে ৫ ওয়াসাক পরিমাণ এবং উশরী জমিতে উৎপাদিত হতে হবে।

<u>উশরী ও খেরাজী জমির পরিচয় ঃ</u> যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই যে দেশ সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয় এবং তার অধিবাসী গণ ও মুসলমান হয়ে যায়, বা যে বিজিত রাষ্ট্রের ভূমি মুসলিম যোদ্ধাদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয় উক্ত ভূমি চিরদিনের জন্যে উশরী গণ্য হয়। অপর দিকে যে রাষ্ট্র সন্ধি বা যুদ্ধের দ্বারা বিজিত হওয়ার পর তদানিন্তন খলীফা উক্ত ভূমি কে উক্ত রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধীনে রেখে দেয়, আর বিনিময়ে তাদের থেকে বাৎসরিক ট্যাকস বা রাজস্ব আদায় করে তাকে খেরাজী জমি বলে। উক্ত জমিতে উৎপাদিত ফসলে উশর ওয়াজিব নয়। ইমাম আবূ হানীফা ও সাহিবাইন (র.) এর মতে উশর ওয়াজিব হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মৌলিক দুটি পার্থক্য আছে। যথা – (১) ইমাম সাহেব (র.) এর মতে কাঠ, বাঁশ ও ঘাস ব্যতিত উশরী ভূমিতে উৎপাদিত সকল বস্তুর উশর ওয়াজিব। আর সাহিবাইনের মতে এর জন্য পচনশীল না হওয়া শর্ত (২) ইমাম সাহেবের মতে উৎপাদিত ফসল বা ফলে মূল্যের পরিমাণ ৫ ওয়াসাক (৫ মন ১০ সের) পরিমাণ হওয়া শর্ত নয়। বরং কম বেশী যাই হোক উক্ত হিসেবে উশর ওয়াজিব। কিন্তু সাহিবাইনের মতে ৫ ও য়াসাক পরিমাণ হওয়া শর্ত।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। عُشْر অর্থ কি? কোন্ ধরনের বস্তুতে উশর ওয়াজিব? বিস্তারিত লিখ।

২। উশরী ও খেরাজী জমির পরিচয় দাও। উশর ওয়াজিবের ব্যাপারে হানাফী ইমামগণের মধ্যে কি মতভেদ আছে? লিখ।

بَابُ مَنْ يَّجُوْزُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إِلَيْهِ وَمَنْ لَّا يَجُوْزُ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ الْاٰيَةُ فَهٰذِهِ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ فَقَدْ سَقَطَ مِنْهَا الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَعَزَّ الْاِسْلَامَ وَاَغْنٰى عَنْهُمْ وَالْفَقِيْرُ مَنْ لَهُ اَدْنٰى شَيْءٍ وَالْمِسْكِيْنُ مَنْ لَاشَيْءَ لَهُ وَالْعَامِلُ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الْاِمَامُ إِنْ عَمِلَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَفِى الرِّقَابِ اَنْ يُّعَانَ الْمُكَاتَبُوْنَ فِىْ فَكِّ رِقَابِهِمْ وَالْغَارِمُ مَنْ لَّزِمَهُ دَيْنٌ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ۔

(যাকাতের হকদার) কাকে যাকাত দেওয়া জায়েয এবং কাকে নাজায়েয

অনুবাদ ॥ ১. আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন যাকাত কেবল ফকীর, মিসকীনের (যাকাত উসূল কারী, ইসলামের প্রতি অনুরাগী অথচ দরিদ্র, দাসত্ব মুক্তি, ঋণগ্রস্থ, মুজাহিদ ও মুসাফির) গণের প্রাপ্য। إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الخ অত্র আয়াতে ৮ শ্রেণীর মানুষের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এর মধ্যহতে মুআল্লাফাতুল কুলূব তথা দরিদ্র অমুসলিমদিগকে ইসলামের প্রতি অনুরাগী করার উদ্দেশ্যে যাকাত দেয়ার অনুমতি রহিত হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ তাআ'লা ইসলামকে শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করেছেন। ২. ফকীর সে যার সামান্য সম্পদ আছে। আর যার কিছুই নেই সে হল মিসকীন। যাকাত উসূল কারীকে সরকার (গভর্ণর) তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করলে সে অনুপাতে দান করবে। আর মুক্তি পণ হল স্বাধীন করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদত্ব মুকাতাব গোলামদিগকে তাদের মুক্তি পণে সহায়তা করা, আর গারিম হল ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি। আল্লাহর পথ বলতে রসদ ও যুদ্ধাস্ত্রহীন ইসলামী সৈনিক উদ্দেশ্য।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ أَصْنَاف প্রকার, শ্রেণী, صِنْفٌ এর বহু ঃ مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبُ যাদের মন জয় করা কাম্য। أَعَزَّ শক্তিশালী করেছেন। اَغْنٰى স্বনির্ভর করেছেন। عَامِلٌ কর্মচারী, যাকাত ইত্যাদি রাজস্ব আদায় কারী। رِقَابٌ - رَاقِبَة এর বহুঃ ঘাড়, এস্থলে গোলাম, ক্রীতদাস। يُعَانُ সহায়তা করা হয়, مُكَاتَبُوْن - مُكَاتَبٌ এর বহুঃ মনিব যে গোলামকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ যোগাড়ের বিনিময় স্বাধীন করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। فَكٌّ ছাড়ান, মুক্ত করা। اَلْغُزَاةُ রণসম্বলহীন যোদ্ধা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله مُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ الخ ঃ যাদের মন জয় করা কাম্য। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি কল্পে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে যাকাত প্রদান করা হতো। তাদিগকে মুআল্লাফাতুল কুলূব বলে। এর তিনটি শ্রেণী ছিল। (ক) কাফের অথচ ইসলামের সহায়ক। এদেরকে যাকাতের মাল দেয়ার দ্বারা ইসলামে দাখিল হওয়া কাম্য ছিল। (খ) এমন কাফের যাদের শত্রুতা ও অনিষ্টতা হতে মুক্তি পাওয়া কাম্য ছিল। (গ) নব মুসলিম যাদের মন ইসলামের উপর স্থিতিশীল হয়নি তাদিগকে স্থিতিশীল করার লক্ষে যাকাত দেয়া হতো। হযরত আবু বকর (রা.) এর খেলাফত আমলে মুসলমানদের শক্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এ তিন শ্রেণীকে যাকাত প্রদান বন্ধ করা হয়। তারা হযরত উমরের নিকট আবেদন পেশ করলে তিনি তা ছিড়ে ফেলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ দ্বারা দলীল পেশ করে এ শ্রেণীকে যাকাতের হকদার বহির্ভূত বলেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) সহ অন্যান্য ইমামগণ এ হুকুম এখনো বলবৎ বলেন। অবশ্য নফল দান সাদকা দেয়া জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন মতনৈক্য নেই।

وَابْنُ السَّبِيْلُ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِيْ وَطَنِهِ وَهُوَ فِيْ مَكَانٍ اٰخَرَ لَاشَئَ لَهُ فِيْهِ فَهٰذِهِ جِهَاتُ الزَّكٰوةِ وَلِلْمَالِكِ اَنْ يَّدْفَعَ اِلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَهُ اَنْ يَّقْتَصِرَ عَلٰى صِنْفٍ وَاحِدٍ - وَلَايَجُوْزُ اَنْ يَّدْفَعَ الزَّكٰوةَ اِلٰى ذِمِّيٍّ وَلَايُبْنٰى بِهَا مَسْجِدٌ وَلَا يُكَفَّنُ بِهَا مَيِّتٌ وَلَايُشْتَرٰى بِهَا رَقَبَةٌ يُعْتَقُ وَلَاتُدْفَعُ اِلٰى غَنِيٍّ وَلَايَدْفَعُ الْمُزَكِّيْ زَكٰوتَهُ اِلٰى اَبِيْهِ وَجَدِّهٖ وَاِنْ عَلَاهُ وَلَا اِلٰى وَلَدِهٖ وَ وَلَدِ وَلَدِهٖ وَاِنْ سَفُلَ وَلَا اِلٰى اُمِّهٖ وَجَدَّاتِهٖ وَاِنْ عَلَتْ وَلَا اِلٰى اِمْرَأَتِهٖ وَلَاتَدْفَعُ الْمَرْأَةُ اِلٰى زَوْجِهَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا تَدْفَعُ اِلَيْهِ وَلَا يَدْفَعُ اِلٰى مُكَاتَبِهٖ وَلَامَمْلُوْكِهٖ وَلَامَمْلُوْكِ غَنِيٍّ وَ وَلَدِ غَنِيٍّ اِذَاكَانَ صَغِيْرًا وَلَايَدْفَعُ اِلٰى بَنِيْ هَاشِمٍ وَهُمْ اٰلُ عَلِيٍّ وَاٰلُ عَبَّاسٍ وَ اٰلُ جَعْفَرَ وَ اٰلُ عَقِيْلٍ وَاٰلُ حَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمَوَالِيْهِمْ -

---

অনুবাদ ॥ ইবনুস সাবীল বা (পর্যটক মুসাফির) বলতে ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যার বাড়ীতে সম্পদ আছে কিন্ত সে রয়েছে অন্যত্র, যেখানে তার কিছুই নেই। এসমস্ত হল যাকাতের হকদার। ৩. যাকাতদাতার অধিকার আছে ইচ্ছে করলে এদের সকল শ্রেণীকেই দিতে পারে, ইচ্ছে করলে যে কোন এক শ্রেণীকেও দিতে পারে।

যাদেরকে যাকাত দেওয়া না জায়েয ঃ ১. কোন জিম্মী তথা অমুসলিম কে যাকাত দেয়া নাজায়েয। যাকাতের অর্থ দ্বারা মসজিদ (মাদ্রাসা) নির্মাণ করা যাবেনা। মৃত কে তাদ্বারা কাফন দেওয়া যাবেনা। ঋণী ব্যক্তিকে দান করা যাবেনা। ২. যাকাত দ্বাতা স্বীয় বাপ-দাদা কে যাকাত দিতে পারবেনা যদিও উর্ধ্বতন হয়। নিজ পুত্র কন্যা কে দিতে পারবেনা তা যতই উর্ধতন হোক। স্বীয় স্ত্রী কে দিতে পারবেনা। ৩. ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে স্ত্রী তার স্বামী কে যাকাত দিতে পারবেনা। সাহিবাইনের মতে দিতে পারবে। ৪. নিজ মুকাতাব গোলাম কে, কোন ধনী ব্যক্তির গোলাম, ও ধনী ব্যক্তির নাবালেগ সন্তানকে যাকাত প্রদান করবেনা। ৫. হাশেমীগণ কে যাকাত দিবেনা। হযরত আলী, আব্বাস, জা'ফর আ'কীল ও হারেস ইবনে আব্দুল মুত্তালি (রা)-এর বংশধর কে হাশেমী বলা হয়। হাশেমীগণের গোলামদের ও যাকাত দিবেনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله ذِمِّيٍّ ঃ যে সকল অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রে কর দিয়ে বসবাস করে এবং সরকার তাদের জানমাল ও ইয্যত-আবরু হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদিগকে জিম্মী বলে। উল্লেখ্য যে, অপরাপর মুসলমানদের জানমাল ও ইয্যতের ন্যায় জিম্মীদের জান-মাল ও ইয্যত আবরু হেফাযত করা সকলের দায়িত্ব।

قوله وَلَايُبْنٰى بِهَا مَسْجِدٌ ঃ মসজিদ-মাদ্রাসা, স্কুল, ইত্যাদি নির্মাণ, কাফন-দাফন ইত্যাদি কাজ বাবদ যাকাতের অর্থ ব্যয় নাজায়েয। কারণ যাকাত আদায় হওয়ার জন্যে তার প্রকৃত হকদার কে মালিক বানান শর্ত। অথচ এ সব ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বিশেষ কে মালিক বানান সম্ভব নয়।

قوله اِلٰى بَنِيْ هَاشِمٍ ঃ কারণ রাসূলের বংশ হওয়ার কারণে তাঁরা সর্ব্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। সুতরাং তাদিগকে যাকাতের হেয় মাল প্রদান করা যাবেনা। এমর্মে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন-

يَابَنِيْ هَاشِمٍ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ غُسَالَةَ اَمْوَالِ النَّاسِ وَاَوْسَاخَهُمْ وَعَوَّضَ عَنْكُمْ خُمُسَ الْخُمُسِ

অর্থাৎ হে বনী হাশিম ! তোমাদের জন্যে আল্লাহ মানুষের মালের ময়লা-আবর্জনা হারাম করেছেন। এর পরিবর্তে তোমাদিগের জন্য মালে গণীমতের ১০ ভাগের এক ভাগ বরাদ্দ করা হয়েছে।

وَقَالَ اَبُوْحِنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا دَفَعَ الزَّكٰوةَ اِلٰى رَجُلٍ يَظُنُّهُ فَقِيْرًا ثُمَّ بَانَ اَنَّهُ غَنِيٌّ اَوْهَاشِمِيٌّ اَوْ كَافِرٌ اَوْدَفَعَ فِيْ ظُلْمَةٍ اِلٰى فَقِيْرٍ ثُمَّ بَانَ اَنَّهُ اَبُوْهُ اَوْ اِبْنُهُ فَلَا اِعَادَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَعَلَيْهِ الْاِعَادَةُ وَلَوْدَفَعَ اِلٰى شَخْصٍ ثُمَّ عَلِمَ اَنَّهُ عَبْدُهُ اَوْمُكَاتَبُهُ يَجْزِ فِيْ قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا وَلَايَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكٰوةِ اِلٰى مَنْ يَّمْلِكُ نِصَابًا مِنْ اَيِّ مَالٍ كَانَ وَيَجُوْزُ دَفْعُهَا اِلٰى مَنْ يَّمْلِكُ اَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ وَاِنْ كَانَ صَحِيْحًا مُكْتَسِبًا وَيُكْرَهُ نَقْلُ الزَّكٰوةِ مِنْ بَلَدٍ اِلٰى بَلَدٍ اٰخَرَ وَاِنَّمَا يُفَرَّقُ صَدَقَةُ كُلِّ قَوْمٍ فِيْهِمْ اِلَّا اَنْ يَّحْتَاجَ اَنْ يَّنْقُلَهَا الْاِنْسَانُ اِلٰى قَرَابَتِهِ اَوْ اِلٰى قَوْمٍ هُمْ اَحْوَجُ اِلَيْهِ مِنْ اَهْلِ بَلَدِهٖ-

---

অনুবাদ ॥ ৬. ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) বলেন- যদি কেউ কাউকে দরিদ্র মনে করে যাকাত প্রদান করে, অতঃপর জানতে পারল যে, লোকটি ঋণী, বা হাশেমী বা কাফের। অথবা কাউকে রাতের অন্ধকারে দান করল। অতঃপর প্রকাশ পেল যে, সে তার পিতা বা পুত্র তাহলে যাকাতদাতার জন্যে পুনঃবার যাকাত দেওয়া জরুরী নয়। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন- তার ওপর পূণঃবার যাকাত দেওয়া জরুরী। ৭. যদি কেউ যাকাত প্রদানের পর জানতে পারল যে, সে সেতার গোলাম বা মুকাতাব তাহলে কারো মতে তার এ যাকাত যথেষ্ট হবেনা। ৮. যে ব্যক্তি কোন প্রকার নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয় তাকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়। যে নিসাবের কম মালের মালিক তাকে দেয়া জায়েয। যদিও সে সুস্থ সবল ও উপার্জনক্ষম হয়। ৯. যাকাতের মাল এক শহর (স্থান) হতে অন্য শহরে (স্থানে) স্থানান্তর করা মাকরূহ। যাকাতের মাল সেখানকার গরীব দরিদ্র শ্রেণীর মাঝে বন্টন করতে হবে। তবে যদি কেউ অন্য শহরে তার নিকটাত্মীয় বা অধিক দরিদ্র পীড়িত ব্যক্তি বর্গের জন্যে (এক শহর হতে অন্য শহরে) স্থানান্তর করে তা জায়েয।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَلَارَجُلٌ يَظُنُّهُ الخ ঃ অর্থাৎ কাউকে যাকাতের হকদার ধারণা করে যাকাত দেয়ার সময় তাকে মালিক বানালে সহীহ হয়ে যায়। সুতরাং যেহেতু গ্রহিতা তার মালিক হয়ে যাচ্ছে একারণে যাকাত দাতা তার যিম্মাদারী মুক্ত হয়ে যাবে। পুনরায় যাকাত দিতে হবেনা। তবে যদি অনুমান বা ধারণা এর বিপরীত থাকে বা কোন ধারণা ছাড়াই স্বাভাবিক ভাবে দিয়ে দেয় তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে যাকাত আদায় হবেনা। পুণঃবার যাকাত দিতে হবে। আর মুকাতাব বা গোলামের ক্ষেত্রে হকদার ধারণা করে দেয়া সত্ত্বে আদায় না হওয়ার কারণ এইযে, মুকাতাব বা গোলামের নিজস্ব কোন মালিকানা থাকেনা। বরং স্বয়ং সেই তাদের মালিক। সুতরাং এক্ষেত্রে উক্ত মাল দাতার নিকটই ফিরে আসে। একারণে পুনঃবার যাকাত দিতে হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ - (অনুশীলনী)

১। কাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে এবং কাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না। বিস্তারিত উল্লেখ কর।

২। مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبُ বলতে কি বুঝ? এদের কয়টি শ্রেণী এবং এদেরকে যাকাত দেয়ার হুকুম কি?

৩। স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে বা পুত্র তার পিতাকে যাকাত দিতে পারবে কিনা?

৪। মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ কল্পে যাকাত দেয়া জায়েয কিনা? জায়েয না হলে তার কারণ কি?

৫। যাকাতের অর্থ এক শহর হতে অন্য শহরে স্থানান্তর করা বৈধ কিনা? বিস্তারিত লিখ।

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ مَالِكًا لِمِقْدَارِ النِّصَابِ فَاضِلًا عَنْ مَسْكَنِهِ وَثِيَابِهِ وَأَثَاثِهِ وَفَرَسِهِ وَسِلَاحِهِ وَعَبِيْدِهِ لِلْخِدْمَةِ يُخْرِجُ ذٰلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ وَعَبِيْدِهِ لِلْخِدْمَةِ وَلَا يُؤَدِّيْ عَنْ زَوْجَتِهِ وَلَا عَنْ أَوْلَادِهِ الْكِبَارِ وَ إِنْ كَانُوْا فِيْ عِيَالِهِ وَلَا يُخْرِجُ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَلَا عَنْ مَمَالِيْكِهِ لِلتِّجَارَةِ وَ الْعَبْدِ بَيْنَ الشَّرِيْكَيْنِ لَافِطْرَةَ عَلٰى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيُؤَدِّي الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ وَ الْفِطْرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيْبٍ أَوْ شَعِيْرٍ وَالصَّاعُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رَطْلٍ وَ وُجُوْبُ الْفِطْرَةِ يَتَعَلَّقُ بِطُلُوْعِ الْفَجْرِ الثَّانِيْ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ فَمَنْ مَاتَ قَبْلَ ذٰلِكَ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ وَمَنْ أَسْلَمَ أَوْ وُلِدَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرِجَ النَّاسُ الْفِطْرَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوْجِ إِلَى الْمُصَلّٰى فَإِنْ قَدَّمُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ وَإِنْ أَخَّرُوْهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْقُطْ وَكَانَ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهَا -

---

সাদকায়ে ফিত্‌র প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ ১. যে কোন স্বাধীন মুসলমান ব্যক্তির ওপর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব যখন সে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হবে। আর তা (নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু যথা) তার গৃহ, পোশাক, আসবাব-পত্র, (ব্যবহারের) ঘোড়া, যুদ্ধাস্ত্র, কাজের গোলাম হতে অতিরিক্ত হবে। ২. সাদকায়ে ফিত্‌র প্রদান করবে নিজের পক্ষ হতে এবং নিজ নাবালেগ সন্তানাদিও গোলামের পক্ষ হতে। নিজ স্ত্রী ও বালেগ সন্তানাদির পক্ষহতে সাদকায়ে ফিত্‌র আদায় করতে হবেনা। যদি ও তারা তার পরিবারভুক্ত হয়। ৩. স্বীয় মুকাতাব ও ব্যবসার গোলাম ও শরীকী গোলামের পক্ষ হতে ও সাদকায়ে ফিত্‌র আদায় করবেনা। এদের কারো ওপর ফিত্‌রা ওয়াজিব নয়। ৪. মুসলমান গোলাম তার কাফের গোলামের পক্ষ হতে ও ফিত্‌রা আদায় করবে।

ফিত্‌রার পরিমাণ ঃ ১. ফিত্‌রার পরিমাণ হল– অর্ধ ছা'গম বা এক ছা' খেজুর বা কিশমিশ। ২. ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে ছা' হল ইরাকী রতলের ৮ রতল পরিমাণ। আর আবূ

ইউসুফ (র.) বলেন, এক ছা' হল ৫ রতল ও ১ রতলের $\frac{১}{৩}$ অংশ। ৩. সাদকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার সময় হল ঈদুল ফিত্‌রের দিবসের সুব্‌হে সাদিক। অতএব কেউ এর পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে তার পক্ষ হতে সাদকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব হবেনা। ৪. ঈদুল ফিত্‌র দিবসে ঈদগায় গমনের প্রাক্কালে ফিত্‌রা আদায় করা মুস্তাহাব। ঈদের দিনের আগে দিলেও তা জায়েয হয়ে যাবে। আর ঈদের দিন থেকে বিলম্বিত করলে তা রহিত হবেনা। বরং পরবর্তীতে তা আদায় করা ওয়াজিব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله صَدَقَةُ الْفِطْرِالخ ঃ الْفِطْر শব্দের প্রতি صَدَقَة শব্দের اِضَافَت (সম্বন্ধ) اِضَافَةُ الشَّيْءِ اِلى شَرْطِهِ (শর্তের প্রতি সম্বন্ধ করণ) বা اِضَافَةُ الشَّيْءِ اِلى سَبَبِهِ তথা কারণের প্রতি সম্বন্ধ করণের অন্তর্গত। কেননা ইফ্‌তারের শর্তে বা কারণে এ সাদকাটি ওয়াজিব হয়।

সাদকায়ে ফিত্‌রের গুরুত্ব ও উপকারিতা ঃ

(ক) ফিৎরা আদায়ের দ্বারা রোযার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা হয়।

(খ) রোযা সমাপ্তির ও গোনাহ মাফের আনন্দ প্রকাশের নিমিত্তে আল্লাহর শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা আদায় হয়।

(গ) ঈদের আনন্দকে নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গরীব-দুঃখী ও অনাথদের আহার বিহারের সুবন্দবস্ত করে তাদিগকে ও শরীক রাখা হয়।

قوله نِصْفُ صَاعٍ الخ ঃ তরফাইনের বর্ণনামতে এক সা' = ৩ সের ৫৮.৮ তোলা, আর কেজীর হিসেবে হয় ৩ কেজী ৪৮৫. ২০ গ্রাম। সুতরাং, অর্ধ সা' = ১ সের ৬৯. ৪ তোলা বা ১ কেজী ৭৪২. ৬০ গ্রাম। কেননা - ২০ আস্তার = ১ রতল। আর ১ আস্তার = ৪ $\frac{১১}{২০}$ মেছকাল। অতএব ৮ রতল বা ১ সা' = ৭২৮ মেসকাল। আর ৩৯. ৪০ রতি তে হয় ১ মেছকাল,ও ৯৬ রতিতে হয় ১ তোলা বা ১১. ৬৬৪ গ্রাম।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। সাদকায়ে ফিতর কার ওপর ওয়াজিব? কাদের পক্ষ হতে সাদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব বা ওয়াজিব নয় বিশদভাবে লিখ।

২। সাদকায়ে ফিতরের পরিমাণ কতটুকু?

৩। ইসলামে সাদকায়ে ফিতরের গুরুত্ব ও উপকারীতা সম্পর্কে যা জান লিখ।

كِتَابُ الصَّوْمِ

اَلصَّوْمُ ضَرْبَانِ وَاجِبٌ وَنَفْلٌ فَالْوَاجِبُ ضَرْبَانِ مِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِزَمَانٍ بِعَيْنِهِ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ فَيَجُوْزُ صَوْمُهُ بِنِيَّةٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ حَتّٰى اَصْبَحَ اَجْزَأَتْهُ النِّيَّةُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ وَالضَّرْبُ الثَّانِىْ مَا يَثْبُتُ فِى الذِّمَّةِ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَالْكَفَّارَاتِ فَلَا يَجُوْزُ صَوْمُهُ اِلَّا بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ وَكَذٰلِكَ صَوْمُ الظِّهَارِ وَالنَّفْلِ كُلِّهِ يَجُوْزُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَيَنْبَغِىْ لِلنَّاسِ اَنْ يَّلْتَمِسُوا الْهِلَالَ فِى الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ فَاِنْ رَأَوْهُ صَامُوْا وَاِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ اَكْمَلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلٰثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامُوْا وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ صَامَ وَاِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْاِمَامُ شَهَادَتَهُ -

---

রোযা অধ্যায়

অনুবাদ॥ রোযার প্রকারভেদ ও নিয়ত প্রসঙ্গ ঃ রোযা মূলত ঃ দু'প্রকার (ক) ওয়াজিব বা ফরয, ও (খ) নফল। ওয়াজিব রোযা আবার দু' প্রকার (এক) নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন রমাযানের রোযা ও নির্দিষ্ট দিনের রোযা। এধরণের রোযার জন্য রাতের যে কোন অংশে নিয়ত করা জায়েয। যদি নিয়ত না করে এমতাবস্থায় ভোর হয়ে যায় তাহলে ভোর হতে পশ্চিমাকাশে সূর্য হেলে পড়ার মধ্যে নিয়ত করার দ্বারা তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। (দুই) দ্বিতীয় প্রকার হল যা যিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন রমাযানের কাযা রোযা, সাধারণ মান্নত ও কাফফারার রোযা, এধরণের রোযা রাত্রি কালীন নিয়ত ছাড়া সহীহ হবেনা। এভাবে যিহারের রোযা ও। আর বাকী সকল প্রকার নফল রোযা দুপুরের (সূর্য হেলে যাওয়ার) আগ পর্যন্ত নিয়তের দ্বারা জায়েয।

চাঁদ দেখা প্রসঙ্গ ঃ ১. মুসলমানদের জন্যে ২৯ শে শা'বানের সন্ধায় চাঁদ অনুসন্ধান করা উচিৎ। চাঁদ দেখা গেলে রোযা রাখবে। আর দেখা না গেলে শা'বানের ৩০ তারিখ পূর্ণ করবে। অতঃপর রোযা রাখবে। ২. কেউ একাকী রমাযানের চাঁদ দেখলে সে একাই রোযা রাখবে। যদিও মুসলিম শাসক তার সাক্ষ্য গ্রহণ না করে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلصَّوْمُ এর আভিধানিক اَلْاِمْسَاكُ عَنِ الشَّيْءِ مُطْلَقًا অর্থ বিরত থাকা পরিভাষায়- اَلصَّوْمُ اِمْسَاكٌ مَخْصُوْصٌ فِىْ زَمَانٍ مَخْصُوْصٍ عَنْ شَيْءٍ مَخْصُوْصٍ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ

অর্থাৎ- সুবহে সাদিকের প্রাক্কাল হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সঙ্গমও পানাহার হতে বিরত থাকা কে সাওম বলে। যেহেতু এটা পূর্ণ দিবস ব্যাপৃত একারণে ফার্সীতে একে روزه বলে। ২য় হিজরী সনের শা'বান মাসে রমাযানের রোযা ফরয হয়। এ মর্মে فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ আয়াত নাযিল হয়। রাসূল (সা.) উক্ত রমাযান হতে মোট নয়বার রমাযানের রোযা রাখেন।

قوله وَاجِبٌ وَنَفْلٌ ঃ ফিক্হের পরিভাষায় ফরযও ওয়াজিব গুরুত্বের দিক দিয়ে সমপর্যায়ে, তদরূপ সুন্নত ও নফল ও একই পর্যায়ে গণ্য। এ কারণে মুসান্নিফ (র.) দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন।

وَإِذَا كَانَ فِى السَّمَاءِ عِلَّةٌ قَبِلَ الْإِمَامُ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ رَجُلًا كَانَ أَوْ اِمْرَأَةً حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى السَّمَاءِ عِلَّةٌ تُقْبَلِ الشَّهَادَةُ حَتَّى يَرَاهُ جَمْعٌ كَثِيْرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ وَ وَقْتُ الصَّوْمِ مِنْ حِيْنِ طُلُوْعِ الْفَجْرِ الثَّانِى إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَالصَّوْمُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ نَهَارًا مَعَ النِّيَّةِ ـ

অনুবাদ ॥ ২. আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে চাঁদ দেখার ব্যাপারে ইমাম একজন নিষ্ঠাবান সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করবে। চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা, স্বাধীন হোক বা গোলাম। আর আকাশ মেঘাচ্ছান্ন না থাকলে ঐ সময় পর্যন্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করবেনা যতক্ষণ এতো বিপুল সংখ্যক মানুষে চাঁদ না দেখে যাতে তাদের কথার দ্বারা ইয়াকীন (দৃঢ় প্রত্যয়) জন্মে। ৪. রোযার সময় হল সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। ৫. রোযা হল নিয়তের সাথে দিনের বেলায় পানাহার ও সহবাস হতে বিরত থাকা।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ هِلَال নতুন চাঁদ, عِلَّة রোগ, এ স্থলে মেঘ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ চাঁদ দেখা সংক্রান্ত জরুরী মাসায়েল ঃ (ক) শরীয়তে যে সকল আমল তারীখের সাথে সংশ্লিষ্ট তা নির্ধাণের জন্যে চাঁদের হিসেব রাখা ও চাঁদ দেখা জরুরী। বরং এটা ফরযে কেফায়া ও বটে। (খ) চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে ভূমি হতে দেখার চেষ্টাই যথেষ্ট। এরজন্যে টাওয়ার নির্মাণ বা বিমানে উড্ডয়ন করা, বা দূর দর্শন ইত্যাদি যান্ত্রিক সহায়তা গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন। (গ) চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে অপরাপর সাক্ষ্যের ন্যায় সাক্ষী সামনে হাজির থাকা, সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান হওয়া আবশ্যক। (ঘ) হেলাল কমিটির প্রচারিত সংবাদ সে দেশের অধিবাসীদের জন্যে প্রজোয্য। অবশ্য এর জন্যে কমিটির জন্যে শরীআ'ত সম্মত পন্থায় উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন আবশ্যক। যথা ঃ হক্কানী উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে উক্ত কমিটি গঠন করা, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্যে সাব কমিটি গঠন করে শরীঅত সম্মত পন্থায় যবাণী সাক্ষ্য গ্রহণ করা, কেবল টেলিফোনের সংবাদ চিঠি বা অন্যের যবানের সংবাদ গ্রহণ না করা ইত্যাদি। এ সকল শর্তাবলীর প্রেক্ষাপটে গৃহীত সিদ্ধান্ত কে অত্যন্ত সর্তকতার সাথে চাঁদ দেখার বিস্তারিত বিবরণ সহ রেডিও, অয়ারলেস বা এ জাতীয় কোন সম্প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে তা সারা দেশে প্রচার করলে সকল অধিবাসীদের জন্যে তদানুযায়ী আমল করা জরুরী। (ঙ) যদি বহু সংখ্যক মানুষ চাঁদ দেখে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে টেলিফোনে বা পত্রের মাধ্যমে কমিটিকে অবহিত করে। আর কমিটি তাদের কণ্ঠস্বর বা হস্তাক্ষর দেখে উক্ত ব্যক্তি দিগকে চিনতে সক্ষম হয় এবং উক্ত সংবাদের প্রতি আস্থা অর্জিত হয় তখন তা প্রচার মাধ্যম যন্ত্রের সাহায্যে প্রচার করতে পারবে। তখন দেশ বাসীর জন্যে তদানুযায়ী আমলকরা অপরিহার্য হবে (চ) যে সব দেশে আকাশ সর্বদা মেঘাচ্ছান্ন থাকে, যথা– বৃটেন ও তৎপার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র সেসব দেশে উপরোক্ত শর্তে পার্শ্ববর্তী দেশের তারীখ প্রজোয্য হবে। ফায়েদা ঃ ইউরোপ ও আমেরিকার যেসব অঞ্চলে ৬ মাস পর্যন্ত প্রতি ২৪ ঘন্টায় মাত্র অর্ধ ঘন্টা রাত বাকী ২৩.৩০ ঘন্টা দিন থাকে যদি কারো পক্ষে রোযা রাখা সম্ভব হয় তাহলে রোযা রাখবে। অন্যথায় বৎসরের ছোট্টদিনে রোযার কাযা করবে। আর যদি সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর পানাহারের অবকাশ না থাকে বা সূর্যাস্তই না হয় তাহলে পার্শ্ববর্তী দেশের হিসেব অনুযায়ী নামায রোযা করবে। অথবা বৎসরের যে দিন গুলোতে সূর্যাস্ত হয় তার সর্ব শেষ দিনের আসর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের পরিমাণ নির্ণয় করবে। অতঃপর হিসেব মোতাবেক ২৪ ঘন্টা সময়ের যে অংশে আসর আদায় করবে তখন থেকে ঐ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর ইফতার করবে। উল্লেখ্য যে, বিমানে সফর কালে দিনের হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ও এই বিধান (প্রযোজ্য)।

فَإِنْ أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ فَإِنْ نَامَ فَاحْتَلَمَ أَوْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَنْزَلَ أَوْ ادَّهَنَ أَوِ احْتَجَمَ أَوِ اكْتَحَلَ أَوْ قَبَّلَ لَمْ يُفْطِرْ - فَإِنْ أَنْزَلَ بِقُبْلَةٍ أَوْ لَمْسٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ إِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ وَيُكْرَهُ إِنْ لَمْ يَأْمَنْ وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْئُ لَمْ يُفْطِرْ وَإِنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا مِلْأَ فَمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنِ ابْتَلَعَ الْحَصَاةَ أَوِ الْحَدِيدَ أَوِ النَّوَاةَ أَفْطَرَ وَقَضَى -

---

অনুবাদ ॥ রোযা ভঙ্গের কারণ ও করনীয় ঃ ৬. সুতরাং যদি ভুলবশতঃ পানাহার করে বা সহবাস করে তাহলে তার রোযা নষ্ট হবেনা। ৭. নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে, স্বীয় স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করার ফলে বীর্যপাত ঘটলে, শরীরে তেল মালিশ করলে, শিঙ্গা লাগাল, সুরমা ব্যবহার করলে, চুম্বন করলে এ সবে রোযা নষ্ট হবেনা। ১. যদি চুম্বন বা স্পর্শের মাধ্যমে কারো বীর্যপাত ঘটে তাহলে তার ওপর উক্ত রোযার কাযা ওয়াজিব, কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। ২. নিজ নফসের ব্যাপারে (বীর্যপাত না ঘটার) আস্থাশীল হলে তার জন্যে চুম্বন দোষণীয় নয়। তবে আস্থাশীল না হলে মাকরূহ। ৩. রোযাদার ব্যক্তির বমি উদ্‌গত হলে রোযা নষ্ট হয়না। যদি কেউ স্বেচ্ছায় মুখভর্তি পরিমাণ বমি করে তার জন্যে কাযা ওয়াজিব। ৫. কেউ পাথর কণা, লোহা বা দানা গিলে ফেললে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। এর কাযা আদায় করতে হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ نَاسِيًا ভুলবশত ঃ اِدَّهَنَ তেলমালিশ করল, মূলত اِدْتَهَنَ ছিল, اِحْتَجَمَ শিঙ্গা লাগাল, اِكْتَحَلَ সুরমা লাগাল। قُبْلَة চুম্বন। لَمْس স্পর্শ। لَمْ يَأْمَنْ আশংকমুক্ত না হয়। ذرع উদ্‌গত হয়। مِلْأٌ ভর্তি। পূর্ণ, اِبْتَلَعَ গলধঃ করণ করে, গিলে ফেলে। حَصَاةٌ পাথর কণা। نَوَاةٌ বীজ, দানা, আঠি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله فَإِنْ أَكَلَ الصَّا لَمْ الخ ঃ ভুলবশত পানাহার বা সহবাসের দ্বারা ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে রোযা নষ্ট হয়না। ইমাম মালেক (র.) এর মতে নষ্ট হয়ে যায়। তবে এতে কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। হানাফীগণের দলীল রাসূল (সা.) এর বাণী– "তোমার রোযা পূর্ণ কর। কেননা আল্লাহই তোমাকে পানাহার করিয়েছে।" আর রোযার প্রতিবন্ধক হওয়ার ক্ষেত্রে সহবাসও পানাহারের ন্যায়। একারণে এটাও এর সাথে শামিল হবে।

قوله اِسْتَقَاءَ عَامِدًا الخ ঃ বমির মোট ২৪ টি ছুরত হতে পারে। কেননা বমি স্বাভাবাকি ভাবে হতে পারে। অথবা ইচ্ছা পূর্বক করতে পারে, উভয় ক্ষেত্রে মূখ ভর্তি পরিমাণ হবে বা কম হবে। আর বের হয়ে যাবে, নাহয় ফিরে যাবে বা ইচ্ছা পূর্বক গিলে ফেলবে। সুতরাং ৪×৩ = ১২ ছুরত হল। অতঃপর সব ক্ষেত্রেই রোযা স্মরণ থাকবে বা না। এতে ১২×১২ =২৪ ছুরত হল। এসবের মধ্যে যদি রোযা স্মরণ থাকা সত্বে ইচ্ছা পূর্বক মুখ ভর্তি পরিমাণ বমি করে তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

وَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا فِىْ اَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ اَوْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ مَا يُتَغَذّٰى بِهٖ اَوْ يُتَدَاوٰى بِهٖ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَالْكَفَّارَةُ مِثْلُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَمَنْ جَامَعَ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ فَاَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِىْ اِفْسَادِ الصَّوْمِ فِىْ غَيْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ - وَمَنِ احْتَقَنَ اَوِ اسْتَعَطَ اَوْ اَقْطَرَ فِىْ اُذُنِهٖ اَوْ دَاوٰى جَائِفَةً اَوْ اٰمَّةً بِدَوَاءٍ رَطْبٍ فَوَصَلَ اِلٰى جَوْفِهٖ اَوْ دِمَاغِهٖ اَفْطَرَ وَاِنْ اَقْطَرَ فِىْ اِحْلِيْلِهٖ لَمْ يُفْطِرْ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُفْطِرُ وَمَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهٖ لَمْ يُفْطِرْ وَيُكْرَهُ لَهٗ ذٰلِكَ وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَمْضَغَ لِصَبِيِّهَا الطَّعَامَ اِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُدٌّ وَ مَضْغُ الْعِلْكِ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ وَيُكْرَهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا فِىْ رَمَضَانَ فَخَافَ اِنْ صَامَ اِزْدَادَ مَرَضُهٗ اَفْطَرَ وَقَضٰى وَاِنْ كَانَ مُسَافِرًا لَا يَسْتَضِرُّ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُهٗ اَفْضَلُ وَاِنْ اَفْطَرَ وَقَضٰى جَازَ وَاِنْ مَاتَ الْمَرِيْضُ اَوِ الْمُسَافِرُ وَهُمَا عَلٰى حَالِهِمَا لَمْ يَلْزَمْهُمَا الْقَضَاءُ وَاِنْ صَحَّ الْمَرِيْضُ اَوْ اَقَامَ الْمُسَافِرُ ثُمَّ مَاتَا لَزِمَهُمَا الْقَضَاءُ بِقَدْرِ الصِّحَّةِ وَالْاِقَامَةِ وَقَضَاءُ رَمَضَانَ اِنْ شَاءَ فَرَّقَهٗ وَاِنْ شَاءَ تَابَعَهٗ وَاِنْ اَخَّرَهٗ حَتّٰى دَخَلَ رَمَضَانُ اٰخَرُ صَامَ رَمَضَانَ الثَّانِىْ وَقَضَى الْاَوَّلَ بَعْدَهٗ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ -

অনুবাদ ॥ ৬. কেউ ইচ্ছাপূর্বক যোনীপথে বা গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করলে বা পানাহার করলে, ঔষধ জাতীয় দ্রব্য সেবন বা ভক্ষণ করলে তার ওপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব। ৭. রোযার কাফ্ফারা যিহারের কাফফারার ন্যায়। ৮. যদি যোনীপথ ছাড়া অন্য কোন অঙ্গে সঙ্গম করে আর এতে বীর্যপাত ঘটে, তার ওপর কাযা ওয়াজিব। কাফফারা ওয়াজিব নয়। রমাযানের রোযা ছাড়া অন্য কোন রোযা নষ্ট করার দ্বারা কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়না। ৯. যদি কেউ ঢুশ গ্রহণ করে, বা নাকে ঔষধ প্রবিষ্ট করে বা কানে ঔষধের ফোটা ঝরায়। পেট বা মাথায় তরল ঔষধ প্রয়োগ করার ফলে তা পাকস্থলি বা মস্তিষ্কে পৌঁছে যায় তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। ১০. কেউ পেসাবের ছিদ্রে ঔষধ প্রবিষ্ট করলে তরফাইন (র.)-এর মতে তার রোযা নষ্ট হবেনা। আবূ ইউসুফ (র.) বলেন রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। ১১. মুখে কোন কিছু চাখলে রোযা নষ্ট হবেনা তবে তা মাকরূহ হবে। ১২. নারীদের ক্ষেত্রে তাদের সন্তানের জন্যে অন্য কোন উপায় থাকা সত্ত্বে খাদ্য চিবায়ে দেয়া মাকরূহ। (গাছের শক্ত) আঠা চিবানোর দ্বারা রোযা নষ্ট হয়না তবে তা মাকরূহ।

রোযা না রাখার অনুমতি প্রসঙ্গ ঃ ১. যদি কেউ রমাযানে অসুস্থ হয়ে যায়, আর এমতাবস্থায় রোযা রাখলে রোগ বৃদ্ধির আশংকা হয় তাহলে সে রোযা রাখবেনা বরং পরবর্তীতে কাযা করবে। ২. যদি কোন মুসাফিরের জন্যে রোযা ক্ষতিকর নাহয় তাহলে তার জন্যে রোযা রাখা শ্রেয়। আর যদি রোযা ভাঙ্গে পরে তার কাযা করে তাও জায়েয। ৩. যদি কোন অসুস্থ বা মুসাফির ব্যক্তি সফর অবস্থায় মারা যায় তাদের ওপর কাযা ওয়াজিব নয় (অর্থাৎ এর পরে ওয়ারিসদের জন্যে এর ফিদিয়া দিতে হবেনা) ৪. যদি কোন রুগ্ন ব্যক্তি রোগমুক্তি লাভ করে বা মুসাফির মুকীম হয়ে যায় অতঃপর মৃত্যুবরণ করে। তাহলে সুস্থ ও মুকীম থাকা পরিমাণ দিনের কাযা ওয়াজিব (অর্থাৎ এর ফিদিয়া প্রদান করতে হবে।) ৫. রমাযানের কাযা রোযা একাধারে বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রাখতে পারে। ৬. যদি কেউ কাযা আদায়ে বিলম্ব করার দরুণ অপর রমাযান এসে যায় তাহলে আগে রমাযানের রোযা রাখবে। পরে কাযা রোযা রাখবে। এর জন্যে ফিদিয়া দিতে হবেনা।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اِحْتَقَنَ পায়ূ পথে তৈল বা ঔষধ প্রয়োগ করা। اِسْتَعَطَ নাকে ঔষধ ঝরায়। جَائِفَةٌ পেট, اٰمَّةٌ মাথায় ক্ষত دِمَاغٌ মস্তিষ্ক। اِحْلِيْلٌ পেশাবের ছিদ্র। اِنْ مَضَغَ চিবায়। بُدٌّ উপায়, عِلْكٌ দানা, বীজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা॥ قوله كَفَّارَةُ الظهار ঃ যিহার ظَهْرٌ হতে গৃহীত অর্থ পিঠ, পরিভাষায় স্ত্রীকে স্বীয় মুহররমা কোন মহিলার সাথে তুলনা করা এবং এর দ্বারা তার সাথে রতিক্রিয়া হারাম করা উদ্দেশ্যে থাকলে তাকে যিহার বলে। এর কাফ্ফারা হল ৪০ দিনের মধ্যে একটি গোলাম আযাদ করা, বা দু'মাস রোযা রাখা সম্ভব নাহলে ৬০ জন মিসকীন কে পেট ভরে আহার করান। কাফ্ফারা আদায় না করলে ৪০ দিনপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়।

রোযা নারাখার উযরসমূহ ঃ قوله وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا الخ ঃ এখান থেকে রোযা না রাখার উযর সমূহের বর্ণনা করা হয়েছে। রোযা না রাখার ওযর মোট ৮টি যথা ঃ ১. রোগ, ২. সফর, ৩. বাধ্যকতা, তথা তীব্র শত্রুর চাপ, ৪. গর্ভ, ৫. স্তন্যদান, ৬. ক্ষুধার কাতরতা, ৭. পিপাসার কাতরতা ও ৮. বার্ধক্য কারো কারো মতে আরেকটি হল ৯. গাজীর জন্য শত্রুর মোকাবেলা। উল্লেখ্য যে, ক্ষুধা ও পিপাসায় বেহুস হয়ে যাওয়ার বা মৃত্যু মূখে পতিত হওয়ার আশংকা হলে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয।

قوله وَمَنِ احْتَقَنَ الخ ঃ গুহ্যদ্বারে ঢুশ বা ঔষধ প্রয়োগ করলে এবং নাকে, কানে ও মস্তিষ্কে ঔষধ প্রবেশ করালে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন- اِنَّمَا الْاِفْطَارُ فِيْمَنْ دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ অবশ্য সাহিবাইনের মতে এতে রোযা নষ্ট হয়না।

وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلٰى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا وَالشَّيْخُ الْفَانِيُ الَّذِيْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا كَمَا يُطْعَمُ فِي الْكَفَّارَاتِ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَأَوْصٰى بِهٖ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيْرٍ وَمَنْ دَخَلَ فِيْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ قَضَاهُ وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِيْ رَمَضَانَ أَمْسَكَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَصَامَا بَعْدَهُ وَلَمْ يَقْضِيَا مَا مَضٰى وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِيْ رَمَضَانَ لَمْ يَقْضِ الْيَوْمَ الَّذِيْ حَدَثَ فِيْهِ الْإِغْمَاءُ وَقَضٰى مَا بَعْدَهُ وَإِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُوْنُ فِيْ بَعْضِ رَمَضَانَ قَضٰى مَا مَضٰى مِنْهُ وَصَامَ مَا بَقِيَ مِنْهُ -

---

অনুবাদ ॥ ৬. গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী যদি স্বীয় সন্তানের (ক্ষতির) আশংকা করলে রোযা রাখবেনা। পরে কাযা আদায় করবে। এর জন্যে ফিদিয়া দিতে হবেনা। ৭. অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি যদি রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তাহলে রোযা রাখবেনা। বরং প্রতিদিনের রোযার জন্যে একজন মিসকীনকে খানা খাওয়াবে। যেমন কাফ্ফারার ক্ষেত্রে খাওয়ান হয়। ৮. কোন ব্যক্তি মারা গেলে যদি তার জিম্মায় কাযা রোযা থাকে আর সে এর অসিয়ত করে যায় তাহলে তার অলী (অভিভাবক) প্রতি দিনের জন্যে অর্ধ সা' গম বা একসা' খেজুর অথবা কিশমিশ সাদকা করবে।

কতিপয় মাসআলা ঃ ১. কেউ নফল রোযা শুরু করে নষ্ট করে ফেললে পরে এর কাযা আদায় করে নিবে। ২. রমাযানের দিবসে কোন কিশোর বালেগ হলে বা কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করলে দিনের বাকী অংশ পানাহার ও সঙ্গম হতে বিরত থাকবে। এবং পরবর্তী দিন হতে রোযা রাখবে। পূর্বের দিনের জন্যে কোন কাযা আদায় করতে হবেনা। ৩. কেউ রমাযান মাসে বেহুস হয়ে গেলে যেদিন হতে বেহুস হয়েছে উক্ত দিনের রোযার কাযা আদায় করবেনা। তবে পরবর্তী দিনের কাযা আদায় করতে হবে। ৪. রমাযানের কোন অংশে পাগল ব্যক্তি সুস্থ মস্তিষ্ক হলে (পরে) অতীতের দিনের রোযার কাযা আদায় করবে এবং অবশিষ্ট রোযা পালন করবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ مُرْضِعٌ স্তন্যদাত্রী, اَلشَّيْخُ الْفَانِيُ অতিশয় বৃদ্ধ, اَمْسَكَا বিরত থাকবে, রোযা রাখবে না, حَدَثَ সূচনা হয়েছে, اِغْمَاءٌ অচৈতন্য, বেহুসী, اَفَاقَ হুস হয়, সুস্থ মস্তিষ্ক হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله اَلشَّيْخُ الْفَانِيُ ঃ অতিবার্ধক্যের দরুণ যদি কেউ রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তাহলে এর ফিদিয়া (ফিতরা পরিমাণ) দান করতে হবে। তবে পরে কখনো সক্ষম হলে উক্ত রোযার কাযা আদায় করতে হবে।

قوله وَمَنْ اُغْمِيَ عَلَيْهِ الخ ঃ অর্থাৎ রোযা অবস্থায় বেহুস হয়ে গেলে যদি রোযার প্রতিবন্ধক কিছু পাকস্থলীতে প্রবেশ না করে এবং এভাবে একাধিক দিন অতিক্রম করে তাহলে প্রথম দিনের রোযার কাযা করতে হবেনা। কিন্তু পরবর্তী দিন গুলোতে পানাহার হতে বিরত থাকা সত্বে নিয়ত না পাওয়ার কারণে তার কাযা করতে হবে।

وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ نَفِسَتْ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ إِذَا طَهُرَتْ وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِيْ بَعْضِ النَّهَارِ أَمْسَكَا عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَمَنْ تَسَحَّرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ أَوْ أَفْطَرَ وَهُوَ يَرٰى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الْفَجْرَ كَانَ قَدْ طَلَعَ أَوْ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ قَضٰى ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَلَاكَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَمَنْ رَأٰى هِلَالَ الْفِطْرِ وَحْدَهُ لَمْ يُفْطِرْ وَإِذَا كَانَتْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ فِيْ هِلَالِ الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ يَقْبَلْ إِلَّا شَهَادَةَ جَمَاعَةٍ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ -

---

অনুবাদ ॥ ৫. কোন মহিলা রমাযান মাসে ঋতুবতী বা নিফাসগ্রস্ত হলে রোযা রাখবেনা। বরং পবিত্র হওয়ার পর কাযা আদায় করবে। ৬. মুসাফির ব্যক্তি দিনের বেলায় গৃহে আগমন করলে (মুকীম হলে) বা ঋতুবতী নারী পবিত্র হলে দিনের বাকী অংশ পানাহর হতে বিরত থাকবে। ৭. যদি কেউ সুবহে সাদিক হয়নি ধারণা করে সাহরী খায়, অথবা সূর্যাস্ত হয়েছে ধারণা করে ইফতার করে। অতঃপর জানতে পারল যে, সুব্হে সাদিক হয়নি বা সূর্যাস্ত হয়নি। তাহলে পরে উক্ত রোযার কাযা আদায় করবে। তবে এতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবেনা।

চাঁদ দেখার অবশিষ্ট মাসাইল ঃ ১. কেউ একাকী ঈদের চাঁদ দেখলে সে রোযা রাখা বন্ধ করবেনা। ২. আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে ইমাম রোযার ঈদে (কমপক্ষে) দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য ছাড়া গ্রহণ করবেনা। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন নাহলে এমন জামাআ'তের সাক্ষ্য ছাড়া (সামান্য সংখ্যকের সাক্ষ্য) গ্রহণ করবেন না যাতে তাদের সংবাদের ব্যাপারে নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله أَمْسَكَا الخ ঃ অর্থাৎ দিনের বাকী অংশ রোযার প্রতিবন্ধক সকল কাজ হতে বিরত থাকবে। অবশ্য মুসাফির যদি ফজর হতে পানাহার ইত্যাদি হতে বিরত থাকে তাহলে তার উক্ত দিনের রোযা আদায় হয়ে যাবে। পরে কাযা করতে হবেনা। আর পানাহার করে থাকলে পরে তার কাযাও রাখতে হবে। ঋতুবতীর ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় পরে উক্ত রোযার কাযাও রাখতে হবে। কেননা সে দিনের শুরু অংশের রোযার প্রতিবন্ধক (ঋতুস্রাব) বিষয়ে জড়িত ছিল। উল্লেখ্য যে, সফর বা ঋতুস্রাবের কারণে রোযা ভাঙলে ও মানুষের সম্মুখে পানাহার হতে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। যাতে সাধারণের আস্থা বিনষ্ট না হয়। অপরদিকে রমাযানের তা'যীম ও সম্মান রক্ষা হয়।

قوله إِنْ لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ الخ এক্ষেত্রে স্মরতব্য যে, কেউ ইফতার করার পর বিমানে আরোহণ করে যদি পশ্চিমে যাত্রাকরে। আর কিছুক্ষর্ণ পর ক্রমাণ্বয়ে সূর্য উপরাকাশে দেখে। এতে তার রোযা হয়ে যাবে। তবে দিনের অংশে পানাহার হতে বিরত থাকতে হবে। এবং পুনরায় ওয়াক্ত মত নামায ও আদায় করতে হবে। অপরদিকে কেউ ঈদের পরে পূর্ব দিকে যাত্রা করে যদি রমাযানের অংশ লাভ করে তার জন্যে পুনরায় রোযা রাখতে হবে। এ ভাবে কেউ ২৪ বা ২৮ রোযা পূর্ণ করার পর যদি কোন দেশে ঈদ করতে দেখে তার জন্যেও ঈদ করতে হবে। বাকী রোযা রাখতে হবেনা।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। صوم এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? এবং চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে শরয়ী বিধান কি?

২। হেলাল কমিটির প্রচারিত সংবাদ গ্রহণযোগ্য কিনা? এ ব্যাপারে যা জান লিখ।

৩। মেরু অঞ্চলে যে দিকে ৬ মাস রাত ও ৬ মাস দিন থাকে সেখানকার অধিবাসীদের জন্যে নামায রোযার বিধান কি? লিখ।

৪। কি কি কারণে রোযা ভঙ্গ হয়? এবং রোযার কাফফারা কি?

৫। কার ওপর কাফ্ফারা ওয়াজিব? কি কি ওযরে রোযা না রাখার অনুমতি আছে? বর্ণনা কর।

بَابُ الْاِعْتِكَافِ

اَلْاِعْتِكَافُ مُسْتَحَبٌّ وَ هُوَ اللُّبْثُ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ الصَّوْمِ وَنِيَّةِ الْاِعْتِكَافِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ الْوَطْئُ وَاللَّمْسُ وَ الْقُبْلَةُ وَاِنْ اَنْزَلَ بِقُبْلَةٍ اَوْ لَمْسٍ فَسَدَ اِعْتِكَافُهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ لَايَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مِنَ الْمَسْجِدِ اِلَّا لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ اَوْ لِلْجُمُعَةِ وَلَابَاْسَ بِاَنْ يَّبِيْعَ وَيَبْتَاعَ فِى الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّحْضِرَ السِّلْعَةَ وَلَا يَتَكَلَّمَ اِلَّا بِخَيْرٍ وَيُكْرَهُ لَهُ الصَّمْتُ فَاِنْ جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ لَيْلًا اَوْنَهَارًا نَاسِيًا اَوْ عَامِدًا بَطَلَ اِعْتِكَافُهُ وَلَوْخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ سَاعَةً بِغَيْرِ عُذْرٍ فَسَدَ اِعْتِكَافُهُ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَايَفْسُدُ حَتّٰى يَكُوْنَ اَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ وَمَنْ اَوْجَبَ عَلٰى نَفْسِهٖ اِعْتِكَافَ اَيَّامٍ لَزِمَهُ اِعْتِكَافُهَا بِلَيَالِيْهَا وَكَانَتْ مُتَتَابِعَةً وَاِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ التَّتَابُعَ فِيْهَا-

ই'তিকাফের বর্ণনা

অনুবাদ॥ ১. ই'তিকাফ মুস্তাহাব (সুন্নত)। রোযা অবস্থায় ইতিফাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থানকে ইতিকাফ বলে। ২. ই'তিকাফকারীর জন্যে সঙ্গম, নারীস্পর্শ ও চুম্বন হারাম। ৩. যদি চুম্বন বা স্পর্শের দ্বারা বীর্যপাত ঘটে তাহলে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। পরে এর কাযা করতে হবে। ৪. ই'তিকাফরত ব্যক্তি বিশেষ মানবিক প্রয়োজন ছাড়া বা জুমাআ'র জন্যে ছাড়া মসজিদ হতে বের হবেনা। ৫. (প্রয়োজনের তাগিদে) মসজিদের অভ্যন্তরে পণ্য উপস্থিতি ছাড়া (বাইরে রেখে) ক্রয় বিক্রয় করতে পারে। ৬. উত্তম (দ্বীনি) কথা ছাড়া অন্য কোন কথাবার্তা বলবেনা। ৭. একেবারে নিশ্চুপ হয়ে থাকা মাকরূহ। ৮. ইতিকাফকারী ভুলবশতঃ ইচ্ছাকৃত দিনে রাতে যে কোন সময় যৌন মিলন বা ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। ৯. বিনা উযরে সামান্য সময়ের জন্যে ও মসজিদ হতে বের হলে আবু হানীফা (র.) এর মতে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। আর সাহিবাইন (র.) বলেন– অর্ধদিনের বেশী বাইরে অবস্থান করা ছাড়া ই'তিকাফ নষ্ট হবেনা। ১০. কেউ নিজের ওপর কয়েকদিনের ই'তিকাফ ওয়াজিব করে নিলে তার জন্যে রাতসহ উক্তদিন গুলোর ই'তিকাফ ওয়াজিব। আর এ ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে তা পালন করতে হবে যদিও ধারাবাহিকতার শর্ত না করে থাকে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ اِعْتِكَاف - عُكُوْف হতে بَابِ اِفْتِعَال এর মাসদার। অর্থ অবস্থান করা, আবদ্ধ থাকা, الصمت নীরব- নিশ্চুপ থাকা। يَبْتَاع ক্রয় করে। مُتَتَابِعَةً এক নাগাড়ে, একাধারে, ধারাবাহিক ভাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ ই'তিকাফের প্রকারভেদ ঃ قوله مُسْتَحَبٌّ - ই'তিকাফ মূলতঃ ৩ প্রকার। ক. নফল, খ. সুন্নত, ও গ. ওয়াজিব। ই'তিকাফের মান্নত করলে কাজ সিদ্ধি হওয়ার পর উক্ত ই'তিকাফ পালন করা ওয়াজিব। রমাযানের শেষ দশকের ই'তিকাফ মসজিদের মহল্লাবাসীর ওপর সুন্নতে মুয়াক্কাদা কেফায়া। আর সাধারণ ভাবে সওয়াবের নিয়তে যে কোন সময়ে ই'তিকাফ করা নফল। নফল ইতিকাফের সর্ব নিম্ন সময় ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে একদিন, ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সামান্য মূহুর্ত ও হতে পারে।

قوله اِلَّا لِحَاجَةٍ ঃ মানবিক প্রয়োজন যথা– পেশাব-পায়খানা, ফরয গোসল, পানাহার ও শরয়ী প্রয়োজন যথা- জুমআর নামায আদায়– এছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে গেলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। সাধারণ গোসলের জন্য বাইরে যাওয়াও নিষেধ। তবে একেবারে অসহনীয় হলে ইস্তিন্জা হতে আসার পথে দ্রুত গোসল সেরে আসার ব্যাপারে কোন কোন আলেম অনুমতি দেন।

كِتَابُ الْحَجِّ

اَلْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الْاَحْرَارِ الْمُسْلِمِيْنَ الْبَالِغِيْنَ الْعُقَلَاءِ الْاَصِحَّاءِ اِذَا قَدِرُوْا عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاضِلًا عَنِ الْمَسْكَنِ وَمَا لَابُدَّ مِنْهُ وَعَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ اِلَى حِيْنِ عَوْدِهِ وَكَانَ الطَّرِيْقُ اٰمِنًا وَيُعْتَبَرُ فِىْ حَقِّ الْمَرْاَةِ اَنْ يَّكُوْنَ لَهَا مَحْرَمٌ يَحُجُّ بِهَا اَوْ زَوْجٌ وَلَا يَجُوْزُ لَهَا اَنْ تَحُجَّ بِغَيْرِهِمَا اِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسِيْرَةُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا –

হজ্ব অধ্যায়

অনুবাদ ॥ **হজ্ব ফরয হওয়া প্রসঙ্গ ঃ** ১. স্বাধীন মুসলমান, প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মুস্তিষ্ক ও সুস্থদেহধারী ব্যক্তির ওপর হজ্ব ফরয। যখন তারা এমন পাথেয় ও বাহনের ক্ষমতাবান হবে যা গৃহের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র হজ্ব হতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবারের ভরণ-পোষণ হতে অতিরিক্ত হবে এবং রাস্তা হবে নিরাপদ। মহিলাদের ক্ষেত্রে সঙ্গে মুহাররম কোন পুরুষ বা স্বামী সঙ্গি হতে হবে যার সাহায্যে সে হজ্ব পালন করবে। ২. মহিলাদের জন্যে এ দু'ধরনের পুরুষ ছাড়া হজ্ব পালন করতে যাওয়া জায়েয নয় যখন তার ও মক্কার মাঝে ৩দিন বা ততোধিক দিনের (হাঁটার) দুরত্ব হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ حَجّ এর অর্থ ও সংজ্ঞা ঃ حَجّ অর্থ ইচ্ছা, সংকল্প। পরিভাষায়–

هُوَ قَصْدُ الْبَيْتِ عَلٰى وَجْهِ التَّعْظِيْمِ لِاَدَاءِ الرُّكْنِ الْعَظِيْمِ مِنَ الدِّيْنِ الْقَوِيْمِ

অর্থাৎ আল্লামা শামী (র.)-এর ভাষ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা কে হজ্ব বলে।

পটভূমি ঃ আদায়ের উপকরণের দিক দিয়ে ইবাদত তিন প্রকার (ক) بَدَنِىْ বা শারীরিক। যেমন– নামায, রোযা তিলাওয়াত। (খ) আর্থিক, যেমন-যাকাত, সাদাকাত প্রভৃতি। (গ) مَالِىْ وَبَدَنِىْ সংমিশ্রিত। যথা- হজ্ব, এতে শারীরিক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় উভয়ই আছে। গ্রন্থকার আল্লামা কুদূরী (র.) প্রথম بَدَنِىْ অতঃপর مَالِىْ ও অতঃপর উভয় সংমিশ্রিত ইবাদতের আলোচনা এনেছেন।

হজ্বের তাৎপর্য ঃ হজ্ব শুধু উম্মতে মুহাম্মদীই নয় বরং পূর্ববর্তী উম্মতের নিকটও এটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ছিল। তবে হযরত ইসমাইলের বংশধর তাঁর মহান আদর্শকে ভুলে পবিত্র এ কার্যের মধ্যে শিরক বিদআ'তের সংমিশ্রণ ঘটায়। পরবর্তীতে রাসূলে মাকবুল (সা.) এর আমলে সমস্ত কুসংস্কার দূরীভূত হয়ে এটা ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে চিহ্নিত হয়। এবং এর বিনিময় স্বরূপ বান্দা সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যায়।

হজ্বের গুরুত্ব ও উপকারীতা ঃ হজ্ব বিশ্ব মুসলিমের পূণর্মিলনী এক মহা সমাবেশ (১) এর দ্বারা সমগ্র বিশ্বের বংশ বর্ণ, জাত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের সমাগম ঘটে। ফলে একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারে। (২) এর দ্বারা পারস্পরিক সাম্য-মৈত্রির বন্ধন সূচিত হয়। (৩) আল্লাহর ঘর ও বিশেষ স্মৃতি সমূহ যিয়ারতের মাধ্যমে হৃদয়ে ঈমানী দিপ্তী প্রখরতা লাভ করে। (৪) হজ্বের দ্বারা আশিক হৃদয়ে প্রকৃত মাশুক মাওলার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেমের প্রকাশ ঘটে এতে যেন স্বয়ং মাওলার দীদার ঘটে। আর পাগল হৃদয় লাব্বাইক লাব্বাইক বলে

তাঁর পিছু ছুটে। (৫) সর্বশেষ বান্দা পাপ পঙ্কিলতা মুক্ত হয়ে সদ্য প্রসূত নবজাতকের ন্যায় মাসূম নিষ্পাপ হয়ে গৃহে ফিরে। তাইতো দেখা যায় প্রকৃত হাজীগণ হজ্বের পরে নব জীবন লাভ করে। তার চালচলন ও আমলের মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে।

হজ্ব কখন ফরয হয়? হিজরী ৬ষ্ঠ মতান্তরে ৯ম সনে হজ্ব ফরয হয়। এ মর্মে وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا আয়াত অবতীর্ণ হয়। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন প্রতিকুলতার দরুন তখন হজ্ব করতে অসমর্থ ছিলেন। পরে দ্বাদশ হিঃ সনে তিনি হজ্ব আদায় করেন।

হজ্ব তাৎক্ষণিক ওয়াজিব কি না ঃ ফেকাহবিদগণের মধ্যে এ প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে যে, হজ্ব ফরয হওয়ার সাথে সাথে উক্ত বছরই তা পালন করা ওয়াজিব ? নাকি বিলম্বে করার অবকাশ আছে? ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে عَلَي الْفُوْرِ তথা ফরয হওয়া মাত্রই আদায় করা ওয়াজিব। আবূ হানীফা (র.) এর বিশুদ্ধ মত ও এটাই। এমর্মে তাঁদের দলীল হল এ হাদীস যে, مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ الْحَرَامِ فَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ اَنْ يَمُوْتَ يَهُوْدِيًّا اَوْنَصْرَانِيًّا – অপরদিকে ইমাম মুহাম্মাদ (র.) বলেন– عَلَى التَّرَاخِيْ তথা এতে বিলম্বের অবকাশ আছে। হজ্ব ফরয হয়েছে ৬ষ্ট হিঃ সনে। অথচ রাসূল (সা.) তা ১২শ হিঃ সনে পালন করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতের ওপরই ফতোয়া। তবে কেউ মৃত্যু নিকটবর্তী ধারণা করলে তখন সকলের মতে বিলম্ব করা গোনাহ। এবং যথাশিঘ্র সম্ভব আদায় করা ওয়াজিব।

হজ্বের প্রকারভেদ ঃ হজ্ব তিন প্রকার (১) ইফরাদ (২) কিরান, ও (৩) তামাত্তু।

قوله اَلْحَجُّ وَاجِبٌ ওয়াজিব দ্বারা ফরয উদ্দেশ্য।

হজ্ব ফরয হওয়ার শর্তাবলী ঃ হজ্ব জীবনে একবার ফরয হয়। আর তা ৮টি শর্ত সাপেক্ষে। যথা - ১. মুসলমান হওয়া ২. স্বাধীন হওয়া ৩. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, ৪. সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া, ৫. শরীর সুস্থ থাকা। (অবশ্য রুগ্ন হলে তার জন্যে বদলী হজ্ব করান ওয়াজিব) ৬. যাতায়াতের ব্যয় বহনে সামর্থ হওয়া, ৭. রাস্তা নিরাপদ থাকা। ৮. হজ্ব হতে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের ভরণ-পোষনের ব্যবস্থা থাকা।

হজ্বের ফরযসমূহ ঃ হজ্বের ফরয ৩টি– ১. ইহরাম বাঁধা, ২. আরাফায় অবস্থান করা ও ৩. তওয়াফে যিয়ারত করা। **হজ্বের ওয়াজিবসমূহ ঃ** হজ্বের ওয়াজিব ৫টি– তওয়াফে কুদূম, ২. সাঈ' ৩. ১০ তারীখের রাতে মুযদালিফায় অবস্থান, ৪. মাথা মুন্ডান বা চুল ছাটান ও ৫. পাথর নিক্ষেপ।

তওয়াফের ওয়াজিবসমূহ ঃ তওয়াফের ওয়াজিব ৭টি– ১. শরীর পাক থাকা, ২. ছতর আবৃত করা, ৩. খানায়ে কা'বাকে বায়ে রেখে ডান দিক হতে তওয়াফ শুরু করা, ৪. সক্ষম হলে পদব্রজে তওয়াফ করা, ৫. দাঁড়িয়ে তওয়াফ করা, ৬. হাতীমের বাহির দিক হতে তওয়াফ করা, ও ৭ সাত বার প্রদক্ষিণ করা (এগুলোর কোন একটি ছুটে গেলে সম্ভব হলে পুনরায় তা পালন করতে হবে নতুবা কুরবানী করতে হবে।)

সাঈ'র ওয়াজিব সমূহ ঃ সাঈ'র ওয়াজিব ৩টি– ১. সাফা- মারওয়ার মাঝে সাঈ করা. ২. পদব্রজে করা ও ৩. তওয়াফের পরে করা।

قوله الاَصِحَّاءُ الخ : صَحِيْحٌ বহুবচন اَصِحَّاءُ অর্থ সুস্থ। যদি এমন অসুস্থ হয় যা থেকে পরে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এমতাবস্থায় বদলী হজ্ব করানোর পর তাহলে পরে সামর্থ থাকলে পুনরায় হজ্ব করা ওয়াজিব।

قوله اِذَا قَدَرُوْا زَادًا الخ ঃ এর দ্বারা মধ্যম পর্যায়ের পাথেয়ের সংস্থান থাকা উদ্দেশ্য।

قوله وَمَالَابُدَّ مِنْهُ ঃ অর্থাৎ জরুরী আসবাব যথা– কাজের মানুষ, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, ঋণ পরিশোধ, জরুরী আবাসন প্রভৃতি।

قوله مُحْرِمٌ يَحُجُّ الخ ঃ অর্থাৎ তিন দিনের হাঁটার দূরত্ব (৪৮ মাইল) বা ততোধিক হলে স্বামী বা মুহররম ছাড়া হজ্বে যাওয়া হারাম। চাই যতই বুযর্গ বা মুত্তাকী পুরুষের সাথে হোক না কেন। এ মর্মে রাসূল (সা.) ফরমান- لَاتَحُجَّنَّ اِمْرَأَةٌ اِلَّا وَمَعَهَا مُحْرِمٌ মুহাররম ছাড়া কখানোই কোন মহিলা হজ্ব করবেনা। উল্লেখ্য যে, এ অবস্থায় হজ্ব করলে ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে গোনাহাগার হবে।

وَالْمَوَاقِيتُ الَّتِي لَا يَجُوزُ اَنْ يَتَجَاوَزَهَا الْإِنْسَانُ اِلَّا مُحْرِمًا لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُوالْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ وَلِأَهْلِ الشَّامِ لجُحْفَةُ وَلِأَهْلِ النَّجْدِ قَرْنٌ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ ، فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ عَلٰى هٰذِهِ الْمَوَاقِيتِ جَازَ وَمَنْ كَانَ بَعْدَ الْمَوَاقِيتِ فَمِيقَاتُهُ الْحِلُّ وَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَمِيقَاتُهُ فِي الْحَجِّ الْحَرَمُ وَفِي الْعُمْرَةِ الْحِلُّ وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ اِغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ وَالْغُسْلُ اَفْضَلُ وَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ اَوْ غَسِيلَيْنِ إِزَارًا وَ رِدَاءً وَمَسَّ طِيبًا اِنْ كَانَ لَهُ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ اللّٰهُمَّ اِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي ثُمَّ يُلَبِّي عَقِيبَ صَلٰوتِهِ فَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ نَوٰى بِتَلْبِيَتِهِ الْحَجَّ وَالتَّلْبِيَةُ اَنْ يَقُولَ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ –

<u>অনুবাদ॥ **মীকাত বা ইহরাম বাঁধার স্থানসমূহ ঃ**</u> মীকাত তথা ইহরাম ছাড়া যে স্থান অতিক্রম করা মানুষের জন্যে নাজায়েয তা হল মদীনা ১.বাসীদের জন্যে যুল হুলায়ফা। ২। ইরাকীদের জন্যে যাতু ইরক। ৩। শাম (সিরিয়া) বাসীদের জন্যে হাজফা। ৪। নজদবাসীদের জন্যে কার্‌ণ। ৫। য়ামনবাসীদের জন্যে ইয়ালমলম। এ সকল স্থান সমূহে পৌছার আগেই কেউ ইহরাম বাঁধে তা জায়েয। মীকাতের ভিতরে যারা অবস্থান করে তাদের মীকাত হল হিল্ল। মক্কায় যারা অবস্থান করে তাদের জন্য হজ্বের ক্ষেত্রে মীকাত হল হরমশরীফ। আর উমরার ক্ষেত্রে হিল্ল।

<u>**ইহরামের তরীকা ও মাসাইল ঃ**</u> ১. ইহরাম বাঁধার ইচ্ছে করলে গোসল করবে বা উযু করবে। তবে গোসল করাই উত্তম। অতঃপর দুটি নুতন বা ধৌত করা কাপড় পরিধান করবে। একটি লূঙ্গি অপরটি চাদর। সুগন্ধি থাকলে তা ব্যবহার করবে। অতঃপর দু'রাকাত নামায পড়বে। এবং বলবে – اَللّٰهُمَّ اِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি হজ্বের ইচ্ছে করেছি। অতএব তুমি তা আমার জন্যে সহজ করে দাও এবং আমার হজ্ব কবূল করে নাও। অতঃপর নামাযের পরে তালবিয়া (আল্লাহুম্মা লাব্বাইক ---) পড়বে। ২. ইফরাদ হজ্ব করলে হজ্বে এ তালবিয়া পড়বে- لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيكَ الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত। আমি উপস্থিত। তোমার দাসত্বের জন্যে তোমার দরবারে হাজির। সমস্ত প্রশংসা এবং রাজত্ব তোমারই তুমি অদ্বিতীয়।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা</u> ॥ قوله اَلْمَوَاقِيتُ . مَوَاقِيتُ মِيقَات এর বহুঃ وَقْتٌ মূলধাতু হতে উদ্‌গত, নির্দিষ্ট স্থানকে মীকাত বলে। অবশ্য ব্যাপক অর্থে ইহরাম বাঁধার সময়কেও মীকাত বলা যেতে পারে। তবে তা প্রচলিত নয়। ইহরাম বাঁধার সময় হল শাওয়াল হতে হজ্ব আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত। বাংলাদেশী, ভারতীয়ও পাকিস্তানীদের জন্যে মীকাত হল ইয়ালামলাম পাহাড়। অবশ্য বিমান যোগে জিদ্দা পৌছলে সেখানেই ইহরাম বাঁধলে তা জায়েয হয়ে যাবে।

وَلَا يَنْبَغِى اَنْ يُخِلَّ بِشَيْءٍ مِنْ هٰذِهِ الْكَلِمَاتِ فَاِنْ زَادَ فِيْهَا جَازَ فَاِذَا لَبّٰى فَقَدْ اَحْرَمَ فَلْيَتَّقِ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوْقِ وَالْجِدَالِ وَلَايَقْتُلُ صَيْدًا وَلَا يُشِيْرُ اِلَيْهِ وَلَايَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَايَلْبَسُ قَمِيْصًا وَلَاسَرَاوِيْلَ وَلَاعِمَامَةً وَلَا قَلَنْسُوَةً وَلَاقَبَاءً وَلَاخُفَّيْنِ اِلَّا اَنْ لَّايَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعُهُمَا مِنْ اَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ وَلَايُغَطِّى رَأْسَهٗ وَلَا وَجْهَهٗ وَلَايَمَسُّ طِيْبًا وَلَايَحْلِقُ رَأْسَهٗ وَلَا شَعْرَ بَدَنِهٖ وَلَايَقُصُّ مِنْ لِحْيَتِهٖ وَلَا مِنْ ظُفْرِهٖ وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ وَلَا بِزَعْفَرَانٍ وَلَابِعُصْفُرٍ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ غَسِيْلًا لَا يَنْفُضُ الصَّبْغَ وَلَا بَأْسَ اَنْ يَّغْتَسِلَ وَيَدْخُلَ الْحَمَّامَ وَيَسْتَظِلَّ بِالْبَيْتِ وَالْمَحْمَلِ وَيَشُدَّ فِىْ وَسَطِهِ الْهِمْيَانَ

অনুবাদ ॥ ১. ইহরামের পূর্বে এ শব্দগুলোর মধ্যে কোনটি বাদ দেওয়া উচিৎ নয়। অবশ্য আরো কোন শব্দ বৃদ্ধি করা জায়েয। তালবিয়া পড়ার দ্বারা ইহরাম সমপন্ন হয়ে গেল।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাদি ঃ ১. ইহরামের পর মুহরিম ব্যক্তি আল্লাহর নিষিদ্ধ কার্যাবলী। যথা– যৌন ও অশ্লীল কার্যাদি, ঝগড়া-কলহ প্রভৃতি কার্যাবলী হতে অবশ্যই বিরত থাকবে। ২. কোন শিকারী শিকার করবেনা বা তৎপ্রতি ইঙ্গিত করবেনা এবং কাউকে উহার সন্ধান দিবেনা ৩. জামা, পায়জামা, পাগড়ী, টুপী, শেরওয়ানী, ও মোজা পরিধান করবে না। ৪. অবশ্য মোজা না পেলে টাখনুর নীচ হতে মোজার উপরাংশ কেটে নিবে। ৫. মাথা ও মুখমন্ডল ঢাকবে না. ৬. কোন সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করবে না, ৭. মাথার চুল বা শরীরের পশম মুন্ডন করবেনা, এবং দাড়ি ও নখ কর্তন করবে না। ৮. অরস ঘাসের রস, জাফরান ও উসফুর লতার রসে রংকৃত কাপড় পরিধান করবে না। তবে (রং করার পর) ধৌত করলে তা পরা জায়েয। ৯. যদিও এতে কোন রং না উঠে।

ইহরাম কালে যা দোষনীয় নয় ঃ ইহরামের জন্যে ১. গোসল করা। ২. গোসল খানায় প্রবেশ করা। ৩. হাওদার ছায়ায় অবস্থান করা দোষণীয় নয়। এবং ৪. কমরে টাকার থলি বাঁধতে পারে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ يُخِلَّ কম করা। لَبّٰى তালবিয়া পড়ল। رَفَثٌ যৌনভোগ। فُسُوْقٌ - فِسْق এর বহুঃ পাপাচার। মিথ্যাচার جِدَال কলহ, দ্বন্দ্ব। صَيْد শিকারী। لَايَدُلّ সন্ধান দিবেনা। سَرَاوِيْل পায়জামা। قَبَاء শেরওয়ানী। وَرْس এক প্রকার সুগন্ধি ঘাস, কুসুম রং। عصفر এক প্রকার সুগন্ধি লতা (এ সবের রস দ্বারা কাপড় রং করা হয়।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله اَنْ يَّغْتَسِلَ الخ ঃ কেননা হযরত উমর (রা.) হতে গোসলের প্রমাণ রয়েছে, (মুয়াত্তা) - قوله لَايَلْبَسُ قَمِيْصًا الخ ঃ উল্লেখ্য যে, হজ্বের সমস্ত আমলই বস্তুতঃ প্রেমে মত্ত আশিকের পরিচয় দান। মানুষ যখন কারো প্রেমে মত্ত হয় তখন নিজের আরাম-আয়েশ, সাজ-সজ্জা পরিপাটি ভুলে প্রেমাষ্পদের পিছু ছুটতে থাকে। আল্লাহ পাক চান যে, বান্দা তাঁর প্রেমে মত্ত হয়ে এর পরিচয় দান করুক। এ কারণে সুন্দর পোশাক, সুগন্ধি ব্যবহার, নখ-চুল কর্তন ইত্যাদি নিষিদ্ধ হয়েছে।

قوله اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ غَسِيْلًا ঃ এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মূলত ঃ উক্ত রং দোষণীয় নয় বরং গন্ধের কারণে তা নিষিদ্ধ। এ কারণে ধৌত করার পর রং না উঠলেও তা পরা জায়েয।

وَلَا يَغْسِلَ رَأْسَهُ وَلَا لِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَيُكْثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ عَقِيْبَ الصَّلٰوَاتِ وَكُلَّمَا عَلَا شَرَفًا اَوْ هَبَطَ وَادِيًا اَوْ لَقِىَ رُكْبَانًا وَبِالْاَسْحَارِ فَاِذَا دَخَلَ بِمَكَّةَ اِبْتَدَأَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَاِذَا عَايَنَ الْبَيْتَ كَبَّرَ وَهَلَّلَ ثُمَّ اِبْتَدَأَ بِالْحَجَرِ الْاَسْوَدِ فَاسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرِ وَاسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَهُ اِنِ اسْتَطَاعَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّؤْذِىَ مُسْلِمًا ثُمَّ اَخَذَ عَنْ يَمِيْنِهِ مَايَلِى الْبَابَ وَقَدْ اِضْطَبَعَ رِدَاءَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ وَيَجْعَلُ طَوَافَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحَطِيْمِ وَيَرْمُلُ فِى الْاَشْوَاطِ الثَّلٰثِ الْاُوَلِ وَيَمْشِىْ فِيْمَا بَقِىَ عَلٰى هَيْئَتِهِ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ اِنِ اسْتَطَاعَ وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ بِالْاِسْتِلَامِ -

---

অনুবাদ ॥ স্বীয় মাথা ও দাড়ি খিতমী বা (সাবান) দ্বারা ধৌত করবেনা।

ইহরাম অবস্থায় করনীয় ঃ ১. মুহরিম ব্যক্তি সকল নামাযান্তে এবং উপরে উঠলে বা নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করলে বা সোয়ারীর সাক্ষাত করলে ও শেষ রাতে বেশী বেশী তালবিয়া পাঠ করবে।

তাওয়াফে কুদূম ও এর তরীকা ঃ ১. হাজীগণ মক্কায় পৌঁছলে সর্বাগ্রে মসজিদে হারামে প্রবেশ দ্বারা হজ্ব শুরু করবে। যখন কা'বাঘর চাক্ষুস দর্শণ করবে তখন আল্লাহু আকবর ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। ২. অতঃপর হাজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ শুরু করবে। উহাকে সামনে রেখে আল্লাহু আকবর ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। ৩. তাকবীর বলার সময় হাত উত্তোলন করবে। যদি কোন মুসলমান কে কষ্ট না দিয়ে সম্ভব হয় তাহলে হাজার আসওয়াদকে স্পর্শ করবে ও চুম্বন করবে। ৪. অতঃপর হাজরে আসওয়াদের ডান দিক থেকে যে দিকের সন্নিকট কা'বা ঘরের দরজা বিদ্যমান (সেদিক হতে) তাওয়াফ শুরু করবে। এর আগে স্বীয় চাদর ডান বগলের নিচদিয়ে কাঁধে পেঁচিয়ে নিবে। অতঃপর সাতবার তাওয়াফ করবে। তাওয়াফ হাতীমের বাইরে দিয়ে করতে হবে। ৫. প্রথম তিন ঘুর্ণনে রমল করবে। বাকী তাওয়াফ স্বাভাবিক অবস্থায় করবে। ৬. যখনই হাজরে আসওয়াদের পার্শ্ব দিয়ে যাবে সম্ভব হলে তা চুম্বন করবে। আর চুম্বনের মাধ্যমেই তাওয়াফ শেষ করবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ خِطْمِىٌّ সুগন্ধি ফেনাদার ঘাস। عَلَا উপরে চড়ে, شَرَفٌ উঁচুস্থান, هَبَطَ নিচে নামে, رُكْبَانًا সোয়ার (যানবাহন) أَسْحَارَ - سَحَر এর বহুঃ রাতের শেষ প্রহর, عَايَنَ চাক্ষুস দেখবে, اِضْطَبَعَ চাদরের একপার্শ্ব ডান বগলদিয়ে বের করে বাম কাধের ওপর ঝুলিয়ে রাখা, أَشْوَاطُ- شَوْطٌ এর বহু ঃ প্রদক্ষিণ, ঘুর্ণন। حَطِيْم রোকন, যমযম ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থান। এর ছয়হাত জায়গা বায়তুল্লাহর অন্তর্ভূক্ত, গায়াতুল বয়ান রচয়িতার মতে হযরত ইসমাঈল ও হাজেরার কবর এখানেই। رَمْلٌ কাঁধ হেলিয়ে বীর দর্পে চলা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله فَاِذَا عَايَنَ الخ ঃ কাবা গৃহ দেখার সাথে সাথে তাকবীর ও তাহলীল পড়বে। এর শব্দ বিভিন্নরূপ বর্ণিত আছে যথা– (١) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - (٢) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ - (٣) بِسْمِ اللّٰهِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ

قوله وَاسْتَلَمَ ঃ اِسْتِيلَام অর্থ স্পর্শ করা, এর পদ্ধতি এই যে, উভয় হাত হাজরে আসওয়াদের ওপর রেখে তার মাঝে চুম্বন করবে। সম্ভব নাহলে স্পর্শ করে হাতে চুম্বন করবে। আর তাও সম্ভব না হলে দূর হতে হাত ঐদিকে করে হাতে চুম্বন করবে। উল্লেখ্য যে, হাজরে আসওয়াদটি বেহেশ্ত হতে অবতারিত বরকতময় পাথর। এ চুম্বন মূলত ঃ আল্লাহর স্মরন ও তাঁর ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ।

ثُمَّ يَأْتِي الْمَقَامَ فَيُصَلِّي عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ أَوْ حَيْثُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهٰذَا الطَّوَافُ طَوَافُ الْقُدُوْمِ وَهُوَ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَيْسَ عَلٰى أَهْلِ مَكَّةَ طَوَافُ الْقُدُوْمِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا فَيَصْعَدُ عَلَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُو اللّٰهَ تَعَالٰى لِحَاجَتِهِ ثُمَّ يَنْحَطُّ نَحْوَ الْمَرْوَةِ وَيَمْشِي عَلٰى هَيْئَتِهِ فَإِذَا بَلَغَ إِلٰى بَطْنِ الْوَادِي سَعٰى بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ سَعْيًا حَتّٰى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ فَيَصْعَدُ عَلَيْهَا وَيَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا وَهٰذَا شَوْطٌ فَيَطُوْفُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَبْتَدِئُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقِيْمُ بِمَكَّةَ مُحْرِمًا فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَالَهُ وَإِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ الْإِمَامُ خُطْبَةً يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيْهَا الْخُرُوْجَ إِلٰى مِنًى وَالصَّلٰوةَ بِعَرَفَاتٍ وَالْوُقُوْفَ وَالْإِفَاضَةَ ـ

অনুবাদ ॥ অতঃপর মাকামে ইবরাহীমে আসবে, এবং তথায় বা মসজিদের যে কোন অংশে সম্ভব দু'রাকাত নামায পড়বে। এ হল তাওয়াফে কুদূম। এ তাওয়াফ ওয়াজিব নয়। (বরং সুন্নত) মক্কায় অবস্থান কারীদের জন্যে এ তাওয়াফ (সুন্নাত) নয়।

সাঈ'র বিধান ও পদ্ধতি ঃ তাওয়াফে কুদূমের পর সাফা পর্বত অভিমুখে গমন পূর্বক উক্ত পর্বতে আরোহণ করবে। এ সময় বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে তাকবীর ও তাহলীল পড়বে এবং নবীজী (সা.) এর ওপর দরূদ পড়ে নিজ প্রয়োজন অনুপাতে দোআ করবে। অতঃপর সাফা হতে নেমে মারওয়া অভিমুখে গমণ করবে এবং স্বাভাবিক গতিতে হাঁটবে। এর পর বাত্নে ওয়াদীতে পৌছে সবুজ স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে দ্রুত দৌড়াবে। মারওয়ায় পৌছার পর তাতে আরোহণ করবে এবং সাফাতে যা করেছে উক্তরূপ আমল করবে। এতে এক চক্কর হল। এভাবে মোট ৭ চক্কর দিবে। সাফা হতে শুরু করে মারওয়ায় এসে শেষে করবে। অতঃপর (৮ তারীখ পর্যন্ত) ইহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করবে এবং যখন ইচ্ছে হয় কা'বা ঘর তওয়াফ করবে। তালবিয়া (৮ই যিলহজ্ব) এর পূর্বের দিন ইমাম খুৎবা দান করবেন। এতে তিনি হাজীগণের মিনা হতে বের হওয়া। আরাফায় অবস্থান, নামায আদায়, ও তওয়াফে ইফাযা (মিনা হতে আরাফায় গমণে) এর নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দিবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله يَأْتِي الْمَقَامَ ঃ মাকামে ইবরাহীম একটা বেহেশ্তী পাথর, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যার ওপর দাঁড়িয়ে কা'বা গৃহ নির্মাণ করেন। প্রয়োজন অনুপাতে এটা উপরে উঠতো ও নিচে নামতো। এর ওপর এখনো তাঁর পদচিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। এটা কা'বা ঘরের সম্মূখে অবস্থিত ও জালি দ্বারা বেষ্টিত। এ স্থলে বা সম্ভব না হলে পার্শ্ববর্তী যে কোন অংশে ২ রাকাত নামায পড়া সুন্নাত।

فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ خَرَجَ إِلَى مِنًى وَأَقَامَ بِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ فَيُقِيمُ بِهَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ - فَيَبْتَدِئُ بِالْخُطْبَةِ أَوَّلًا فَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهِمَا الصَّلٰوةَ وَالْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةَ وَ رَمْيَ الْجِمَارِ وَالنَّحْرَ وَالْحَلْقَ وَطَوَافَ الزِّيَارَةِ وَيُصَلِّي بِهِمُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي رَحْلِهِ وَحْدَهُ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقْتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالَى يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا الْمُنْفَرِدُ ـ

অনুবাদ ॥ মিনায় করণীয় ও আরাফায় অবস্থান ঃ তালবিয়ার দিন ফজর নামায পড়ে মক্কা হতে মিনার উদ্দেশ্যে বের হবে এবং সেখানে আরাফার দিনের ফজর পড়া পর্যন্ত অবস্থান করবে। তথায় ফরজ পড়ে আরাফা অভিমুখে যাত্রা করবে ও সেখানে অবস্থান করবে। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পর ইমাম সকলকে নিয়ে একত্রে যুহর ও আসর নামায আদায় করবে। প্রথমে খুৎবা দ্বারা শুরু করবেন। নামাযের পূর্বে দু'বার খুৎবা দিবেন। খুৎবাদ্বয়ে নামায, আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান, পাথর কণা নিক্ষেপ, কুরবানী, মাথা মুন্ডন, ও তাওয়াফে যিয়ারতের মাসায়েল শিক্ষা দিবেন। অতঃপর যুহরের ওয়াক্তে এক আযান ও দু' ইকামাতের মাধ্যমে যুহর ও আসর নামায আদায় করবেন। ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে কেউ একাকী নিজ তাবুতে যুহর আদায় করলে প্রত্যেক নামায সঠিক সময়ে আদায় করবে। আর আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন- একাকী নামায আদায়কারী ও উভয় নামায একই সাথে আদায় করবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ رَمْيٌ অর্থ নিক্ষপ করা, جَمْرَة - جِمَار এর বহু ঃ পাথর কণা, বা পাথর নিক্ষেপের স্থান। জামরা বা পাথর নিক্ষেপের স্থান ৩টি। এগুলোকে জামরায়ে উলা, জামরায়ে উস্তা ও জামারায়ে আকাবা বলে। শেষোক্তটি হজ্বের ওয়াজিব সমূহের অন্তর্গত। نَحْر কুরবানী, رَحْل হাওদা বা তাবু, جَبَل পর্বত, জাবালে রহমত উদ্দেশ্য। بَطْنَ عُرَنَةَ উরনা, হারাম শরীফে মসজিদে আরাফার পশ্চিম পার্শ্বের মাঠ। رَاحِلَه বাহন, সোয়ারী, مَنَاسِكُ - نُسُكٌ এর বহু ঃ হজ্বের করণীয় কাজ।

قوله يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ঃ تَرْوِيَة অর্থ উটকে পেটভরে ঘাসপানি খাওয়ান। এদিনে মিনা হতে বের হয়ে পূনরায় মক্কায় ফিরা পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের জন্যে উটকে ভাল করে আহার করান হতো। বিধায় একে তারবিয়ার দিন বলে।

قوله إِلَى مِنًى الخ ঃ খানায়ে কা'বা হতে ৩ মাইল দূরত্বে অবস্থিত হারাম শরীফের অন্তর্গত স্থান। মিনার সর্ব বৃহত মসজিদ হল "মসজিদে খায়ফ"। বর্ণিত আছে যে, অত্র মসজিদে ৭০ জন নবী আগমন করেছেন। তথায় ৭০ জন নবীর সমাধী রয়েছে। قوله الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ الخ ঃ আরাফা হল ১২ বর্গমাইল পরিধির বিরাট প্রান্তর। মক্কা হতে ৯ মাইল ও মিনা হতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ৯ই যিলহিজ্জা তারীখে কিছুক্ষণ হলেও এখানে অবস্থান করা ফরয। এরই মধ্যভাগে জাবালে রহমত অবস্থিত। আর মিনাও আরাফার মধ্যবর্তী স্থানের নাম মুযদালিফা।

قوله يُصَلِّي بِهِمُ الظُّهْرَ الخ ঃ মিনায় একত্রে যুহরও আসর পড়াকে جَمْعِ تَقْدِيمٍ এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়াকে جَمْعِ تَاخِيرٍ বলে। উভয় নামাযের জন্যে আযান একবার, ও ইকামত ভিন্নভিন্ন দিতে হয়।

ফায়েদা ঃ হজ্বের সময় মক্কায় ১৫টি স্থানে দোয়া কবুল হয়। "নাহর" রচয়িতা (র.) সবগুলিকে ২টি ছন্দে একত্রিত করেছেন। যথা–

دُعَاءُ الْبَرَايَا يُسْتَجَابُ بِكَعْبَةٍ * وَمُلْتَزَمٍ وَالْمَوْقِفَيْنِ كَذَا الْحَجَرُ

طَوَافٌ وَسَعْيٌ مَرْوَتَيْنِ فَزَمْزَمٌ * مَقَامٌ وَمِيزَابٌ جِمَارُكَ تُعْتَبَرُ

ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْمَوْقِفِ فَيَقِفُ بِقُرْبِ الْجَبَلِ وَعَرَفَاتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيَدْعُو وَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ - فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِمْ حَتَّى يَأْتُوا الْمُزْدَلِفَةَ فَيَنْزِلُونَ بِهَا ـ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِلُوا بِقُرْبِ الْجَبَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْمِيقَدَةُ يُقَالُ لَهُ الْقُزَحُ وَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الطَّرِيقِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالَى فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بِغَلَسٍ ثُمَّ وَقَفَ الْإِمَامُ وَوَقَفَ النَّاسُ مَعَهُ فَدَعَا وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ ثُمَّ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى يَأْتُوا مِنًى فَيَبْتَدِئُ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَيَاتِ الْقَذْفِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ ثُمَّ يَذْبَحُ إِنْ أَحَبَّ ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ وَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ -

---

অনুবাদ॥ অতঃপর মাওকেফ অভিমুখে যাত্রা করবে। এবং জাবালে রহমতের সন্নিকট অবস্থান করবে। বাতনে উরনা ব্যতিত আরাফার সকল স্থানই মাওকিফ। ইমামের জন্যে আরাফায় নিজ বাহনে অবস্থান করা, দোয়া করা, ও মানুষকে হজ্বের মাসায়েল শিক্ষা দেয়া উচিৎ। উকূফে আরাফার পূর্বে (৯ তারীখের দুপুরে) গোসল করা ও বেশী মাত্রায় দোয়া করা মুস্তাহাব।

মুযদালেফায় অবস্থান কালে করণীয় ঃ ১. যখন সূর্য অস্তমিত হবে তখন মাগরিব না পড়ে হাজীগণ সহ স্বাভাবিক অবস্থায় মুযদালিফায় আগমন করে সেখানে অবতরণ করবে। মুস্তাহাব হল ঐ পর্বতের নিকটবর্তী অবতরণ করা যার ওপর মীকাদা অবস্থিত। একে 'কুযাহ' বলা হয়। ২. ইমাম তথায় হাজীগণকে নিয়ে ইশার ওয়াক্তে একই আযান ও ইকামাতের মাধ্যমে মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করবে। পথিমধ্যে কেউ মাগরিব আদায় করলে তরফাইন (র.) এর নিকট তার নামায জায়েয হবেনা। ৩. সুবহে সাদিক হলে ইমাম সমবেত হাজীগণ কে নিয়ে অতি প্রত্যুষে (আঁধারে) ফজর নামায আদায় করবে। অতঃপর ইমাম ও হাজীগণ দাঁড়িয়ে দোয়া করবে। মুযদালিফার বাতনে মুহাসসার ছাড়া সকল অংশ মাওকিফ। অতঃপর ইমাম সূর্যোদয়ের পূর্বেই হাজীগণসহ যাত্রা করবে, মিনায় আগমন করে জামরা আকাবা দ্বারা কাজ শুরু করবে। এলক্ষে বাতনে ওয়াদী হতে সাতটি পাথর কণা নিক্ষেপ করবে। প্রতিবার পাথর নিক্ষেপ কালে তাকবীর বলবে। জামরার নিকট অবস্থান করবে না। প্রথম পাথর নিক্ষেপের সময় হতে তালবিয়া পড়া বন্ধ করবে। অতঃপর ভাল মনে করলে কুরবাণী করবে। অতঃপর মাথা মুন্ডন করবে বা চুল খাট করবে। তবে মাথা মুন্ডন করাই উত্তম। তখন হতে নারী সঙ্গম ছাড়া বাকী সকল কাজ বৈধ।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ مِيقَدَة জ্বালিবার স্থান, এক জায়গার নাম, জাহিলিয়্যাতের যুগে মানুষে এখানে আগুন জ্বালাত। একারণে তাকে مِيقَدَة বলে। قُزَح মুযদালিফার এক পর্বতের নাম। ইহা বহু নবীর অবস্থান স্থল। কারো মতে এখানে আদম (আ.) এর চূলা ছিল। غَلَس অন্ধকার, بَطْنُ مُحَسِّر মিনা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী উপত্যকা। আবরাহার হস্তিবাহিনী এখানে ধ্বংস হয়েছিল একারণে অবস্থান নিষেধ। حَصَيَات পাথর কণা خَذْف পাথর নিক্ষেপ।

ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ مِنْ يَوْمِهِ ذٰلِكَ اَوْ مِنَ الْغَدِ اَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ فَاِنْ كَانَ سَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ لَمْ يَرْمُلْ فِي هٰذَا الطَّوَافِ وَلَاسَعْيَ عَلَيْهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ قَدَّمَ السَّعْيَ رَمَلَ فِي هٰذَا الطَّوَافِ وَيَسْعٰى بَعْدَهُ عَلٰى مَاقَدَّمْنَاهُ وَقَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَهٰذَا الطَّوَافُ هُوَ الْمَفْرُوضُ فِي الْحَجِّ وَيُكْرَهُ تَاخِيرُهُ عَنْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ فَاِنْ اَخَّرَهُ عَنْهَا لَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ اَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَاشَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعُودُ اِلٰى مِنٰى فَيُقِيمُ بِهَا فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ اَيَّامِ النَّحْرِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلٰثَ يَبْتَدِئُ بِالَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَقِفُ عِنْدَهَا فَيَدْعُو ثُمَّ يَرْمِي الَّتِي تَلِيهَا مِثْلَ ذٰلِكَ وَيَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ كَذٰلِكَ وَلَايَقِفُ عِنْدَهَا فَاِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلٰثَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ كَذٰلِكَ -

---

অনুবাদ ॥ **মক্কায় প্রত্যাবর্তন ও তওয়াফে যিয়ারত ঃ** ১. মাথা মুন্ডনের পর সে দিনই মক্কায় ফিরে আসবে। সেদিন সম্ভব নাহলে পরদিন বা তার পরদিন চলে আসবে। এবং সাত চক্করে বায়তুল্লাহর তওয়াফে যিয়ারত করবে। যতি তওয়াফে কুদুমের আগে সাফা-মারওয়ার সাঈ' করে থাকে তাহলে এ তওয়াফে রমল করবেনা এবং সাঈ'ও আর করতে হবেনা। আর আগে সাঈ' না করে থাকলে এ তওয়াফে রমল করবে। এবং পূর্বোক্ত বর্ণনা মোতাবেক সাফা-মারওয়ায় সাঈ' করবে। এর পর তার জন্যে নারী সম্ভোগ ও হালাল হয়ে যাবে। হজ্বের মধ্যে এ তওয়াফটি ফরয। আর এটা এ কয়দিনের (১১-১৩) থেকে বিলম্বিত করা মাকরূহ। বিলম্ব করলে ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে তার ওপর দম (কুরবানী করা) ওয়াজিব তবে সাহিবাঈস (র.) বলেন তার ওপর কিছুই ওয়াজিব নয়।

মিনায় প্রত্যাবর্তন ও পুনরায় পাথর নিক্ষেপ ঃ তওয়াফে যিয়ারতের পর পুনরায় মিনায় প্রত্যাবর্তন করবে। এবং (দু'দিন) সেখানে অবস্থান করবে। আইয়্যামে নহরের (১১ই যিলহিজ্জা) দ্বিতীয় দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিনো জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবে। মসজিদে খায়ফ সংলগ্ন জামরা (উলা) থেকে শুরু করবে। সেখানে ৭টি পাথর কণা নিক্ষেপ করবে। প্রতিবার নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলবে। অতঃপর তথা কিছুক্ষণ অবস্থান করে দোয়া করবে। তারপর নিকটস্থ জামরায় (উস্তা) ঐভাবে পাথর নিক্ষেপ করবে ও কিছুক্ষণ অবস্থান করবে। এরপর জামরায়ে আকাবায় পাথর ছুড়বে। তবে সেখানে অবস্থান করবেনা। পরদিন অনুরূপ (১২ই যিল্‌হিজ্জা) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর পূর্বের নিয়মে তিনো জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবে।

وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ النَّفْرَ نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلٰثَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ كَذٰلِكَ فَإِنْ قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هٰذَا الْيَوْمِ قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَا يَجُوْزُ وَيُكْرَهُ أَنْ يُقَدِّمَ الْإِنْسَانُ ثِقْلَهُ إِلٰى مَكَّةَ وَيُقِيْمَ بِهَا حَتّٰى يَرْمِيَ فَإِذَا نَفَرَ إِلٰى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لَا يَرْمُلُ فِيْهَا وَهٰذَا طَوَافُ الصَّدْرِ وَهُوَ وَاجِبٌ إِلَّا عَلٰى أَهْلِ مَكَّةَ ثُمَّ يَعُوْدُ إِلٰى أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلِ الْمُحْرِمُ مَكَّةَ وَتَوَجَّهَ إِلٰى عَرَفَاتٍ وَ وَقَفَ بِهَا عَلٰى مَاقَدَّمْنَاهُ سَقَطَ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُوْمِ وَ لَاشَيْءَ عَلَيْهِ لِتَرْكِهِ وَمَنْ أَدْرَكَ الْوُقُوْفَ بِعَرَفَةَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ اجْتَازَ بِعَرَفَةَ وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَرَفَاتٌ أَجْزَاهُ ذٰلِكَ عَنِ الْوُقُوْفِ وَالْمَرْأَةُ فِي جَمِيْعِ ذٰلِكَ كَالرَّجُلِ غَيْرَ أَنَّهَا لَاتَكْشِفُ رَأْسَهَا وَتَكْشِفُ وَجْهَهَا وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ وَلَاتَرْمُلُ فِي الطَّوَافِ وَلَا تَسْعٰى بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ وَلَا تَحْلِقُ وَلٰكِنْ تُقَصِّرُ –

অনুবাদ॥ কোন হাজী দ্রুত মক্কায় প্রস্থান করতে চাইলে সে মক্কায় চলে যাবে। আর যদি মিনায় থাকতে চায় তাহলে সে চতুর্থ দিন (১৩ তারীখ) সূর্য হেলে যাওয়ার পর পূর্বের নিয়মে তিনো জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবে। কেউ এ দিন ফজরের পর হতে দুপুরের আগেই পাথর নিক্ষেপ করলে ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে তা জায়েয হয়ে যাবে। কিন্তু সাহিবাইন (র.) বলেন- এটা জায়েয হবেনা। হাজীর জন্যে স্বীয় সামান-পত্র মক্কায় পাঠিয়ে পাথর নিক্ষেপের জন্যে মিনায় অবস্থান করা মাকরূহ।

মক্কায় প্রত্যাবর্তন ও তওয়াফে সদর ঃ এর পর যখন মক্কায় ফিরবে পথে বাতনে মুহাস্‌সা'ব নামক স্থানে অবতরণ করবে (ও কিছু সময় অবস্থান করবে)। অতঃপর মক্কায় পৌঁছে সাতচক্করে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করবে। এ সময় রমল করবেনা। একে 'তওয়াফে সদর' বলে। এটা মক্কার অধিবাসী ছাড়া বাকী সকলের ওপর ওয়াজিব। তারপর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করবে।

হজ্ব সংক্রান্ত কতিপয় মাসায়েল ঃ ১. মুহরিম ব্যক্তি যদি মক্কায় প্রবেশ না করে সরাসরি আরাফায় চলে আসে এবং পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী উকূফে আরাফা সম্পন্ন করে তাহলে তার জন্যে তওয়াফে কুদূম রহিত হয়ে যাবে। এটা তরকের কারণে তার ওপর কোন খেসারত আরোপিত হবেনা। ২. কেউ ৯ তারীখের সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে ইয়াওমে নাহর তথা ১২তারীখের ফজর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উকূফে আরাফা সমাধা করতে পারলে সে হজ্ব পেলো। ৩. কোন ব্যক্তি ঘুমন্ত বা বেহুস অবস্থায় অথবা এটা যে, আরাফা তা না জেনে অতিক্রম করে গেলে এটাই তার জন্যে উকূফে আরাফার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে।

মহিলাদের হজ্ব ঃ হজ্বের সমস্ত কার্যাবলীতে মহিলারা পুরুষের ন্যায়। তবে পার্থক্য এই যে, (ক) তারা মাথা উম্মুক্ত করবেনা। তবে চেহারা উম্মুক্ত রাখবে, (খ) তালবিয়া পাঠ কালে স্বর উঁচু করবেনা। (গ) তওয়াফ কালে রমল করবেনা। (ঘ) সবুজ খুটিদ্বয়ের মাঝে সাঈ করবেনা। ও (ঙ) হজ্ব শেষে মাথা মুন্ডাবেনা বরং কেশের অগ্রভাগ সামান্য ছাটাবে।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা</u> ॥ قوله وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ الخ ঃ আইয়্যামে নহর বা কুরবাণীর দিন তিনটি ১০-১১ও১২। এ তিনদিন পাথর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। এর পর হাজীদের জন্যে মক্কায় আসার অনুমতি আছে। তবে আসতে হলে ১৩ তারীখের ফজরের আগেই আসতে হবে। মিনায় থাকা কালে ফজর হয়ে গেলে সেদিনও পাথর নিক্ষেপ ওয়াজিব হয়ে যাবে।

قوله نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ الخ : مُحَصَّبٌ অর্থ– পাথুরে ভূমি। এটা মক্কার অদূরে দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক স্থানের নাম। এস্থলে ফিরার পথে কিছুক্ষণ অবস্থান করা সুন্নত।

<u>হজ্জের সংক্ষিপ্ত বিবরনী</u>

<u>প্রথম পর্যায় ঃ</u> মীকাত হতে ইহ্‌রাম বেঁধে তালবিয়া পড়তে হবে। অতঃপর বায়তুল্লাহয় যেয়ে দোয়া করবে। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করবে। এরপর হাজরে আসওয়াদ হতে সাত চক্করে তওয়াফে কুদূম শুরু করবে। প্রতি চক্করে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করবে। ও তিন চক্করে রমল করবে। তওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকাত নামায পড়বে, অতঃপর মুলতাযাম ও মীযাবে দোয়া করবে। যমযমের পানি পান করে ৭ বার সাঈ' করবে।

<u>দ্বিতীয় পর্যায় ঃ</u> ৮ম তারীখে ফজরের পর মিনায় এসে অবস্থান করবে। ৯ম তারীখে সূর্যোদয়ের পর আরাফায় আসবে। যুহরের ওয়াক্তে যুহর ও আসর একত্রে আদায় করবে। ইমাম মাওকেফে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিবেন ও বিশ্ব মুসলিমের জন্যে দোয়া করবেন। বাৎনে উরণা ছাড়া যে কোন স্থানে অবস্থান করবে। সূর্যাস্তের পর মাগরিব না পড়ে মুযদালিফায় গমন করবে। সেখানে মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়বে। মুহাসসাব ছাড়া যে কোন জায়গায় অবস্থান করবে।

<u>তৃতীয় পর্যায় ঃ</u> ১০ম তারীখের ভোরে আবার মিনায় এসে তালবিয়া বন্ধ করে জামরায়ে আকাবায় পাথর মারবে। অতঃপর কুরবানী করে মাথা মুন্ডন করবে বা চুল ছাটাবে। এপর্যন্ত কাজ সম্পন্নের পর স্ত্রী মিলন ছাড়া নিষিদ্ধ সকল কাজ বৈধ হয়ে যাবে।

<u>চতুর্থ পর্যায় ঃ</u> পুনরায় মক্কায় এসে তওয়াফে যিয়ারত করবে। এরপর স্ত্রী মিলন ও জায়েয হয়ে যাবে। তওয়াফে যিয়ারতের পর পূনরায় মিনায় এসে ১১ও১২ তারীখে তিনো জামরায় পাথর ছুড়বে।

<u>পঞ্চম পর্যায় ঃ</u> ১২ তারীখে সূর্যাস্তের পূর্বে মক্কায় যাত্রা কালে বাতনে মুহাসসাবে সামান্য বিরতি করে দোয়া করবে। অতঃপর এসে সর্বশেষ তওয়াফের মাধ্যমে স্বদেশ যাত্রা করবে।

اَلتَّمْرِيْنُ – (অনুশীলনী)

১। حج এর শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ কি? ইসলামে হজ্বের গুরুত্ব ও উপকারীতা সম্পর্কে যা জান লিখ।
২। হজ্ব তাৎক্ষণিক পালন ওয়াজিব না বিলম্বের অবকাশ আছে? বিস্তারিত আলোচনা কর।
৩। হজ্বের ফরয কয়টি ও ওয়াজিব কয়টি? বর্ণনা কর।
৪। তওয়াফ কাকে বলে? তওয়াফের ওয়াজিব কয়টি ও কি কি?
৫ হজ্ব কত প্রকার ও কি কি? হজ্ব ফরয হওয়ার শর্ত কয়টি ও কি কি?
৬। মীকাত অর্থ কি? মীকাত কয়টি ও কি কি?
৭। ইহ্‌রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাদি কি কি?
৮। সাঈ কাকে ও وُقُوفِ عَرَفَه বলতে কি বুঝ? এর হুকুম কি?
৯। جَمْعِ تَقْدِيْم ও جَمْعِ تَاخِيْر কাকে বলে? এর বিধান কি? লিখ।
১০। মুযদালিফায় অবস্থান কালে করণীয় কি?
১১। তওয়াফে সদর কাকে বলে? এর হুকুম কি?

بَابُ الْقِرَانِ

اَلْقِرَانُ اَفْضَلُ عِنْدَنَا مِنَ التَّمَتُّعِ وَالْاِفْرَادِ وَصِفَةُ الْقِرَانِ اَنْ يُّهِلَّ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا مِنَ الْمِيْقَاتِ وَيَقُوْلُ عَقِيْبَ الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْ هُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ فَاِذَا دَخَلَ مَكَّةَ اِبْتَدَأَ بِالطَّوَافِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ يَرْمَلُ فِى الثَّلٰثَةِ الْاُوْلِ مِنْهَا وَيَمْشِىْ فِىْ مَابَقِىَ عَلٰى هَيْئَتِهٖ وَسَعٰى بَعْدَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهٰذِهٖ اَفْعَالُ الْعُمْرَةِ ثُمَّ يَطُوْفُ بَعْدَ السَّعْىِ طَوَافَ الْقُدُوْمِ وَيَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِىْ حَقِّ الْمُفْرِدِ فَاِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ذَبَحَ شَاةً اَوْ بَقَرَةً اَوْ بَدَنَةً اَوْ سُبْعَ بَدَنَةٍ اَوْ سُبْعَ بَقَرَةٍ فَهٰذَا دَمُ الْقِرَانِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ مَا يَذْبَحُ صَامَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ اٰخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ فَاِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتّٰى يَدْخُلَ يَوْمُ النَّحْرِ لَمْ يُجْزِهٖ اِلَّا الدَّمُ ثُمَّ يَصُوْمُ سَبْعَةَ اَيَّامٍ اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَاِنْ صَامَهَا بِمَكَّةَ بَعْدَ فَرَاغِهٖ مِنَ الْحَجِّ جَازَ فَاِنْ لَمْ يَدْخُلِ الْقَارِنُ بِمَكَّةَ وَتَوَجَّهَ اِلٰى عَرَفَاتٍ فَقَدْ صَارَ رَافِضًا لِعُمْرَتِهٖ بِالْوُقُوْفِ وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِ الْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا -

---

কিরান হজ্ব প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ হানাফীগণের মতে তামাত্তু ও ইফরাদ হজ্বের তুলনায় কিরান হজ্ব উত্তম।

কিরান হজ্বের নিয়ম ঃ কিরান হজ্বের নিয়ম এইযে, ১. মীকাত হতে একত্রে হজ্ব ও উমরার ইহরাম বাঁধবে, এবং ইহরামের নামাযান্তে এ দোয়া পড়বে ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ ..... الخ অর্থ– "হে আল্লাহ! আমি হজ্ব ও উমরার ইচ্ছে করেছি। তুমি এ দু'টি আমার জন্যে সহজ কর। দাও এবং উভয়টি আমার থেকে কুবল করে নাও। ২. অতঃপর মক্কায় প্রবেশ করলে তওয়াফের মাধ্যমে হজ্ব কার্য সূচনা করবে। প্রথমে ৭ চক্কর বায়তুল্লাহ তওয়াফ করবে। এর প্রথম তিন চক্করে রমল করবে। বাকী চারটি স্বাভাবিক ভাবে করবে। ৩. অতঃপর সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করবে। এগুলো হল উমরার কার্যাবলী। ৪. সাঈ'র পর পুনরায় তওয়াফে কুদূম করবে ও হজ্বের জন্যে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করবে। যেমন ইফরাদ হজ্ব কারীর ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। ৫. ইয়াওমুন্নাহরে পাথর নিক্ষেপের পর ছাগল, গরু, উট বা গরু কিম্বা উটে এক ভাগ কুরবাণী করবে। এটা হল কিরানের কুরবাণী। ৬. যদি কারো কুরবাণীর জন্তু না থাকে তাহলে হজ্বের মধ্যেই তিনদন রোযা রাখবে। তার শেষদিন হবে ৯ তারীখ। যদি রোযা ছুটে যায়, আর ইয়াওমুন্নাহার চলে আসে তাহলে আর কিছুই যথেষ্ট হবেনা (দম) কুরবাণী ছাড়া। ৭. অতঃপর স্বদেশ ফিরে ৭ দিন রোযা রাখবে। হজ্ব কার্য সম্পন্ন করার পর মক্কায় অবস্থান কালে রোযা রাখলে তা জায়েয হয়ে যাবে। কিরান হজ্ব আদায়কারী যদি মক্কায় দাখিল না হয়ে সরাসরি আরাফায় গমন করে তাহলে উকূফে আরাফার কারণে উমরা ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে। এবং তার যিম্মা হতে কিরানের কুরবাণী রহিত হয়ে যাবে। আর উমরা ভঙ্গের দরুন কুরবানী করা ও পরে উমরা কাযা করা জরুরী হয়ে যাবে। (অঃ পঃ দ্রঃ)

بَابُ التَّمَتُّعِ

اَلتَّمَتُّعُ اَفْضَلُ مِنَ الْاِ فْرَادِ عِنْدَنَا وَالْمُتَمَتِّعُ عَلٰى وَجْهَيْنِ مُتَمَتِّعٍ يَسُوْقُ الْهَدْىَ وَمُتَمَتِّعٍ لَايَسُوْقُ الْهَدْىَ وَصِفَةُ التَّمَتُّعِ اَنْ يَبْتَدِئَ مِنَ الْمِيْقَاتِ فَيُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَيَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَطُوْفُ لَهَا وَيَسْعٰى وَيَحْلِقُ اَوْ يُقَصِّرُ وَقَدْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهٖ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ اِذَا ابْتَدَأَ بِالطَّوَافِ وَيُقِيْمُ بِمَكَّةَ حَلَالًا فَاِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَفَعَلَ مَايَفْعَلُهُ الْحَاجُّ الْمُفْرِدُ وَعَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ مَايَذْبَحُ صَامَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةً اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهٖ -

---

তামাত্তু' হজ্ব প্রসঙ্গ

অনুবাদ॥ গুরুত্ব ও প্রকারভেদ ঃ হানফীগণের মতে হজ্বে ইফরাদ হতে তামাত্তু' উত্তম। তামাত্তু' আদায়কারী দু' ধরণের হতে পারে। (এক) তামাত্তু' আদায়কারী কুরবাণীর পশু সঙ্গে নিয়ে যাবে। (দুই) তামাত্তু' আদায়কারী কুরবানীর পশু সঙ্গে নিবেনা।

তামাত্তু' আদায়ের পদ্ধতি ঃ (প্রথমোক্ত তামাত্তু' আদায়কারী ব্যক্তি) মীকাত হতে শুরু করবে। প্রথমে উমরার ইহরাম বাঁধবে। অতঃপর মক্কায় গমন করে তওয়াফ করবে ও সাঈ' করবে। অতঃপর চুল হলক বা কছর করবে। এরদ্বারা উমরা হতে ফারেগ হল। তওয়াফ শুরুর প্রাক্কালে তালবিয়া বন্ধ করবে। মক্কায় হালাল অবস্থায় অবস্থান করবে। ২. অতঃপর তারবিয়ার দিনে বায়তুল্লাহ হতে হজের ইহরাম বাঁধবে। এরপর ইফরাদ হজ্ব আদায়কারীর ন্যায় হজ্বকার্য সম্পন্ন করবে। ৩. তার ওপর তামাত্তুর কুরবাণী ওয়াজিব। যদি কুরবাণীর পশু না পায় তাহলে হজ্বের মধ্যেই ৩ দিন এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর রাখবে ৭দিন রোযা রাখবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله اَلتَّمَتُّعُ اَفْضَلُ ঃ আবু হানীফা (র.) এর মতে ইফরাদের তুলনায় তামাত্তু' উত্তম। তবে অন্য এক বর্ণনায় ইফরাদ উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতও এটাই। কেননা তামাত্তু' আদায় কারী ব্যক্তি মীকাত হতে শুধু উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় আসে। প্রথমে উমরার কার্য্যাবলী আদায় করে। এর পর হজ্ব করে। সুতরাং তার সফরের শুরু কেবল উমরার জন্যে হল। অপর দিকে মুফরিদ ব্যক্তির সফর শুরু হতেই হজ্বের জন্যে। সুতরাং এটাই উত্তম। আর তামাত্তু' উত্তম হওয়ার কারণ হল-এর দ্বারা جَمْعٌ بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ (একত্রে দু'ইবাদত) হয়। সুতরাং এর সাওয়াব বেশী হবে।

(পূর্বের পৃষ্ঠার পর) প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله اَلْقِرَانُ اَفْضَلُ ঃ পবিত্র কোরআনে তিনো প্রকার হজ্বের আলোচনা হয়েছে। যথা وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ইফরাদ সম্পর্কে। কিরান সম্পর্কে وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ الخ আর তামাত্তু সম্পর্কে فمن - الخ تَمَتَّعَ হানাফী গণের মতে কিরানে একই সাথে দু' আমল হয়। উপরন্তু নবীজীর নির্দেশও বিদ্যমান যে, "তোমরা হজ্বও উমরার ইহরাম বাঁধ।" একারণে এটাই উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ইফরাদ, আর মালেক ও আহমদ (র.) এর মতে তামাত্তু উত্তম।

وَإِنْ أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ أَحْرَمَ وَسَاقَ هَدْيَهُ فَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً قَلَّدَهَا بِمَزَادَةٍ أَوْ نَعْلٍ وَ أَشْعَرَ الْبَدَنَةَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَهُوَ أَنْ يَشُقَّ سَنَامَهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَلَا يُشْعِرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَسَعٰى وَلَمْ يَحَلِّلْ حَتّٰى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ قَبْلَهُ جَازَ وَعَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ فَإِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ حَلَّ مِنَ الْإِحْرَامَيْنِ وَلَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَانٌ وَإِنَّمَا لَهُمُ الْإِفْرَادُ خَاصَّةً وَإِذَا عَادَ الْمُتَمَتِّعُ إِلٰى بَلَدِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ بَطَلَ تَمَتُّعُهُ وَمَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَطَافَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ ثُمَّ دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِّ فَتَمَّمَهَا وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ كَانَ مُتَمَتِّعًا فَإِنْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فَصَاعِدًا ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا وَأَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَيْهَا جَازَ إِحْرَامُهُ وَانْعَقَدَ حَجُّهُ وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ اغْتَسَلَتْ وَأَحْرَمَتْ وَصَنَعَتْ كَمَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرَ وَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَبَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ إِنْصَرَفَتْ مِنْ مَكَّةَ وَلَا شَيْئَ عَلَيْهَا لِتَرْكِ طَوَافِ الصَّدْرِ –

<u>অনুবাদ</u>॥ তামাত্তু' আদায়কারী যদি হাদী (কুরবাণীর পশু) সঙ্গে নিতে চায় তাহলে ইহরাম বেঁধে হাদী সাথে নিবে। যদি উট নেয় তাহলে তার গলায় (চিহ্ন স্বরূপ) পুরান চামড়া, বা জুতা বেঁধে দিবে। সাহিবাইন (র.) এর মতে ইশ্‌আর' করবে। ইশ্‌আ'র হল উটের চুটের ডান পাশ হতে সামান্য ক্ষত করে দিবে। আবু হানীফা (র.) এর মতে ইশআ'র করবেনা। মক্কায় পৌঁছলে তওয়াফ ও সাঈ' করবে। তারবিয়ার দিন হজ্বের ইহরাম না বাঁধা পর্যন্ত হালাল হবেনা। তবে এর আগে ইহরাম বেঁধে থাকলে জায়েয। এ ব্যক্তির ওপর তামাত্তু'র (দম) কুরবাণী ওয়াজিব। কুরবাণীর দিন মাথা মুন্ডণ করলে উভয় ইহরাম হতে হালাল হয়ে যাবে।

<u>তামাত্তু' হজ্বের বাকী মাসায়েল ঃ</u> ১. মক্কায় অবস্থানকারীদের জন্যে তামাত্তু' ও কিরান কোনটিই ঠিক নয়। তাদের জন্যে কেবল ইফরাদ হজ্ব। ২. তামাত্তু' হজ্বকারী ব্যক্তি যদি উমরা হতে ফারেগ হয়ে

স্বদেশ আগমণ করে এবং কুরবাণীর পশু সাথে না নিয়ে থাকে তাহলে তার তামাত্তু' বাতিল হয়ে যাবে। ৩. হজ্বের মাসের আগেই যদি কেউ উমরার ইহরাম বাঁধে আর এর জন্যে ৪ চক্করের কম তওয়াফ করে। এরপর হজ্বের মাস শুরু হয়ে যায় তাহলে অবশিষ্ট তওয়াফ সম্পন্ন করবে এবং হজ্বের জন্যে ইহরাম বাঁধবে যদি সে তামাত্তু' আদায়কারী হয়। ৫. হজ্বের মাস হল শাওয়াল, যী কা'দাও, যিলহিজ্জার প্রথম ১০ দিন। ৬. হজ্বের মাসের পূর্বে কেউ হজ্বের ইহরাম বাঁধলে তার ইহরাম জায়েয হয়ে যাবে এবং হজ্ব ওয়াজিব হয়ে যাবে। ৭. ইহরামকালে কোন মহিলা ঋতুবতী হলে সে উকূফের পরে গোসল করবে। এবং তওয়াফে যিয়ারতের পরে মক্কা হতে প্রত্যাবর্তন করবে। তওয়াফে সদর পরিত্যাগের কারণে তার ওপর কোন কিছু আরোপিত হবেনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَلَا يُشْعِرُ الخ ঃ ইমাম সাহেব (রঃ)-এর মতে ইশআ'র মাকরূহ। তবে সহীহ হল মাকরূহ নয় বরং মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে এরূপ করা বর্ণিত আছে। তবে শর্ত হল যাতে উটের মাংস ও হাড় পর্যন্ত ক্ষত না পৌঁছে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

قوله وَمَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ الخ বিশুদ্ধ মতে তামাত্তু'র ইহরাম হজ্বের মাসের মধ্যে হওয়া শর্ত নয়।

التمرين – (অনুশীলনী)

১৪। حَجِّ قِرَان ও حَجِّ تَمَتُّعْ এর পরিচয় দাও এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম লিখ।

১৫। সংক্ষেপে কিরান হজ্বের বিবরণ দাও।

১৬। তওয়াফকালে পবিত্রতা শর্ত কিনা? লিখ।

بَابُ الْجِنَايَاتِ

إِذَا تَطَيَّبَ الْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ تَطَيَّبَ عُضْوًا كَامِلًا فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ تَطَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ لَبِسَ ثَوْبًا مَخِيْطًا أَوْ غَطّٰى رَأْسَهٗ يَوْمًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهٖ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ حَلَقَ أَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ حَلَقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ مِنَ الرَّقَبَةِ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى صَدَقَةٌ وَإِنْ قَصَّ أَظَافِيْرَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ قَصَّ يَدًا أَوْ رِجْلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ ـ

হজ্ব পালনে ত্রুটি বিচ্যুতি হলে করণীয়

অনুবাদ ॥ ১. মুহরিম ব্যক্তি সুগন্ধি ব্যবহার করলে তার ওপর এর কাফ্ফারা ওয়াজিব। যদি পূর্ণ একটি অঙ্গ বা ততোধিক অঙ্গে সুগন্ধি লাগায় তার ওপর দম তথা কুরবাণী ওয়াজিব। আর এক অঙ্গের কমে লাগালে (ফিৎরা পরিমাণ) সাদকা করা ওয়াজিব। ২. যদি সেলায় করা বস্ত্র পরিধান করে বা মাথা আবৃত করে পূর্ণ দিবস পরিমাণ তাহলে তার ওপর দম ওয়াজিব। এর কম অংশ হলে সাদকা করতে হবে। ৩. যদি কেউ মাথার এক চতুর্থাংশ বা এর বেশী মুন্ডন করে তার ওপর দম ওয়াজিব। আর চতুর্থাংশের কম মুন্ডালে সাদকা ওয়াজিব। ৪. যদি কেউ ঘাড়ে শিঙ্গা লাগানোর জায়গা মুন্ডন করে তাহলে আবু হানীফা (র.) এর মতে এতে দম ওয়াজিব। আর সাহিবাইনের মতে সাদকা ওয়াজিব। ৫. কেউ উভয় হাত-পায়ের নখ কাটলে তার ওপর দম ওয়াজিব। আর একহাত বা একপায়ের নখ কাটলে ও দম ওয়াজিব।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ جِنَايَات - جِنَايَةٌ এর বহুঃ ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপরাধ। শরয়ী বিধানের বিপরীত করাকে পরিভাষায় جِنَايَة বলে। تَطَيَّبَ সুগন্ধি লাগায়। عُضْوٌ অঙ্গ। مُخَيَّطًا সেলায়কৃত। غَطّٰى ঢাকে। دَمٌ খুন, রক্ত, কুরবাণী করা উদ্দেশ্য। مَحْجَمَةٌ - مَحَاجِمُ এর বহু ঃ ঘাড়ের নিম্নভাগ শিঙ্গা লাগানোর স্থান। قَصَّ কাটে। اَظَافِيْرُ - ظُفُر এর বহু ঃ নখ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ হজের ত্রুটি ও তার প্রতিবিধান ঃ قوله جِنَايَتٌ : جِنَايَتٌ ঃ দু'ধরণের (ক) কোনটিতে হজ্ব নষ্ট হয়ে যায়। যথা– যৌন মিলন (খ) কোনটিতে দম বা সাদকা ওয়াজিব হয়। দম আবার কোনটিতে একটা কোনটিতে দুইটা ওয়াজিব। সামনে এর বর্ণনা আসছে। উল্লেখ্য যে, এখানে সাদকা দ্বারা এক ফিৎরা পরিমাণ একজনকে দান করা উদ্দেশ্য । দু'-ক্ষেত্রে দু'টি দম ওয়াজিব– (ক) উকূফে আরাফা সম্পন্নের পূর্বে সঙ্গম, (খ) জানাবাত বা হায়েয নিফাস কালে তওয়াফে যিয়ারত। ১২ ক্ষেত্রে ১টি দম ওয়াজিব হয়। ১. পূর্ণ এক বা ততোধিক অঙ্গে সুগন্ধি লাগালে। ২. মেহেদীর খেযাব লাগালে ৩. সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করলে। ৪. সেলায়কৃত বস্ত্র পরলে । ৫. পূর্ণ একদিবস মাথা ঢেকে রাখলে। ৬. মাথার চতুর্থাংশ মুন্ডণ করলে। ৭. ঘাড়ের মধ্য ভাগের চুল কামালে। ৮. এক বগলের পশম কামালে। ৯. নাভীর নিচের পশম কামালে। ১০. হাতের বা পায়ের সব নখ কাটলে। ১১. হজ্বের কোন ওয়াজিব তরক করলে।

وَاِنْ قَصَّ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ اَظَافِيْرَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَاِنْ قَصَّ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ اَظَافِيْرَ مُتَفَرِّقَةً مِنْ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ تعالى عَلَيْهِ دَمٌ - وَاِنْ تَطَيَّبَ اَوْ حَلَقَ اَوْ لَبِسَ مِنْ عُذْرٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ اِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً وَاِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ بِثَلٰثَةِ اَصْوُعٍ مِنَ الطَّعَامِ وَاِنْ شَاءَ صَامَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَاِنْ قَبَّلَ اَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ اَنْزَلَ اَوْ لَمْ يُنْزِلْ وَمَنْ جَامَعَ فِىْ اَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ قَبْلَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ شَاةٌ وَيَمْضِىْ فِى الْحَجِّ كَمَا يَمْضِىْ مَنْ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُفَارِقَ اِمْرَأَتَهُ اِذَا حَجَّ بِهَا فِى الْقَضَاءِ عِنْدَنَا وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْحَلْقِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَمَنْ جَامَعَ فِى الْعُمْرَةِ قَبْلَ اَنْ يَطُوْفَ اَرْبَعَةَ اَشْوَاطٍ اَفْسَدَهَا وَمَضٰى فِيْهَا وَقَضَاهَا وَعَلَيْهِ شَاةٌ وَاِنْ وَطِئَ بَعْدَمَا طَافَ اَرْبَعَةَ اَشْوَاطٍ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَلَاتَفْسُدُ عُمْرَتُهُ وَلَايَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا وَمَنْ جَامَعَ نَاسِيًا كَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا فِى الْحُكْمِ -

অনুবাদ ॥ তবে পাঁচ আঙ্গুলের কম নখ কাটলে তার ওপর সাদকা ওয়াজিব। হাত-পায়ের বিভিন্ন আঙ্গুলের পাঁচটির কম নখ কাটলে ও শায়খাইন (র.) এর মতে তার ওপর সাদকা ওয়াজিব। আর মুহাম্মদ (র.) এর মতে তার ওপর দম ওয়াজিব। ৬. উযর বশতঃ সুগন্ধি লাগালে, মাথা মুণ্ডন করলে বা সেলায় কৃত বস্ত্র পরিধান করলে তার ইচ্ছে। চাইলে একটি ছাগল কুরবানী করবে, বা চাইলে ছয়জন মিসকীনকে তিন সা'পরিমাণ অন্নদান করবে। নতুবা তিনটি রোযা রাখবে। ৭. যদি কেউ চুম্বন করে বা উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করে তার ওপর দম ওয়াজিব। চাই বীর্য পাত হোক বা না। ৮. উকূফে আরফারে পূর্বে পেশাব-পায়খানার কোন রাস্তায় সঙ্গম করলে তার হজ্ব নষ্ট হয়ে যাবে। তার ওপর ১টি ছাগল কুরবাণী করা ওয়াজিব। তবে যার হজ্ব নষ্ট হয়নি তার ন্যায় হজ্ব পালন করে যাবে। পরে তার জন্যে কাযা ওয়াজিব। আমাদের হানফীগণের মতে তার জন্যে তার স্ত্রী হতে পৃথক থাকা ওয়াজিব নয়। ৯. উকূফে আরাফার পরে কেউ সঙ্গম করলে তার হজ্ব নষ্ট হবেনা। তবে তার ওপর উট কোরবানী করা ওয়াজিব। মাথা মুণ্ডানোর পরে কেউ সঙ্গম করলে তার উপর ১টি ছাগল কুরবাণী করা ওয়াজিব। ১০. কেউ উমরার মধ্যে ৪ চক্করের পূর্বে সঙ্গম করলে তার উমরা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে উমরার কাজ চালিয়ে যাবে। পরে এর কাযা করতে হবে। এক্ষেত্রে তার ওপর ১টি ছাগল কুরবাণী করতে হবে। আর যদি চার চক্করের পরে সঙ্গম করে তাহলে তার উপর ১টি ছাগল ওয়াজিব। এতে তার উমরা নষ্ট হবেনা। এবং পরে এর কাযা করতে হবেনা। ১১. কেউ ভুলবশত ঃ সঙ্গম করলে সে ইচ্ছাকৃত সঙ্গমকারীর ন্যায় গণ্য হবে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ قوله وَاِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ ঃ সাদকার ক্ষেত্রে মক্কার মিসকীনদের অগ্রাধিকার দেওয়া মুস্তাহাব। এ ক্ষেত্রে খানা-খাওয়ানো বা মালিক বানান উভয়ই জায়েয। আর রোযা সেখানে থাকা কালীন বা দেশে ফিরেও রাখতে পারে।

قوله بَدَنَةٌ ঃ কেননা অপরাধের দিকদিয়ে সঙ্গম সর্বাপেক্ষা বড়। সুতরাং তার প্রতিকার ও বড় বস্তু (উট) দ্বারা হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الْقُدُوْمِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَإِنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُعِيدَ الطَّوَافَ مَادَامَ بِمَكَّةَ وَلَا ذَبْحَ عَلَيْهِ وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَإِنْ تَرَكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثَلْثَةَ أَشْوَاطٍ فَمَا دُوْنَهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَإِنْ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ بَقِيَ مُحْرِمًا أَبَدًا حَتّٰى يَطُوْفَهَا وَمَنْ تَرَكَ ثَلْثَةَ أَشْوَاطٍ مِنْ طَوَافِ الصَّدْرِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ تَرَكَ طَوَافَ الصَّدْرِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَمَنْ تَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَحَجُّهُ تَامٌ وَمَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَمَنْ تَرَكَ الْوُقُوْفَ بِمُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَمَنْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَمَنْ تَرَكَ رَمْيَ إِحْدَى الْجِمَارِ الثَّلْثِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ تَرَكَ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعُقْبٰى فِي يَوْمِ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَمَنْ أَخَّرَ الْحَلْقَ حَتّٰى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَكَذٰلِكَ إِنْ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى -

তওয়াফ সংক্রান্ত ত্রুটিও করণীয়

অনুবাদ॥ ১. কেউ বিনা উযূতে তওয়াফে কুদূম করলে তার ওপর সাদকা ওয়াজিব, আর জুনুবী হলে ছাগল কুরবাণী করা ওয়াজিব। ২. কেউ বিনা উযুতে তওয়াফে যিয়ারত করলে তার ওপর ও ১টি ছাগল কুরবানী করা ওয়াজিব। জানাবাত অবস্থায় করলে তার ওপর উট কুরবাণী ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে মক্কায় থাকলে পুনরায় তওয়াফ করাই শ্রেয়, তখন আর কুরবাণী ওয়াজিব নয়। ৩. কেউ বিনা উযুতে তওয়াফে সদর করলে তার ওপর সাদকা ওয়াজিব, জুনূবী হলে ছাগল ওয়াজিব। ৪. কেউ তওয়াফে যিয়ারতের তিন চক্কর বা এর কম তরক করলে তার ওপর ছাগল ওয়াজিব। আর চার চক্কর করলে সাত চক্কর পূর্ণ না করা পর্যন্ত সে হালাল হবেনা। ৫. যদি কেউ তওয়াফে সদরের তিন চক্কর তরক করে তার ওপর সাদকা ওয়াজিব। আর যদি পূর্ণ তওয়াফে সদর বা চার চক্কর ছেড়ে দেয় তাহলে তার ওপর ১টি ছাগল ওয়াজিব।

সাদকা ও দম ওয়াজিব হওয়ার আরো কতিপয় মাসায়েল ঃ ১. কেউ সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ' তরক করলে তার ওপর ১টি ছাগল ওয়াজিব । তবে হজ্ব পূর্ণ হয়ে যাবে। ২. যে ব্যক্তি ইমামের আগে আরাফা হতে চলে আসবে তার ওপর দম ওয়াজিব। ৩. যে ব্যক্তি মুযদালিফায় অবস্থান তরক করবে তার ওপর দম ওয়াজিব।

৪. কেউ সব দিনে পাথর নিক্ষেপ তরক করলে তার ওপর দম ওয়াজিব। আর তিন জামরার কোন একটিতে তরক করলে তার ওপর সাদকা ওয়াজিব। ৫. ইয়াওমুন্নাহারে জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ তরক করলে তার ওপর দম ওয়াজিব। ৬. যদি কেউ হলক বিলম্বিত করে আর কুরবানীর দিনসমূহ পেরিয়ে যায় আবু হানীফা (র.) এর মতে তার ওপর দম ওয়াজিব। এরূপে কেউ যদি তওয়াফে যিয়ারত বিলম্বিত করে আবু হানীফা (র.) এর মতে তার ওপর ও দম ওয়াজিব।

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ তয়াফকালে পবিত্রতা শর্ত কি না ?</u>

قوله طَوَاف الْقُدُوم الخ ঃ কেননা হানফীগণের মতে তওয়াফে কুদূমের জন্যে তহারাত শর্ত নয়। অপর দিকে শাফেয়ী (র.) এর নিকট শর্ত। একারণে তার নিকট দম ওয়াজিব। তাঁর দলীল হল اَلطَّوَافُ صَلٰوةٌ হাদীস। সুতরাং নামাযের ন্যায় এর জন্যেও তহারাত জরুরী। আর হানাফীগণের দলীল وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ আয়াত। এখানে তওয়াফের জন্যে কোন শর্তারোপিত হয়নি। সুতরাং خَبْرِوَاحِد এর দ্বারা কুরআনের উপর অতিরিক্ত শর্ত চাপান ঠিক হবেনা।

قوله وَاِنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ الخ ঃ কেননা সে একটি রুকণের মধ্যে ত্রুটি করল যা তওয়াফে কুদূমের তুলনায় কম। আর জুনুবী অবস্থায় করলে তাতে উট ওয়াজিব। কেননা এটা সাধারণ নাপাকীর তুলনায় প্রবল, উপরন্তু এতে নাপাক অবস্থায় তওয়াফ ও মসজিদে প্রবেশ দুটি অপরাধ সাব্যস্ত হয়।

قوله وَمَنْ تَرَكَ السَّعْىَ الخ ঃ কেননা আমাদের মতে সাঈ ওয়াজিব, সুতরাং দম দ্বারা তার প্রতিবিধান হয়ে যাবে। আর শাফেয়ী (র.) এর নিকট সাঈ ফরয হওয়ার কারণে এতে প্রতিবিধান হবেনা।

قوله وَمَنْ اَفَاضَ الخ ঃ সূর্যাস্তের পূর্বে আসলে দম ওয়াজিব। পরে আসলে ওয়াজিব নয়।

قوله وَمَنْ اَخَّرَ الْحَلْقَ الخ ঃ ইয়াওমে নাহরের আমলগুলি ধারাবাহিকভাবে পালন করা ওয়াজিব। সুতরাং ওয়াজিব তরকের দরুন দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য সাহিবাইন (র.) এর মতে দম ওয়াজিব নয়। কেননা বিদায় হজ্বে রাসূল (সা.) কর্তৃক আগে-পরে করার প্রমাণ আছে।